বাংলা কবিতার ছন্দ

বাংলা কবিতার ছন্দ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

কুলগাছিয়া-গ্রাম ; মহিষরেখা-পোঃ ;

হাওড়া-জেলা

১৩৫৫

প্রকাশক : শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি এম. এ., বি. এল.
কুলগাছিয়া-গ্রাম ও ষ্টেশন ; মহিষরেখা-পোঃ
হাওড়া-জেলা ; বি. এন. আর.

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ, ১৩৫২
দ্বিতীয় সংস্করণ আশ্বিন, ১৩৫৫

দাম পাঁচ টাকা মাত্র
অতিরিক্ত [illegible] আনা

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসু

সোদরপ্রতিমেষু।

ভূমিকা

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমার এই আলোচনা ১৩৪৮ হইতে ১৩৪৯ সালের মধ্যে, 'শনিবারের চিঠি'তে, মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকিয়া, ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল; প্রথম ভাগ ১৩৪৮ সালের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ, এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণে সম্পূর্ণ হয়। তাহার পর, প্রধানতঃ ছাপাখানার নানা অসুবিধায় প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাতে এই ক্ষতি হইয়াছে যে, এইরূপ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকার জন্য, বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমার এই নূতন ধরণের আলোচনা ও ব্যাখ্যান পণ্ডিত বা ছাত্র কাহারও অধিগম্য হয় নাই, আমার পরিশ্রম নিষ্ফল হইয়াছিল।

বাংলা ছন্দ লইয়া বহু বিচার-বিতর্ক ও মতবাদপূর্ণ গবেষণা এখনও নিরস্ত হয় নাই; আমার এই আলোচনার সহিত সেরূপ গবেষণার সম্পর্ক অতি অল্প। ইহাতে পণ্ডিতগণের সেই গবেষণা নিরস্ত না হউক, সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-শিক্ষার্থী পাঠকগণের কিছু উপকার হইতে পারে। তথাপি এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এমন অনেক কথা বলিয়াছি, যাহা পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য না হইলেও, গৌণভাবে তাঁহাদের নিজস্ব চিন্তা-প্রণালীর খোরাক জোগাইতে পারে; সেই গৌণ ঋণ স্বীকার করিতেও অনেকের বাধিবে; সেই আশঙ্কায় আমি প্রথমেই আমার এই আলোচনার তারিখগুলি দিয়াছি।

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিবার অভিপ্রায় আমার পূর্ব্বে কখন ছিল না; আমি সাহিত্যের যে দিকটি লইয়া আজীবন বৃথা ব্যাপৃত আছি তাহা যদি 'চণ্ডীপাঠে'র সহিত তুলনীয় হয়, তাহা হইলে, এই 'জুতা-সেলাই'-এর কাজও আমাকে করিতে হইবে, ইহা কখন ভাবি নাই। কিন্তু বাংলা ছন্দের সূচ্যগ্র-পরিমিত একটু ভূমি লইয়া ক্রমেই যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিল, এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শেষে শরশয্যায় শুইয়াও যখন তাহার শান্তিপর্ব্ব রচনা করিতে পারিলেন না; যখন দেখিলাম, মহা মহা ছান্দসিকগণ বাংলা ছন্দতত্ত্বকে এমন একটি ব্রহ্মতত্ত্বে ঠেলিয়া তুলিয়াছেন যে, বাংলা কবিতার ছন্দোময় রসরূপ নিতান্তই মায়া—অতএব

উৎ—হইয়া পড়িয়াছে; এবং আরও যখন দেখিলাম, বাংলা সাহিত্যের নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীগণের উপরে সেই ব্রহ্মসূত্র এমনই কঠিন শাসন বিস্তার করিয়াছে যে, তাহাদের কানে বা প্রাণে, বাংলা কবিতার সহিত বাংলা ছন্দের যোগ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে—তখন একরূপ লোকহিত-ব্রতের মতই আমাকে এই ব্রত গ্রহণ ও উদ্‌যাপন করিতে হইল, কারণ, শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়—শিক্ষকগণেরও আর্ত্তনাদ আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল। অতএব, আমি যে খুব প্রসন্নচিত্তে এই কার্য্য সমাধা করি নাই, তাহা বলা বাহুল্য; আমার এই মানসিক অবস্থার পরিচয় এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে রহিয়া গিয়াছে, এজন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত।

আমার এই গ্রন্থের নাম—'বাংলা কবিতার ছন্দ'; এই নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কোন তত্ত্বঘটিত আলোচনা নয়, যাহাকে ইংরাজীতে Prosody বলে, আমি সেইরূপ 'ছন্দ-পরিচয়' লিখিয়াছি—বাংলা কবিতার ধ্বনি-রসরূপ যাহাতে একটু বুঝিয়া লইতে পারা যায়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছি। ধ্বনি-বিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস বা বিজ্ঞান জানা না থাকিলেও, বাংলা ছন্দের একটা সম্পূর্ণ পরিচয় যে রচনা করা যাইতে পারে—ছাত্রগণকে বিভীষিকাময়ী গবেষণার মাহাত্ম্যবোধ করাইতে হয় না, অর্থাৎ বাংলা ছন্দ-বিজ্ঞান আসলে একটা অসাধারণ কিছু নয়—তাহারই প্রমাণ ইহাতে মিলিবে। যে ছন্দগুলি এ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতায় দেখা দিয়াছে, তাহাদের সেই বৈচিত্র্যকেই ভালরূপ আস্বাদন করিবার জন্য আমি কয়েকটি সুস্পষ্ট ও সহজগ্রাহ্য নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছি; এজন্য কোন জবরদস্তিপূর্ণ 'থিয়রি'র শরণাপন্ন হইতে হয় নাই, তথ্য-প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া তত্ত্বকে প্রাধান্য দিবার প্রয়োজন হয় নাই। এ সম্বন্ধে একজন বিদেশী পণ্ডিত (স্বদেশী নহেন) যাহা বলিয়াছেন, আমার এ গ্রন্থের আদর্শ তাহাই, যথা—

The systematic study of verse or metrical rhythm is called prosody, and now we have the general principle which must govern it: metre is the modulated repetition of a rhythmical pattern. The rules given in prosody are valid only so far as they show how, in this metre or that, variations of speech-rhythm may conform with the ideally constant pattern, and what variations are capable of so conforming.

তাই, কবিতার পদ্যপংক্তিতে বাক্য-ধ্বনির যে বিচিত্র কারিগরি প্রকাশ পায়, তাহাদের প্রকৃতি ও বিশেষ বিশেষ রূপ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবার পক্ষে যে

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং নিয়ম-নির্দ্দেশ প্রয়োজন তাহার অধিক কিছু করি নাই; যে নিয়মগুলি আমি স্থাপন করিয়াছি—প্রায় সর্ব্ববিধ বাংলা ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতি-নির্ণয়ে তাহাদের সামর্থ্য আছে, ইহাই যথেষ্ট: এবং—

The sole authority for this is the practice of the poets; prosody can do no more than exhibit their practice in analytic form, by means of scansion.

অর্থাৎ, কবিদের রচনার মধ্যে যাহা আছে আমি তাহাকেই আমার সেই নিয়মগুলির প্রামাণ্য করিয়াছি। আমি যে কোনরূপ তত্ত্ব-সন্ধান বা তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি নাই, তাহার কারণও উপরি-উক্ত বিদেশী পণ্ডিতের ভাষায় বলি—

"And for metrical rhythm it will always be possible to state a formula and enunciate rules; not a formula, nor rules, for the actual sounds, but a formula of the pattern to which ideal reference is to be made, and rules which make it possible to refer actual variation to ideal constancy. This is the *scansion* of metre; and it will be seen that scansion can have no abstract authority, but must depend on individual understanding of verse."

(*The Theory of Poetry*: Lascelles Abercrombie)

অর্থাৎ, তত্ত্ব ব্যতিরেকেও—"It will be, always possible to state a formula and enunciate rules" এবং তাহাও—"not a formula, nor rules, for actual sounds"। অতএব ধ্বনি-বিজ্ঞান প্রভৃতির পাণ্ডিত্য অপেক্ষা 'individual under-standing of verse' যাহার যত উন্নত, তাহার পক্ষে ছন্দ-বিশ্লেষণ (scansion) তত সুসাধ্য হইবে।

আরও একটি কাজ আমি করিয়াছি, আমি এই ছন্দ-পরিচয়কে যতদূর সম্ভব কাব্য-পরিচয়েরই একটি অঙ্গ বলিয়া ধারণা করাইবার প্রয়াস পাইয়াছি—ছন্দের বৈচিত্র্য ও তাহার শ্রুতিঘটিত কারণ প্রদর্শন-কালে, আমি কাব্য-প্রেরণা ও কাব্যরসের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহাও নানাপ্রকারে পাঠকের হৃদ্‌গত করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি; এজন্য সর্ব্বত্র এমন দৃষ্টান্ত সযত্নে চয়ন করিয়াছি, যাহার ছন্দ-নির্ণয়ে কণ্ঠ আপনি কাব্যরসসিক্ত হইয়া উঠে। ছন্দকে কবিতা হইতে পৃথক করিয়া তাহার একটা ব্যাকরণ-রচনার প্রয়োজন অবশ্য আছে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ রূপ ছন্দ-ব্যাকরণকে অতিরিক্ত মর্য্যাদা দান করিলে কাব্যেরই অপমান করা হয়। একথা কখনও বিস্মৃত হইবে চলিবেনা যে, কবিতার ছন্দ-বিচার কাব্যরস-

বিচারেরই অঙ্গ, কারণ ছন্দও কবিতার একটা রস-রূপ। এজন্য প্রত্যেক কবিতার বিশিষ্ট রস-রূপের মত তাহার ছন্দও তাহার নিজস্ব,—নামে এক হইলেও, কবিতাবিশেষে তাহার যে বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠে, কোন ছান্দসিকের মাপকাঠি তাহার নাগাল পাইবে না। তাই একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে—

Versification remains always an inherent quality of the single poem. No two poets write in the same metre.

—তাহাতে ছান্দসিকের ব্যবসায় মাটি হইবারই কথা, যদি এদিকেও তাঁহার দৃষ্টি না থাকে। এইজন্যই এ গ্রন্থের নাম দিয়াছি—'বাংলা কবিতার ছন্দ'।

কিন্তু কাজটি এমনই, বিশেষতঃ, বাংলা সাহিত্যের কতকগুলি বিভাগের সাধারণ জ্ঞানও এ পর্য্যন্ত এমন অসম্পূর্ণ হইয়া আছে যে, বাংলা ছন্দের এইরূপ একটি সাধারণ ও অত্যাবশ্যক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়াও আমাকে কয়েকটি মূল প্রশ্নের মীমাংসাও করিতে হইয়াছে; কারণ, এইরূপ প্রশ্নের কোলাহলই ছন্দ-জ্ঞানকে বিব্রত করিয়া তোলে। এজন্য আমি যতটুকু নিতান্ত প্রয়োজন ততটুকু মাত্র তত্ত্ব-আলোচনাও করিয়াছি; তাহাতেও আমি পূর্ব্ববর্ত্তী ছান্দসিকগণের মতবাদসঙ্কুল যুক্তি-তর্কের গহন অরণ্যে প্রবেশ করি নাই—'জলের মত বিষয়কে ইঁটের মত শক্ত' করিবার চেষ্টা করি নাই। একদা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল; ঐ প্রবন্ধগুলিতে একটা বাংলা 'Prosody' রচনার উদ্যম লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এবং তাহা আমাকে আশান্বিত করিয়াছিল। পরে সেন মহাশয় যে ভাবে ছন্দ-পরিচয় ত্যাগ করিয়া ছন্দতত্ত্বের গহনে যাত্রা সুরু করিলেন, এবং "actual sounds" হইতেই বাংলা ছন্দের একটা অদ্বৈত-তত্ত্ব আবিষ্কার-মানসে যেরূপ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহাতে সে আশা অচিরে ত্যাগ করিতে হইল; অথচ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত রসজ্ঞান একমাত্র তাঁহার মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এখনও 'যুগ্মধ্বনি' ও 'যৌগিক', 'মুক্তক' ও 'প্রবহমান' প্রভৃতি মুদ্রাদোষ তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই,—যদিও সদ্যপ্রকাশিত তাঁহার এক গ্রন্থে ('ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ') আমি তাঁহার আলোচনার ভাষা ও ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়াছি। ছড়ার ছন্দ বা প্রাকৃত ভাষার পদ্য-মহিমা তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছে যে, সে যেন একটা সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এইজন্যই তিনি বাংলা ছন্দ-সঙ্গীতের

ধ্রুবপদী রূপকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে পারেন নাই, 'লৌকিক' টপ্পাই তাঁহার ছন্দতত্ত্বের মূলসূত্র নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাংলা ছন্দগুলির বিচিত্র রস-রূপ বর্ণন করার পরিবর্ত্তে, যেমন করিয়া হোক সেগুলিকে একটা মূলসূত্রে বাঁধিয়া দিবার যে অসুস্থ অধ্যবসায়, তাহাই পরবর্ত্তী ছান্দসিককেও পাইয়া বসিল, তাহার ফলে, একখানি সরল ও সুসম্পূর্ণ 'ছন্দ-পরিচয়' বাঙালী পাঠকের ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত জুটিয়া উঠিল না।

ইহার পর, রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' নামক পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া যেমন চমৎকৃত, তেমনই উপকৃত হইয়াছিলাম; তাহাতে তাঁহার সেই ঋষিদৃষ্টি-সম্ভূত যে কয়েকটি ঋক্ ছড়াইয়া আছে, তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, বরং, তাঁহার সে দৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহাকেও সংশয়ান্বিত করিবার—তাঁহার উক্তিও খণ্ডন করিয়া নিজ মত-প্রতিষ্ঠার—বর্ব্বরোচিত দুঃসাহস স্থান-বিশেষে লক্ষ্য করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ, কবি ও স্রষ্টা-শিল্পীর মত—নিকৃষ্টধর্ম্মী ছান্দসিক বা বৈয়াকরণিকের মত নয়—বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটি গভীর কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বাংলা ছন্দ-পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু তাহার আলোকে বাংলা ছন্দের 'দ্বৈত-তত্ত্ব' এবং আরও দুই একটি রহস্য যে বোধগম্য হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি নিজে তাঁহার ছন্দো-বিশ্লেষ-পদ্ধতি বা ছন্দের শ্রেণীভাগ গ্রহণ করি নাই বটে, তথাপি তাঁহার কয়েকটি উক্তি আমাকে গভীরভাবে আশ্বস্ত করিয়াছে।

এইবার এই গ্রন্থে বাংলা ছন্দ-ঘটিত একটি প্রশ্নের সমাধান আমি কি প্রকারে করিয়াছি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এইখানে করিব। বাংলা ছন্দে জাতিভেদ আছে—তথ্যহিসাবে ইহা অবিসংবাদিত। একই ভাষার ছন্দ দুই প্রকৃতির হয় কেমন করিয়া?—এইরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হইলেও, তাহাতে বিচলিত হইবার কারণ নাই। ভাষা যেমন আগে, ব্যাকরণ পরে—তেমনই ছন্দ আগে এবং ছন্দসূত্র পরে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া যাহাই হউক—সাধু ও কথ্য ভাষার রূপভেদ যতই উপেক্ষণীয় হউক, ইহাদের উচ্চারণের ধ্বনি-গুণে এমন পার্থক্য আছে যে, বাংলা পয়ার-ছন্দ ও ছড়ার ছন্দ ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মতই ভিন্ন-গোত্রীয়। এই তথ্য স্বীকার করিলে বিজ্ঞানের মর্য্যাদা-হানি হয় না; যাহা প্রাকৃতিক সত্য, তাহাকে অস্বীকার নয় —তাহার বিরোধী পূর্ব্ব-নিয়মকে সংশোধন করিয়া ঐ নূতন সত্যটির স্থান-নিরূপণই বৈজ্ঞানিকের কাজ। আমি ঐ ভেদ স্বীকার করিয়া ছান্দসিকগণের কৃপাপাত্র

হইলেও, বিজ্ঞানের কিছুমাত্র বিরুদ্ধাচরণ করি নাই; কারণ, ছন্দ-বিজ্ঞানে ভাষার জাতিটাই বড় নয়, তাহার উচ্চারণ-পদ্ধতিই গণনীয়। এই উচ্চারণ-পার্থক্যই বাংলা ভাষাকেও যেমন, তাহার ছন্দকেও তেমনই, পৃথক সীমানাভুক্ত করিয়াছে; শুধু বর্ত্তমানে নয়—বাংলাভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির আদি হইতেই ভাষার এই প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও শেষ বয়সে 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হওয়ার মত অবস্থায় পড়িতে-পড়িতেও বাংলাছন্দের অন্তর্নিহিত এই সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বৈয়াকরণিকের দাপটে অস্থির হইয়াও সেই দিব্যদর্শী পুরুষকে মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতে হইয়াছে—"But still the Earth moves!"

এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই আমি বাংলা ছন্দের একটি সহজ শ্রেণীভাগ করিয়াছি, এবং রবীন্দ্রনাথের নূতন ছন্দকেও তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সেই ছন্দের যে বিশদ ও বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয়, শিক্ষার্থীগণের সকল সংশয় দূর হইবে। ছড়ার ছন্দ, অর্থাৎ প্রাকৃত বা কথ্য-ভাষার ছন্দকেও আমি দুইভাগে ভাগ করিয়াছি, এক—পুরাতন খাঁটি ছড়ার ছন্দ, দুই —সত্যেন্দ্রনাথের হসন্ত-প্রাণ মাত্রা-ছন্দ। নিম্নে ইহার একটি ছক দিলাম।—
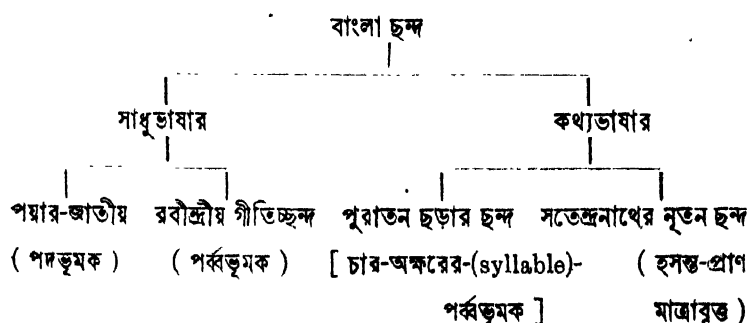
এইরূপ জাতিভাগ—এবং তাহাতেও মাত্র দুইটি করিয়া প্রধান গোত্র-ভাগ, বাংলা ছন্দ বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কথ্যভাষার ছন্দসম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে অনেক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন; আমি একটা নূতন পদ্ধতিতে এই ছন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছি, গ্রন্থমধ্যে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

অতঃপর বাংলা পয়ার-ছন্দ—যে ছন্দ যেমন প্রাচীন, তেমনই বাংলা কবিতার মেরুদণ্ড বলিলেও হয়—সেই ছন্দের উৎপত্তি, বিবর্ত্তন, ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, সে সম্বন্ধেও এইখানে কিছু কৈফিয়ৎ দিব। আমি এই পয়ারের ইতিহাস নির্ণয় করিবার জন্য তাহার সুপরিণত আধুনিক রূপটির দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছি। যাঁহারা পয়ারের ওই বর্ত্তমান রূপ ও তাহার সেই ঐশ্বর্য্য উত্তমরূপে উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহারাই ইহার জন্ম-ইতিহাসকে বৃথা বাদ-বিতর্কে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি একটি অতি সাধারণ উপমার সাহায্য লইব। গুটি ও প্রজাপতির কথা সকলেই জানেন, ইহাও জানেন যে, একটি অপরের আদি-অবস্থা হইলেও, উভয়ের মধ্যে কোন রূপ-সাদৃশ্য নাই। প্রজাপতির পরিচয় করিতে হইলে গুটিপোকা হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্যই লক্ষণীয়। পয়ারের আসল রূপ—তাহার সেই মাত্রাপরিমাণ (১৪), এবং পদভাগ (৮+৬); গুটি অবস্থায় তাহার যদি ৮।৮ পদভাগ ও ১৬ মাত্রার পরিমাণ থাকিয়া থাকে, তবে শেষে তাহার ওই ৮।৬ পদভাগ একটা সামান্য পরিবর্ত্তন নয়—একেবারে রূপান্তর বলিলেও হয়। ঐ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং একটি সম্পূর্ণ নূতন ছন্দ-সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়াছে,—তখনই বাংলা পয়ারের জন্ম হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে নয়। আমি দৃষ্টান্তসহ ইহাই সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-পয়ার যাঁহারা না বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যেমন বাংলা ছন্দের জাতিভেদ মানেন না, তেমনই বাংলা পয়ারের সেই পূর্ণতম সঙ্গীতরূপ অগ্রাহ্য করার ফলে, পয়ারের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, গুটি ও প্রজাপতির পার্থক্য বিচার না করিয়া, তাঁহারা বিষটিকে অনর্থক জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। পয়ারের যে পরিচয় আমি দিয়াছি, তাহাতে, আশা করি, বাংলা ছন্দের এই প্রধান স্তম্ভ বা খিলানের দিকে দৃষ্টি যেমন আকৃষ্ট হইবে, তেমনই তাহার রূপ ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা হইতে পারিবে,—মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে কি কারণে বাংলাছন্দের রাজা, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আর একটি যে কাজ আমি করিয়াছি তাহারও বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। আমি পূর্ব্বে বাংলা ছন্দের যে শ্রেণীভাগ দেখাইয়াছি, তাহার জন্য একটি অতি সহজ উপায় বাহির করিয়াছি—'পর্ব্ব' ও 'পদ'-ভেদ। বাংলা ছন্দের চলন, 'চাল, বা প্রয়াণ-ভঙ্গিকে আমি যে মুখ্যতঃ এই দুইটি ছাঁদে ধরিয়া দিয়াছি—সেই 'পদ' ও

'পর্ব্ব'কে এমন ভাবে আর কেহ চিহ্নিত করিতে পারেন নাই। এই দুইয়ের বৈলক্ষণ্য এবং স্ব-স্ব লক্ষণ আমি যেরূপ ব্যাখ্যাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, বাংলা ছন্দের রূপনির্ণয়ে, তথা ছন্দোবিশ্লেষ-ব্যাপারে, অতঃপর সকল সংশয় দূর হইবে—ছন্দ পরিচয়ের (Prosody) মূল প্রয়োজন তাহাতেই সাধিত হইবে; ঐ একটি চাবির দ্বারাই বাংলাছন্দের সকল দুয়ার খুলিয়া যাইবে—'তান-প্রধান' 'স্বরাঘাত-প্রধান' প্রভৃতি বিভীষিকার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের যে পরিচয় আমি দিয়াছি তাহাই হইল এই গ্রন্থ-রচনার মুখ্য অভিপ্রায়; বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহা, এক অর্থে ঐ ছন্দ-পরিচয়ের ভূমিকা। বাংলার বনিয়াদী ছন্দে—পয়ার বা পদভূমক ছন্দে—যাহার কান দীক্ষিত হয় নাই, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর তাহার নিকটে একটা নূতন ছন্দমাত্র; এজন্য ছান্দসিকগণ এই ছন্দের পরিচয় করিতে গিয়া নিজেদেরই ছন্দবোধের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, এই সকল ছন্দ-পণ্ডিত বাংলাছন্দের মূল সঙ্গীত কর্ণগম করিতে পারেন নাই। আমি এমন কাহাকেও দেখিলাম না, যিনি এই ছন্দসম্বন্ধে যথার্থ ধারণা করিতে পারিয়াছেন, বরং ঐখানে ঠেকিয়াই সকলের বিদ্যা-বুদ্ধি বানচাল হইয়াছে। কেহ তাহার নামকরণ করিয়াছেন 'অমিতাক্ষর',—কেহ বা তাহার 'প্রবহমানতা'কেই একমাত্র লক্ষণ ধরিয়া, ছড়ার ছন্দকেও সেই গৌরবের অধিকারী করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; এমন কি, এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ-পরিণতি সাধন হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা —এ-হেন মন্তব্য করিতেও বাধে না। আমি এই অমিত্রাক্ষরকেই বাংলার ছান্দসিকগণের ছন্দোবিদ্যার একমাত্র পরীক্ষাস্থল বলিয়া স্থির করিয়াছি। মধুসূদনের সেই ছন্দ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া আমি বাঙালী সাহিত্যিকের একটা বড় ঋণ পরিশোধ করিয়াছি।

গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে আমি যে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন; কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ছন্দ-পরিচয় প্রসঙ্গে এগুলিরও প্রয়োজন ছিল; এগুলিতে শুধুই বাংলা-ছন্দের কয়েকটি বিশিষ্ট রস-রূপের পরিচয় নয়—এমন আলোচনাও আছে, যাহা কাব্যরস-বিচারেও অতিশয় মূল্যবান।

সর্ব্বশেষে, আমার একটি ঋণ-স্বীকার আছে। আমি যখন এই ছন্দ-পরিচয় লিখিবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছিলাম, তখন একটিমাত্র ব্যক্তি সে বিষয়ে আমার উৎসাহ রক্ষা করিয়া, এমন কি, ইহাতে আমার নেশা ধরাইয়া আমার যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেছি। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসু, এম-এ। বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বই তাঁহার পঠন-পাঠন ও গবেষণার প্রধান বিষয় হইলেও, বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহার জিজ্ঞাসা সদাজাগ্রত বলিয়া, তিনি, দিনের পর দিন আমার সহিত বাংলা ছন্দের আলোচনায় যে ভাবে যোগ দিয়াছিলেন, এবং নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমার চিন্তাধারাকে যেরূপ প্রবুদ্ধ ও সতর্ক রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমি সত্যই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

বাগনান, (হাবড়া)
রথযাত্রা, ১৩৫২

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সূচী

প্রথম ভাগ

বাংলা ছন্দের সাধারণ পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
১৬২	৮	গভীর-গম্ভীর	গভীর-গম্ভীর স্বর—
১৬৭	২০	স্বরুও	স্বরও
১৬৮	২১	নেহারি	নেহারিয়া
১৬৯	২৪	প্রবন্ধ	প্রথম
১৭২	২৫	আকার	আবার
১৭৪	৩	করিয়াছিমেন	করিয়াছিলেন
১৭৫	১৭	দৃঢ়-সম্বন্ধ	দৃঢ়-সম্বদ্ধ
১৭৬	৯	দুঃখের	দুখের
১৭৬	২১	কজে	কাজে

১৫৯ পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে গ গ খ খ ইহার পরে একটি ছেদ চিহ্ন হইবে।

সূচী

প্রথম ভাগ

বাংলা ছন্দের সাধারণ পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগ

বাংলা পয়ার ও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর

পরিশিষ্ট

প্রথম ভাগ

বাংলা ছন্দের সাধারণ পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

গোড়ার কথা; সাধুভাষার পয়ার-জাতীয় ছন্দ;

অক্ষর ও মাত্রা; এই ছন্দ কোন্ অর্থে মাত্রাধর্ম্মী; চরণ, পংক্তি ও পদ।

আধুনিক বাংলা ছন্দের আলোচনায়, একই ভাষার ছন্দে যে জাতিভেদ স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে তাহার প্রয়োজন ছিল না; কারণ পুরাতন কাব্যের ভাষা মোটের উপর এক ভাষাই ছিল, তাহার শব্দসম্ভারে স্তরভেদ থাকিলেও, সকল শব্দই এক ধ্বনিপ্রকৃতির শাসনাধীন ছিল। এই ভাষাকে আমরা অধুনা বিশেষ করিয়া সাধুভাষা নাম দিয়াছি; সাধুভাষা এবং প্রাকৃত কথ্যভাষা—ভাষার এই দুই নাম হইতেই প্রমাণ হয় যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা এক নয়। যেহেতু ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতিই তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং সেই অনুসারেই উচ্চারণের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, এবং উচ্চারণ-রীতির উপরেই ছন্দ মুখ্যত নির্ভর করে—অতএব, বাংলা ভাষার যে দুই-রূপ এক্ষণে বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই দুইয়ের ছন্দ দুইটি পৃথক জাতি হইতে বাধ্য; এবং এইজন্যই এক ধরণের ভাষায় যে ছন্দ-গুণ বা ছন্দসৌন্দর্য্য সম্ভব, অন্য ধরণের ভাষায় তাহা সম্ভব নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দও যে সাধুভাষা ভিন্ন অপর ভাষায় সম্ভব নয়—কোন লক্ষণেই এই দুই ভাষাকে এক মনে করিয়া লইয়া, কথ্যভাষায় অমিত্রাক্ষরের সঙ্গীত সৃষ্টি করা যায় না, তাহা যিনি স্বীকার করেন না, তিনি হয় বিকর্ণ, অথবা ঘণ্টাকর্ণ—ইহাতে সংশয় নাই। যাঁহারা কর্ণসম্পদে বঞ্চিত নহেন, তাঁহারা, নিম্নোদ্ধৃত পদ্যপংক্তিগুলির ছন্দধ্বনি যে শুধুই বিচিত্র নয়—সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়, তাহা অবিলম্বে শ্রুতিনিশ্চয় করিতে পারিবেন।—

> আজ তোমারে দেখতে এলাম, জগৎ-আলো নূরজাহান,

এবং—

> এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান,

সহজ ভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো,

এবং—

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।

*   *

সন্ধ্যা হ'ল সূর্য্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদীঘির মাঠে।

এবং—

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।

—ইহারা যে সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রীয় তাহা বুঝিবার জন্য ছন্দ-লিপির প্রয়োজন নাই—কানের লিপিই যথেষ্ট।

এক্ষণে, এই দুই জাতির মধ্যে যেটি আদি ও বনিয়াদী তাহাকে মাত্রিক (quantitative) বা মাত্রাশ্রয়ী ছন্দ বলা যাইতে পারে; কারণ ইহার প্রত্যেক চরণের ধ্বনি-পরিমাণ কালহিসাবে গণনীয়—ন্যূনতম ধ্বনিপরিমাণ এক মাত্রা, ও সেইরূপ যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রা ধরা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এইরূপ সূক্ষ্ম নিয়ম না করিয়া মোটামুটি প্রত্যেক বর্ণকে (যুগ্ম বা অযুগ্ম, হসন্ত বা স্বরান্ত) এক-সংখ্যক ধরিয়া মোট বর্ণসংখ্যা দ্বারা সকল ছন্দের চরণ পরিমাণ ঠিক করা হইত; তাহাতে—

সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিকা

যেমন ১৪ অক্ষর, তেমনই—

আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন

—এমন চরণও ১৪ অক্ষর; অথচ প্রথমটিতে সত্যই চৌদ্দটি অক্ষর আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে হসন্ত বর্ণ আছে তিনটি, বাকি ১১টি মাত্র আসল অক্ষর (syllable)। এইরূপ স্বরান্তবর্ণ নিশ্চয়ই কালের মাত্রাপরিমাণে এক নয়। না হউক, তবু দুইটি চরণের পরিমাণ যে এক, তাহা কানে বুঝি, আবার অক্ষর গণিয়াও একই সংখ্যা পাই। তার কারণ, উহারই মধ্যে, একটা নিয়ম অনুসারে, চৌদ্দটি মাত্রার বণ্টন

হইয়া আছে। প্রাচীন কবিরা এই বর্ণের সংখ্যাও মানিতেন না—কৃত্তিবাসের পয়ারে ১৫, ১৬ সংখ্যার অনিয়ম খুবই দেখা যায়—

লোমপাদের দেশ হেন | মুনি সবে জানে (১৫)

*   *   *

চরু খাইলে পুত্র তোমার | হইব উদরে (১৬)

—কারণ, সুর করিয়া পড়িলে প্রত্যেক চরণের দুই ভাগকে যথাক্রমে ৮ ও ৬ মাত্রার পরিমাণে সংকোচন, কিংবা—আবশ্যক হইলে, প্রসারণ করিয়া লওয়া যায়। আধুনিক পাঠ-পদ্ধতিতেও এই সংকোচন ও প্রসারণ চলে; তবে সুর নাই বলিয়া তাহার একটা সীমা আছে। আবশ্যকমত স্বর-সংকোচন বা স্বর-প্রসারণের দ্বারা যেমন যুক্তবর্ণ বা মধ্যস্থ হসন্তবর্ণের মাত্রার সমতা রক্ষা করা যায়, তেমনই শব্দের অন্তস্থিত হসন্তবর্ণের মাত্রাটিও, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরের স্বর একটু প্রসারিত করিয়া, পূরণ করা হয়। পাঠ করিবার সময়ে—কেবল মাত্রা-পূরণের জন্য নয়—কার্য্যত ইহাই হয় বলিয়া, এক্ষণে এই ছন্দের মাত্রিক প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে।—

সহসা তুলিয়া দিল রঙ্‌গ যবনিকা

—এখানে 'ঙ্গ' যুক্তবর্ণের 'ঙ্' একটি হসন্তবর্ণ, এবং উহা শব্দের অন্তর্বর্ত্তী, এজন্য এখানে উচ্চারণ-কৌশলে পূর্ব্ববর্ত্তী 'র'-এর মাত্রাকে একটু হ্রস্ব করিয়া, 'ঙ্'র যে সামান্য ধ্বনিকালের পরিমাণ, তাহার স্থান করিয়া দেওয়া হয়—'রঙ্' পুরা এক মাত্রার বেশি হইতে পায় না। এইরূপ করা যায় বলিয়া, সেকালের কবিরা স্থানবিশেষে 'হইয়া' না লিখিয়া 'হৈয়া' লিখিতেন—ঠিকই করিতেন; কারণ, মাঝের 'ই'কে হসন্ত করিয়া না লইলে মাত্রা বাড়িয়া যায়—'হৈ' তো 'হই্' ছাড়া আর কিছু নয়। আবার—

উৎকল নরপতি আইসে হেনকালে

—মাত্রাহিসাবে ঠিকই আছে; কেন না, এখানে পড়িবার সময়ে 'উৎকল' এর 'উৎ' দুই মাত্রা করিয়া পড়া কিছুমাত্র কষ্টকর নয়—'উ'এর স্বর একটু প্রসারিত করিলেই (পরে হসন্ত 'ৎ' আছে বলিয়াই তাহা করা যায়) 'ৎ'এর অপূর্ণতা পূরণ করিয়া লওয়া যায়। 'আইসে'র 'আ'এর স্বর একটু হ্রস্ব এবং 'ই'কে হসন্ত

করিয়া (উপরের 'রঙ্‌গ' যেমন) লইলেই 'আই্‌সে' তুই মাত্রায় পরিণত হইবে। এই মতে—

আষাঢ়ের অশ্রুপ্ল্‌ত সুন্দর ভুবন

মাত্রা-পরিমাণে কোন গোল বাধাইবে না। কেবল আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার—শব্দের আদ্যবর্ণ যুক্তবর্ণ হইলেও তাহা অযুক্তবর্ণের মতই উচ্চারণ করা যায়—এজন্য সেখানে কোন গোল নাই। 'অশ্রুপ্লুত' এই বাক্যাংশটি, উচ্চারণ কালে তুই ভাগে ভাগ হইয়া, 'প্লু'কে আদ্যবর্ণ করিয়া তুলিলেই ভাল হয়।

সাধুভাষার ছন্দ যে মাত্রাধর্ম্মী (quantitative) সে সম্বন্ধে, আশা করি ইহার অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কান যদি ঠিক থাকে তবে বর্ণের সংখ্যা দ্বারাই সাধারণত এ ছন্দের হিসাব পাওয়া যায়; বর্ণ, অক্ষর এবং মাত্রা—এ সকলের ধ্বনিতত্ত্ব বা ব্যাকরণ না জানিলেও চলে; কেবল, কবিতা-লেখক বা কবিতা-পাঠক উভয়ের সহজ ছন্দবোধ একটুও থাকা আবশ্যক। রবীন্দ্র-যুগের পূর্ব্বে সাধারণ বাঙালী পাঠকের যে সেটুকু ছন্দবোধও ছিল না, তাহার প্রমাণ সমগ্র প্রাচীন বাংলাকাব্যের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। আধুনিক যুগের মহাকবি হেমচন্দ্রেরও, শুধু ছন্দ নয়—মিল সম্বন্ধেও যে তাচ্ছিল্য দেখা যায়, তাহা শিক্ষিত বাঙালী কবি ও তাঁহার ভক্ত পাঠকগণের পক্ষে নিতান্তই লজ্জাকর। হেমচন্দ্রের ছন্দ যেন শব্দের বোঝাই লইয়া ভারী মালগাড়ীর মত, কেবল ভারের জোরে, ঢেলা ভাঙ্গিয়া খাল খন্দ ও মাঠ পার হইয়া ছুটিয়াছে—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কারণ পাঠকও বাঙালী। একজন আধুনিক ছন্দ-শাস্ত্রী এইরূপ খাঁটি বাঙালী প্রাণ ও কান লইয়া যে ছন্দ-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহাতে হেমচন্দ্রের কবিতাই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে রাশি রাশি ছন্দদোষদুষ্ট পদ্যপংক্তির সমারোহ দেখিয়া মনে হয় যে, ছন্দের মূলসূত্র ধরিবার জন্য নিখুঁত ছন্দশিল্পের উদাহরণ তেমন উপযোগী নয়—কারণ, তাহাতে ধ্বনি-বিজ্ঞানের মহিমা প্রকাশ পায় না। এইরূপ আদিম অপরিচ্ছন্ন ছন্দ-রচনার উদাহরণ হইতেই সূত্র নির্ম্মাণ করা যে কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়, তাহাও তিনি বেশ জোরের সহিত বলিয়াছেন; তাঁহার যুক্তি এইরূপ—'তাহাদিগকে ছন্দোদুষ্ট বলিতে কেহ সাহস করিবেন না, বহুকাল হইতে বাঙালীর কান ঐ সমস্ত কবিতার ছন্দে

তৃপ্তিলাভ করিয়াছে'; অন্যত্র—'ছন্দোদুষ্ট কবিতার দুর্ব্বলতা সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়'। এ যুক্তি অনেকটা এইরূপ—'পরিধানে কেবল একখানি ধুতি ও একখানি চাদর, নগ্নশির ও নগ্নপদ—এইরূপ বেশকে কেহ অসভ্য বলিতে সাহস করিবেন না—বহুকাল হইতে বাঙালী এই বেশে মাঠে ঘাটে বিচরণ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছে; বেশভূষার বিষয়ে বাঙালী একটুও শৈথিল্য সহ্য করিতে পারে না'। কিন্তু আমরা জানি যে, কান মলিয়া দিলেও যদি কাহারও ছন্দবোধ জন্মিত তবে এ জাতির কান ছিঁড়িয়া যাইত, তথাপি ছন্দবোধ জন্মিত না; তাহার প্রমাণ এখনও দুষ্প্রাপ্য নয়। বাঙালীর ছন্দবোধ জন্মিয়াছে রবীন্দ্র-যুগে; তাহার কারণ, তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষার সর্ব্ববিধ ধ্বনিকে অফুরন্ত ছন্দ-লীলায় লীলায়িত করিয়া বাঙালীর কানে ছন্দ-রস ও মনে ছন্দ-জিজ্ঞাসার উদ্রেক করিয়াছেন। বাংলা কাব্যের প্রথম শিল্পী-কবি—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র; কিন্তু তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার সেই শিল্পাদর্শ, 'খাঁটি' বাংলা কবিতার হট্টগোলে, বাঙালীর কান দুরস্ত করিবার অবকাশ পায় নাই। তারপর, বাংলা ছন্দ-সঙ্গীতের আকস্মিক ও অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে। কিন্তু বাঙালীর কান এমনই ছন্দ-রসগ্রাহী যে, সে ছন্দ এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে চাহিল না,—সেই বিজাতীয় ছন্দ জাতীয় মহাকবি হেমচন্দ্রের হাতে কথঞ্চিৎ কর্ণগম্য রূপ ধারণ করিল—অর্থাৎ মালগাড়ির ছন্দে পরিণত হইয়াই বাঙালীর কানের তৃপ্তিসাধন করিল; সর্ব্বশেষে গিরিশ ঘোষের নাটকে সে ছন্দ মোক্ষলাভ করিয়া বাঙালীর কানকেও মুক্তি দিল। এ হেন ছন্দজ্ঞান আর কোন্ জাতির পক্ষে সম্ভব?

আমি সাধুভাষার বনিয়াদী ছন্দের কথা বলিতেছিলাম। এই ছন্দকেও দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—একটিকে (রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে) পয়ার-জাতীয় ছন্দ, ও অপরটিকে গীতিচ্ছন্দ বলিব। পূর্ব্বে পয়ার-নামক ছন্দের চরণ লইয়া এই ছন্দের মাত্রা-হিসাব দেখাইয়াছি। এক্ষণে, ঐ একই ধ্বনি-প্রকৃতির একই ভাষায় দুই বিভিন্ন ছন্দ-রূপ কেমন তাহাই দেখাইব। পয়ার-ছন্দ ও গীতিচ্ছন্দের প্রভেদ এমনই স্পষ্ট যে, তাহাও নিম্নের পংক্তিগুলি পাঠ করিলে কানেই ধরা যাইবে। চৌদ্দমাত্রার পয়ার-নামক ছন্দ ও অন্যান্য এই জাতীয় ছন্দের সবিশেষ পরিচয় পরে দিব; এক্ষণে পয়ার-ছন্দ ও গীতিচ্ছন্দের প্রভেদ মাত্র লক্ষ্য করিলেই চলিবে।

১। প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে।
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে। ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

২। নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম। (রবীন্দ্রনাথ)

৩। জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে। (বলাকা)

পয়ারজাতীয় ছন্দের এই কয়েকটি নমুনাই যথেষ্ট। গীতিচ্ছন্দের কয়েকটি পংক্তি ইহার পরে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, তাহার ছন্দ-রীতি এক নয়, বেশ একটু স্বতন্ত্র।

(১) শোন্ সখি গায় কারা আজ রাতে গুজরাতি গরবা
খঞ্জন-নর্ত্তন-হিল্লোল-গর্ভা! (সত্যেন্দ্রনাথ)

(২) বন্‌পথে আজ ফুলদোল-লীলা
কুঙ্কুম ভাঙে রঙ্গন,
জল্‌তরঙ্গ ঝঙ্কার তুলে বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ। (করুণানিধান)

(৩) কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে
নিবিড় নিশীথ টুটে!
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে! (রবীন্দ্রনাথ)

—এই রীতিরও উদ্ভব একই ভাষার একই ধ্বনি-প্রকৃতি হইতে হইয়াছে, অথচ ছন্দ-ভঙ্গি কি স্বতন্ত্র! আমি প্রথমেই পয়ার-জাতীয় ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব; তৎপূর্ব্বে আমি দুই একটি পরিভাষা ঠিক করিয়া লইব।

কবিতার পংক্তিকে আমরা চরণ বলিয়া থাকি—কিন্তু পংক্তি মানেই চরণ নয়। ছন্দের পূরা মাপ যতখানি পাওয়া যায় ততখানিই 'চরণ'—'চরণ'কে ভাগ করিয়া

পংক্তির আকারে সাজানো যাইতে পারে। সকল ছন্দেই—চরণ দীর্ঘ হইলে—মধ্যে, এক বা একাধিক যতি বা বিরাম—আদৌ নিশ্বাস লইবার জন্যই—ঘটিতে বাধ্য, কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন রূপ অনুসারে এই যতির কালান্তর স্বল্প বা দীর্ঘ হইয়া থাকে। চরণের এই যতি-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিই এক একটি পদ। পদের আর ভাগ নাই, তাই পয়ার-জাতীয় ছন্দে এই পদই ছন্দের গতিভঙ্গি—ছাঁদ বা চাল নিরূপণ করে; তাই ইহাকেই তাহার measure বা foot বলা যাইতে পারে—যদিও 'foot' বা পদক্ষেপের খাঁটি লক্ষণ তাহাতে নাই। উপরের ১নং উদাহরণ পয়ার-নামক ছন্দে রচিত; দুইটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি যতি, ও সেইজন্য দুইটি পদ; যথাক্রমে আট ও ছয় মাত্রার চরণদুইটি মিলযুক্ত, এবং দ্বিতীয় চরণের শেষে পূর্ণ বিরাম। দ্বিতীয় উদাহরণে পদ তিনটি—যথাক্রমে, ৮, ৮, ও ৬ মাত্রার; দীর্ঘ চরণের পদগুলি ফাঁক করিয়া বা পংক্তি-ভাগ করিয়া সাজানো যায়। প্রত্যেক চরণের প্রথম দুই পদে মিল আছে, তৃতীয় পদটি পুচ্ছের মত অপর চরণের পুচ্ছের সহিত মিলযুক্ত। ইহার নাম ত্রিপদী। এইরূপ চৌপদীও হয়—উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। ৩নং উদাহারণটিও ঐ এক পয়ার-জাতীয়; ইহারও চরণে চরণে মিল আছে; যতির কালান্তর ঠিক নাই, অর্থাৎ পদগুলি অসমান, এবং তাহাদের সংখ্যারও কোন স্থিরতা নাই, তাই চরণগুলির মাপও এক নহে। তথাপি ইহার মাত্রার হিসাব পয়ারেরই মত, এবং পদ পয়ারেরই পদ—চার, ছয় ও আট মাত্রার ছাঁদ, ছোটই হউক আর বড়ই হউক। ইহাকে 'পদ-সচ্ছন্দ' পয়ার বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধুভাষার গীতিচ্ছন্দ বা পর্ব্বভূমিক ছন্দ—'দ্বৈমাত্রিক' ও 'ত্রৈমাত্রিক'; পর্ব্বভূমক ছন্দের চাল ও নানারূপ পয়ারজাতীয় ছন্দের দ্বৈমাত্রিক 'লয়'; আদি পয়ারে চতুর্মাত্রার প্রভাব।

গীতিচ্ছন্দের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার পর্ব্বভাগ। পয়ারের পদের আর ভাগ নাই— যে ভাগ শব্দের পৃথক উচ্চারণে ঘটে, তাহা আসলে পদচ্ছেদ বা পদ-বিশ্লেষ মাত্র—তাহা পদের কোনরূপ ছন্দ-ভাগ কিম্বা পর্ব্ব নয়। এ সম্বন্ধে পরে বলিব। পয়ারের চরণ যেমন যতি-তালে ছন্দিত হয়, এবং সে ছন্দে নিয়মিত পর্ব্ব-পর্য্যায় না থাকায় তাহার ছন্দস্পন্দ অন্যরূপ (যাহার জন্য তাহা গীতিসুরবর্জ্জিত—Epic, Narrative, Reflective কাব্যের উপযোগী), তেমনই, এই গীতিচ্ছন্দে খাঁটি foot বা পর্ব্ব থাকায় ছন্দ-ধ্বনিতে এমন একটি দোল লাগে যে, তাহাতেই একটি ছন্দোজাত সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। ছন্দোজাত বলিবার কারণ এই যে, তাহা সুর করিয়া পড়ার সঙ্গীত নয়, তাহা খাঁটি ছন্দ-সঙ্গীত—নিয়মিত মাত্রায়, পর্ব্বজনিত ছন্দস্পন্দের বিশিষ্ট প্রভাবে আপনি ফুটিয়া উঠে। পর্ব্বগুলি এইরূপ (॰ এই চিহ্ন দ্বারা পর্ব্বচ্ছেদ দেখানো হইয়াছে)—

(১) শোন্ সখি ॰ গায় কারা ॰ আজ রাতে ॰ গুজরাতি ॰ গর্‌বা,
খঞ্জন ॰ নর্ত্তন ॰ হিল্লোল ॰ গর্ভা!

(২) বন্ পথে আজ ॰ ফুলদোল-লীলা ॰ কুঙ্কুম ভাঙে ॰ রঞ্জন,
জল্‌তরঙ্গ ॰ ঝঙ্কার তুলে ॰ বাজাও শঙ্খে ॰ কঙ্কণ।

(৩) কাদের কণ্ঠে ॰ গগন মন্থে ॰ নিবিড় নিশীথ ॰ টুটে,
কাদের মশালে ॰ আকাশের ভালে ॰ আগুন উঠেছে ॰ ফুটে।

প্রথমটিতে চার মাত্রার পর্ব্ব—প্রথম চরণে চারিটি, দ্বিতীয় চরণে তিনটি; প্রত্যেকটির শেষে একটি করিয়া তিন মাত্রার খণ্ড-পর্ব্ব।

দ্বিতীয়টিতে ছয় মাত্রার পর্ব্ব—দুই চরণেই তিনটি করিয়া; শেষে একটি করিয়া চার মাত্রার খণ্ড-পর্ব্ব।

তৃতীয়টিতেও ছয় মাত্রার পর্ব্ব—প্রত্যেক চরণে তিনটি; শেষে একটি করিয়া দুই মাত্রার খণ্ড-পর্ব্ব।

এই তিনটির কেবল পর্ব্ব-হিসাবই করিলাম, কারণ, পয়ার-জাতীয় ছন্দের সহিত ইহার এই পর্ব্বঘটিত পার্থক্যই এক্ষণে লক্ষ্য করিতে বলি। ইহাদের মধ্যেও নানা কারণে ছন্দধ্বনির যে বৈচিত্র্য আছে, তাহার সম্বন্ধে পরে বলিতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে—এ ছন্দ পর্ব্বভূমক ছন্দ, ইহার প্রাণই এই পর্ব্ব; পয়ার-জাতীয় ছন্দকে 'পদভূমক' ছন্দ বলিলেই ঠিক হয়। পয়ারের প্রধান ছন্দগুলির নাম যে ত্রিপদী চৌপদী রাখা হইয়াছিল—এবং সেই অনুসারে আদি পয়ারের (১৪ মাত্রা ও দুই যতি) নাম দ্বিপদী হওয়াই ঠিক—তাহার কারণ, পয়ারের ছন্দ-প্রবাহ এই যতির দ্বারা বিভক্ত হইয়া পদমধ্যে তরঙ্গিত বা সুরময় হইয়া উঠে, দুই বা ততোধিক যতির নিয়মিত পর্য্যায়ে সেই তরঙ্গ বা সুর আবর্ত্তিত হইয়া একটি পূর্ণ ছন্দ-রূপের আভাস দেয়। পদ ও পর্ব্বের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ এই যে—(১) পর্ব্বের মাত্রাহিসাব আরও সুনির্দ্দিষ্ট; ইহাতে পয়ারের মত, মধ্যবর্ত্তী অযুক্ত বা যুক্ত হসন্ত-বর্ণের ওজন আবশ্যকমত কম বা বেশি করা যায় না; যেমন, 'সুন্দর' —ছন্দের অন্তর্গত—এই ধ্বনিভাগটির মাত্রা কখনও তিনসংখ্যক হইবে না, 'সু-ন্-দ-র' এই চারমাত্রার হইবে। (২) পর্ব্বের মাপ একটি সত্যকার মাপ বা measure—যেন চরণ মাপিবার এক একটি বাটখারা। তাহার কারণ, ইহা পদ অপেক্ষা আয়তনে যেমন ছোট, তেমনই চরণকে সমভাগে ভাগ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহাও পদ ও পর্ব্বের একটা স্থূল পার্থক্য—আসল পার্থক্য ছন্দঃপ্রবাহগত। সে পার্থক্যের কথা বলিবার আগে পর্ব্বের গঠনের কথা বলিতে হয়, এক্ষণে সেই কথাই বলিব।

বাংলা ছন্দের এই যে পদ ও পর্ব্ব—রবীন্দ্রনাথ ইহাদের প্রকৃতিগত (আকৃতির নয়) একটা নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং পয়ারজাতীয় ছন্দকে দ্বৈমাত্রিক ও গীতিচ্ছন্দকে ত্রৈমাত্রিক বলিয়াছেন। এই তত্ত্বের প্রয়োগ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সাফল্য যেমনই হউক—এই তত্ত্বটি অতিশয় মূল্যবান; বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এমন একটা গোড়ার কথা আর কেহ এ পর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই। কিন্তু এই তত্ত্বটি পর্ব্বভূমক গীতিচ্ছন্দ সম্বন্ধে যেমন খাটে, পয়ারজাতীয় পদভূমক ছন্দ সম্বন্ধে ঠিক সেই অর্থে খাটে না। দ্বৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক বলিতে খাঁটি পর্ব্বই বুঝায়—

কারণ সেখানে ছন্দের একটা বাঁধা চাল (measure, foot) আছে, এবং তাহার মাত্রার পরিমাণ ও গণনা-রীতি সুনির্দ্দিষ্ট। পয়ারের মাত্রাগণনা-রীতি কিঞ্চিৎ শিথিল হইলেও, পদগুলিতে তাহার পরিমাণ সমভাবে বাঁটিয়া দিয়া যে ভাবে ছন্দ রক্ষা করা হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি; ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাচীন পয়ারের পাঠরীতিতে যে সুর ছিল সেই সুরের বশে প্রত্যেক পদকেই চার মাত্রার ধ্বনিপর্ব্বে ভাগ করিয়া লওয়া সম্ভব ছিল; রবীন্দ্রনাথ এই চার মাত্রাকে দুইএর গুণিতক ধরিয়া বাংলা ছন্দের যে দ্বৈমাত্রিক চাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা এই পয়ারজাতীয় ছন্দেও প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীন পয়ারের পদ-পর্ব্ব এইরূপ—

মহা-ভার • তের-কথা • অমৃ-তস • মা—ন্

* * *

তোমা-নিতে • দশ-রথ • আসি-ছে আ • পনি—

—এইরূপ চার মাত্রার পর্ব্ব ধরিলে, তাহারা যে দ্বৈমাত্রিক (দুইএর গুণিতক) এমন কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে ইহা আধুনিক পয়ার না হইয়া গীতিচ্ছন্দ হইয়াছে—প্রত্যেক চরণে তিনটি চার-মাত্রার পর্ব্ব এবং শেষে একটি খণ্ড-পর্ব্ব আছে; তাহাও সুরে পূরণ করিয়া চার মাত্রায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক চরণ এখানে ষোল মাত্রার। আধুনিক পয়ারে এইরূপ পর্ব্ব-ভাগ নাই, এবং খণ্ড-পর্ব্বও নাই। আবার, আধুনিক গীতিচ্ছন্দে সুর নাই; পর্ব্বজনিত একরূপ ছন্দতরঙ্গ আছে, তাহার ফলে খণ্ড-পর্ব্বেরও সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সেই খণ্ড-পর্ব্ব মূল-পর্ব্বের সমান না হইয়া নানা পরিমাণের হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে, যথা—

শোন্ সখী | গায় কারা | আজ রাতে | গুজরাতি | গরবা

—এখানে চার-মাত্রার পর্ব্ব ও শেষে তিন-মাত্রার খণ্ড-পর্ব্ব আছে। তেমনই—

ধীরে ধীরে | আঁখি নীরে | ফিরে যায় | সে

কিম্বা—

ফিরে ফিরে | আঁখি নীরে | পিছুপানে | চায়

—এই দুটিতে, যথাক্রমে ১ ও ২ মাত্রার খণ্ড-পর্ব্ব আছে। অতএব, প্রাচীন সুরযুক্ত পয়ারের দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব এবং অখণ্ড-খণ্ডপর্ব্ব প্রভৃতি স্বীকার করিলেও

তাহা, আমার শ্রেণীভেদ অনুসারে, গীতিচ্ছন্দভুক্ত হয়—পয়ারজাতীয় ছন্দ নয়। তথাপি, রবীন্দ্রনাথের দ্বৈমাত্রিক ও ত্রৈমাত্রিক ছন্দ-ভেদ, পর্ব্বভূমক গীতিচ্ছন্দ সম্বন্ধেই অতিশয় যথার্থ হইলেও, পয়ার-জাতীয় ছন্দেরও এক অর্থে এই দ্বৈমাত্রিক লক্ষণ আছে। ঐ ছন্দের সর্ব্ববিধ পদের অন্তর্গত ধ্বনিভাগ (sound group) সর্ব্বত্র দুই বা চার মাত্রার না হইলেও, সমগ্র পদে যে ধ্বনিপ্রবাহ আছে তাহার লয় দুই মাত্রার; এইজন্যই ৩+৩+২, ৪+৪, ২+৪,—এমন কি, ৩+৩—পদচ্ছেদ যেমনই হউক, তাহাতে ছন্দের প্রকৃতিভেদ হয় না; সর্ব্বত্রই মাত্রা-পরিমাণ দুইএর গুণিতক বলিয়াই মনে হয়। ছন্দের এই সম-গতির মূলে আছে দ্বৈমাত্রিক প্রভাব —আমি ইহাকে দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব না বলিয়া 'দ্বৈমাত্রিক লয়' বলিব। পয়ারের মাত্রা-গণনাতেও আমরা দেখিয়াছি, পদমধ্যগত সকল বর্ণ বা ধ্বনিস্থানে পদের মোট মাত্রা-পরিমাণ সমান ওজনে বাঁটা হইয়া যায়; অর্দ্ধোচ্চারিত বা ঈষৎ-উচ্চারিত ধ্বনিস্থানগুলি, পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান হইতে ধ্বনিমাত্রা পূরণ করিয়া, অথবা পরবর্ত্তী স্থানে ধ্বনিমাত্রা মিলাইয়া দিয়া, সমগ্র পদ তথা চরণের পরিমাণ ঠিক রাখে। এই সমতা-রক্ষার মূলে আছে ছন্দ-ধারার যে আমন্থর গতি-বেগ, আমি তাহাকেই দ্বৈমাত্রিক লয় বলিয়াছি; ইহা দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব নয়। পর্ব্ব-হিসাবে দ্বৈমাত্রিক ও ত্রৈমাত্রিকের গতিবেগ দ্রুততর—পর্ব্বজনিত ছন্দস্পন্দই তাহার কারণ। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক।—

নিখিল আকাশ ভরা | আলোর মহিমা

—ইহা একটি আধুনিক পয়ারের চরণ। প্রথম পদটি আট মাত্রার ৩+৩+২: পড়ি এইরূপ—'নি´ খি—ল্ আ´কা—শ্ + ভরা'; প্রথম ধ্বনিভাগ ('নিখিল') একটু পৃথক থাকে, দ্বিতীয় ধ্বনিভাগ ('আকাশ') তৃতীয় ধ্বনিভাগের ('ভরা') উপরে গিয়া পড়ে—ইহাতে সমান তিনের চাল বজায় থাকে না। তারপর, 'নিখিলে'র আদ্য অক্ষরে যে ঠেস (stress) আছে, তাহা অন্ত্য অক্ষরের (হসন্তযুক্ত) স্বর-প্রসারণের জন্য কতকটা সমীভূত হইয়া যায়, এজন্য গীতিচ্ছন্দের পর্ব্বের মত উহা স্পন্দিত হইতে পারে না। 'আকাশ'ও ঠিক তাই, তার উপরে 'ভরা' যেন ঠেকা দিয়া তাহার ধ্বনিস্রোতকে সংযত করিয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র পদটিতে যে একটি সমান অবিচ্ছিন্ন গতিবেগ ঘটিয়াছে তাহার ছন্দ যেমন

পদভূমক, তেমনই তাহার লয়ের মূলে ঐ আট-মাত্রার ন্যূনতম সমভাগ-হিসাবে দুইএর প্রভাবই আছে। ঠেস-এর হিসাব না করিয়া ওই লয়ের চিত্র এইরূপ দাঁড়ায়—

নিখি—ইল্ আ—কাশ্—ভরা | আলো—ওর্ ম—হিমা

ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই চরণের প্রথম পদ আট-মাত্রার হইলেও, দ্বিতীয় পদটি শুধু ছয়মাত্রার নয়—৩+৩ ধ্বনি-ভাগও তাহাতে আছে; কিন্তু তথাপি ইহা ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বের মত পৃথক স্পন্দিত হইতে পারে না; তার কারণ, উহা সর্ব্বদা প্রথম পদের লয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইজন্যই এই চৌদ্দ-মাত্রার চরণে (অমিত্রাক্ষর নয়) ৮+৬-এর স্থানে ৬+৮ হইলে ছন্দই ভিন্নরূপ ধারণ করে। 'নিখিল আকাশ ভরা আলোর মহিমা' এই চরণটিকে যদি ৬+৮ করিয়া লওয়া যায়, যথা—

আলোর মহিমা নিখিল আকাশ ভরা

অমনই উহা খাঁটি ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বভূমক ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়—ছন্দের ঠাট বদল হইয়া যায়, পয়ারছন্দ গীতিচ্ছন্দে পরিণত হয়।

পর্ব্বভূমক ছন্দ, এবং তাহার পর্ব্বের দ্বৈমাত্রিক ও ত্রৈমাত্রিক গঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে, আমি আদি-পয়ারের চতুর্ম্মাত্রিক পর্ব্বাভাস সম্বন্ধে এইখানে কিছু বলিব। যাহাকে আমরা আধুনিক ছন্দে চার-মাত্রার পর্ব্বহিসাবে গণনা করি—রবীন্দ্রনাথ যাহাকে মূলে দ্বৈমাত্রিক বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তাহার ঐ চার-মাত্রার আয়তন বাংলা বাক্যেরই একটি স্বাভাবিক ধ্বনি-ভাগ (sound group) বলিয়া মনে হয়—তাহার মাপ যেমন করিয়াই করা হউক। সাধুভাষার গীতিচ্ছন্দ এবং প্রাকৃত ভাষার ছড়ার ছন্দ—অর্থাৎ দুই জাতেরই বাংলা ভাষা—এই চারের ঘরে আসিয়া যেমন মিতালি করে তেমন আর কোথাও নয়; সে রহস্যের কথা আমি পরে পর্ব্ব-বিচারের সময়ে দৃষ্টান্ত সহকারে বলিব। এক্ষণে পয়ারের এই চারি-মাত্রার পদচ্ছেদ ব্যাপারে, সংস্কৃত ও বাংলা—কাহার প্রভাব কতখানি, সে সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ আছে তাহারই উল্লেখ করিব—অর্থাৎ, প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রধান ছন্দ এই পয়ারও যে এইরূপ চারের ছক-কাটা, তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব কতখানি? জয়দেবের 'বিহরতি হরিরিহ সরস

বসন্তে' খাঁটি মাত্রা-ছন্দ হইলেও মাত্রা-বৃত্ত নয়, উহার ঐ চারের চালই উহাকে যে খাঁটি পর্ব্বভূমক করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে বাংলার প্রভাব আছে কিনা? আবার ইহাও দেখা যায় যে, সংস্কৃত অনুষ্টুভ ছন্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভাঙিয়া তাহার ধ্বনি-প্রবাহকে বাংলার মত সমতল করিয়া লইলে, তাহাও এইরূপ চারের ভাগে ভাগ হইয়া পড়ে। এই ছন্দেও দুই পদ, প্রত্যেকটিতে আট অক্ষর আছে; ইহার কয়েকটি স্থান নির্দ্দিষ্টভাবে গুরু-লঘু হইলেও সে বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতাও আছে। এজন্য পড়িবার সময়ে, চার-মাত্রার তাল রাখিয়া, ও প্রতি পর্ব্বের আদ্য অক্ষরে বাংলা উচ্চারণের ঝোঁক দিয়া, ইহাকে বাংলা কায়দায় আয়ত্ত করা যায়, যথা—

তস্মিন বিপ্র | কৃতা কালে | তারকেণ | দিবৌকসঃ

এইজন্যই বাংলা সাধু ও কথ্য, উভয় ভাষায়, এই সংস্কৃত পদ্যপংক্তিটিকে অনুচ্ছন্দিত করা যায়, যথা—

রাত্রিকালে | দুর্জ্জনেরা—হুঙ্কারিল | লুণ্ঠনাশে

এবং—

রাতের বেলায় | ডাকাতগুলো | হাঁকার দিল | লুটের আশে

[প্রথমটি চার অক্ষরের হইলেও সাধুভাষার পঞ্চমাত্রিক পর্ব্বভূমক ছন্দ, দ্বিতীয়টি কথ্যভাষার সাধারণ ছড়া-ছন্দ—চার অক্ষরের (Syllable) পর্ব্বভূমক ছন্দ। এই দুই ছন্দ এক জাতির নয়, অর্থাৎ ঠাট বা ঢঙই পৃথক নয়—ভিন্ন ভাষার মত, জাতিও পৃথক।]

এককালে রামায়ণ মহাভারত অনুবাদের যুগে সংস্কৃত অনুষ্টুভ ছন্দ বাঙালী কবির কানে অধিকতর পরিচিত ও অভ্যস্ত হওয়ার ফলে, বাংলা কথ্য-ভাষার সাধারণ উচ্চারণ রীতিকেই সাধুভাষার স্বরধ্বনি-প্রধান উচ্চারণের বশীভূত করিয়া, জয়দেবের সেই বাংলা-সংস্কৃত ছন্দ অধিকতর বাংলা হইয়া উঠিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহের কথা উল্লেখ করিলাম; যদিও, আমি বাংলা ছন্দের যে পরিচয় দিতে বসিয়াছি, তাহার পক্ষে এরূপ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

এক্ষণে আমি গীতিচ্ছন্দের পর্ব্ব ও তাহার গঠনের কথা আর একটু সবিস্তারে

বলিব। রবীন্দ্রনাথের মতে দ্বৈমাত্রিক 'চলন' এইরূপ, এবং তাহা সম-চলনের ছন্দ—

ফিরে ফিরে আঁখিনীরে পিছুপানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা পড়ে চলা হলো দায়।

('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

তিন-মাত্রার 'চলন', এবং তাহা অসম-চলনের ছন্দ—

নয়নধারায় পথ সে হারায়
চায় সে পিছনপানে। (ঐ)

এবং বিষম-'চলনে'র ছন্দ এইরূপ—

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভ'রে ওঠে। (ঐ)

এই 'চলন'ই আমার 'পর্ব্ব'—এবং আমি এই পর্ব্বের গঠন অনুসারে দ্বৈমাত্রিক ও ত্রৈমাত্রিককে সম-পর্ব্ব, এবং দুই-তিন-মাত্রার মিশ্র-পর্ব্বকে অসম-পর্ব্ব বলিব; কারণ, কোন ছন্দের সকল পর্ব্বই যদি দুই বা তিন সমান মাত্রার হয়, তবে একটিকে 'সম' ও অপরটিকে 'অসম' বলিবার কোন হেতু নাই। চলনের ভঙ্গি সম বা অসম হউক, পর্ব্ব-মাত্রা যখন সমান, তখন পর্ব্ব-হিসাবে সে ছন্দ সম-পর্ব্বের ছন্দই বটে। দুই ও তিন-মাত্রার মিশ্র-পর্ব্বের চলন কানেও অসমান ঠেকে, তাই তাহাকে এক অর্থে অসম-পর্ব্ব বলা যায়—যদিও মোট পর্ব্বের আকার বা পরিমাণ ধরিলে, কোন চরণের প্রত্যেকটি যদি একরূপ হয়, তাহা হইলে সেখানেও সেই ছন্দ সম-পর্ব্বের ছন্দ—অসম-পর্ব্বী নয়। যথা—

একদা+তুমি | অঙ্গ+ধরি | ফিরিতে+নব | ভুবনে

(রবীন্দ্রনাথ)

কিম্বা

তরণী+বেয়ে শেষে | এসেছি+ভাঙা ঘাটে।
স্থলে না+মেলে ঠাঁই | জলে না+দিন কাটে।

('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

*　　*　　*

শুনহে সভাজন | ঘটনা বিবরণ | এ রোষ অকারণ | নহে।

এইগুলির সকল পর্ব্বই সমান, অতএব ছন্দের চলন যেমনই হউক—কেহই অসম-পর্ব্বী নহে। কিন্তু যদি এমন হয়—

বাদল+রাতি | এল ঘরে |
বসিয়াছিনু | একা একা।
গভীর+শুক | গুরু রবে |
কী ছবি+মনে | দিল দেখা।

('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

কিম্বা—

কেবলি+অহরহ | মনে মনে |
নীরবে | তোমা সনে |
যা খুসি | কহি কত।
বিরহ+ব্যথা মম | নিজে নিজে |
তোমারি+মূরতি যে |
গড়িছে | অবিরত। (ঐ)

—তাহা হইলে এ ছন্দকে অসমপর্ব্বী বলিতেই হইবে। সংস্কৃত ছন্দের অধিকাংশই এইরূপ।

ইহাই হইল সম ও অসম পর্ব্বের ভেদ। কিন্তু উপরের উদ্ধৃত ও পূর্ব্বে উদ্ধৃত উদাহরণে, পর্ব্বের লক্ষণে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা যাইবে; পর্ব্বগুলি মূলে দ্বৈমাত্রিক ও ত্রৈমাত্রিক হইলেও ইহারা প্রায়ই অযুক্ত অবস্থায় থাকে না—দুইটি পর্ব্ব সংযুক্ত হইয়া যুক্ত-পর্ব্বের সৃষ্টি করে; এজন্য পর্ব্ব দ্বৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক হইলেও তাহারা কার্য্যতঃ ৪ বা ৬ মাত্রার পর্ব্ব হইয়া থাকে; মিশ্র পর্ব্বে এইরূপ সংযুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক, এবং অনিবার্য্য। রবীন্দ্রনাথ দুই ও চারের পর্ব্ব-ভেদ দেখাইয়াছেন বটে, যথা—

(দ্বৈমাত্রিক)

তারাগুলি সারারাতি কানে-কানে কয়।
সেই কথা ফুলে-ফুলে ফুটে বনময়। ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

(চতুর্মাত্রিক)

চকমকি ঠোকাঠুকি আগুনের প্রায়,
চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়। (ঐ)

কিন্তু এ ভেদ চোখে-দেখার, কানে-শোনার নয়। বরং এ কথা সাধারণভাবে বলা যায় যে, বাংলা গীতিচ্ছন্দে দুই মাত্রার শব্দ কিছুতেই একা থাকিতে পারে না—এমন কি—

ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্

এখানে, 'রিম্' 'ঝিম্'—এই দুই মাত্রার ধ্বনিখণ্ডগুলির মধ্যে একটু ছেদ আবশ্যক হইলেও তাহারা পরস্পর সংযুক্ত না হইয়া পারে না। যেখানে আদ্যখণ্ডগুলি হসন্ত-প্রধান, সেখানে প্রত্যেক খণ্ডে একটি প্রবল ঠেস (stress) থাকার জন্য পর্ব্বগুলি চার-মাত্রার অধিকতর পক্ষপাতী, যথা—

শোন্-সখি—গায়্-কারা—আজ্-রাতে—গুজ্-রাতি—গব্‌বা

*   *   *

উভয় খণ্ড হসন্ত-প্রধান হইলেও আদ্যখণ্ডের ঝোঁক প্রবলতর হয় বলিয়া, শেষের খণ্ডটিকে সঙ্গে টানিয়া লয়, যথা—

খুব্ তাব্—বোল্ চাল্,—সাজ্ ফিট্—কাট্। ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

অতএব, বাংলা ছন্দের দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব কার্য্যত চার মাত্রার পর্ব্ব; এবং সর্ব্বত্র—এমন কি, অসম বা দুই ও তিন মাত্রার মিশ্র-পর্ব্বেও, ইহারা তিন-মাত্রার পর্ব্বে সংসক্ত হইয়া—২+৩, ৩+২, ৪+৩ প্রভৃতি—যুক্ত-পর্ব্বের সৃষ্টি করে, উপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে তাহার দৃষ্টান্ত আছে।

কিন্তু তিন-মাত্রার পর্ব্ব সাধারণতঃ এইরূপ যুক্ত-পর্ব্ব হইয়া উঠিলেও পৃথক অযুক্তরূপেও ছন্দ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে; সেখানে স্পষ্ট পর্ব্বচ্ছেদ রক্ষা করিয়া পড়াই শ্রুতিসুখকর; যেমন—

নয়ন • ধারায় • পথ সে • হারায় • চায় সে • পিছন • পানে

কিম্বা—

চাষের • সময়ে • যদিও • করিনি • হেলা।
ভুলিয়া • ছিলাম • ফসল • কাটার • বেলা।

এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উপরে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে যে ধরণের

ছন্দস্পন্দ সহজে সাড়া দিয়া উঠে, তাহারই বশে পর্ব্বগুলির খাঁটি ত্রৈমাত্রিক চলন আপনি আসিয়া পড়ে। কিন্তু—

বনপথে আজ • ফুলদোললীলা •

কুসুম ভাঙে • রঞ্জন,

*　　*　　*

কাদের • মশালে • আকাশের ভালে •

আগুন উঠেছে • ফুটে।

*　　*　　*

ভূতের মতন • চেহারা যেমন • নির্ব্বোধ অতি • ঘোর।

*　　*　　*

পউষ-প্রখর • শীতে জর্জ্জর • ঝিল্লীমুখর • রাতি

—এইরূপ চরণগুলিতে, কোথাও (যেমন প্রথমটিতে) দুইটি তিন মাত্রার পর্ব্ব ছয়-মাত্রায় একাকার হইয়াছে; কোথাও বা তিন-মাত্রার পর্ব্বভাগ থাকিলেও পর্ব্বগুলি জোড়ায় জোড়ায় চলিয়াছে, কারণ প্রথম পর্ব্বের আদ্য-অক্ষরের ঝোঁকই প্রধান—দ্বিতীয় পর্ব্বে ঝোঁক থাকিলেও তাহা পর্ব্বটিকে পৃথক করিবার মত প্রবল নহে (যেমন, তৃতীয় উদাহরণে)। দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম দুইটি পর্ব্ব পৃথক, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় জোড়ার পর্ব্ব অযুক্ত নহে; 'আগুন উঠেছে'—একসঙ্গে ছয় মাত্রার চাল, কারণ এখানে উহা তৃতীয় উদাহরণের 'ভূতের মতন'-এর সামিল—পরের পর্ব্বটিকে পৃথক করিবার মত কোন প্রবল ঝোঁক তাহাতে নাই। চতুর্থ উদাহরণের সবগুলিই যুক্ত-পর্ব্ব, তার কারণ, প্রত্যেকটিই সমাসবদ্ধ পদ। এই সকল কারণে ত্রৈমাত্রিক পর্ব্ব সাধারণত ছয় মাত্রার যুক্ত-পর্ব্ব হইয়া দাঁড়ায়।

উপরে উদ্ধৃত ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বের কেবল গঠন-বৈচিত্র্যই লক্ষণীয় নয়—পর্ব্বের মধ্যে বর্ণবিন্যাসজনিত ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দস্পন্দের যে অশেষ বৈচিত্র্য আছে, তাহাও লক্ষণীয়। ছন্দের রূপ কেবল গণিতের আয়ত্ত নয়, কানের সূক্ষ্মতম ধ্বনিস্বাদ-বোধও চাই। কানে যাহা অনুভূত হয়—ধ্বনির সেই বহুবৈচিত্র্যকে ধ্বনি-বিজ্ঞান বা গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে বিধিবদ্ধ করাও সম্ভব। কিন্তু যাহার কান নাই তাহাকে এই বিধি-বিধান শিক্ষা দিয়া কোন ফল নাই; আবার যাহার কান আছে তাহার পক্ষে ছন্দের রূপবৈচিত্র্য ছন্দ-সূত্রের অপেক্ষা রাখে না—সেরূপ সূত্ররাজি

তাহার একটা পৃথক কৌতূহল চরিতার্থ করে মাত্র। আমি এখানে কোনও কারণ বা সূত্র নির্দ্দেশ না করিয়া এই পর্ব্বভূমক গীতিচ্ছন্দের বিবিধ পর্ব্ব ও তাহাদের ছন্দস্পন্দ (rhythm) যে কত বিচিত্র হয়, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিব ; আশা করি, তাহাতেই ছন্দবোধের যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব

ধরণীর • আঁখি-নীর • মোচনের • ছলে।
দেবতার • অবতার • বসুধার • তলে। ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

* *

মেঘ ডাকে • গম্ভীর • গরজনে,
ছায়া নামে • তমালের • বনে বনে। (ঐ)

* *

কেন তার • মুখ ভার • বুক ধুক্ • ধুক্,
চোখ লাল • লাজে গাল • রাঙা টুক্ • টুক্। (ঐ)

* *

কি বলিলি | মালিনী— | ফিরে বল্ | বল্।
রসে তনু | ডগমগ | তনু টল্ | মল্। (ভারতচন্দ্র)

* *

সুদূর দি • গন্তের • সকরুণ • সঙ্গীত
লাগে মোর • চিন্তায় • কাজে। (রবীন্দ্রনাথ)

* *

হিল্লোলে • হেথা দোলে • লাবণ্য • পান্নার।
বিভূতিব • বিভা ছায় • সারা গায় • হোথা কার। (সত্যেন্দ্রনাথ)

ত্রৈমাত্রিক পর্ব্ব

আঁধার • রজনী • পোহাল
জগৎ • পূরিল • পুলকে, ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

* *

তোমরা • হাসিয়া • বহিয়া • চলিয়া • যাও
কুলু কুলু কল • নদীর • স্রোতের • মত।
আমরা • তীরেতে • দাঁড়ায়ে • চাহিয়া • থাকি
মরমে • গুমরি • মরিছে • কামনা • কত। (ঐ)

* * *

সেদিন কি তুমি | এসেছিলে ওগো | সেকি তুমি মোর | সভাতে।
সেদিন ফাগুন | মেতে উঠেছিল | মদ-বিহ্বল | শোভাতে। (রবীন্দ্রনাথ)

*   *   *

হায়,—গগন নহিলে | তোমারে ধরিবে | কেবা।
ওগো,—তপন তোমার | স্বপন দেখি যে | করিতে পারিনে | সেবা।
(ঐ)

মিশ্রপর্ব্ব—সম

(৪+৩—৪+৩) নয়নের ∘ সলিলে | যে কথাটি ∘ বলিলে ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

*   *

(৩+৪—৩+৪) ফাগুন ∘ এল দ্বারে | কেহ যে ∘ ঘরে নাই,
পরাণ ∘ ডাকে কারে | ভাবিয়া ∘ নাহি পাই। (ঐ)

*   *

(৩+২—৩+২—৩+১) শ্রাবণ ∘ মেঘে | তিমির ∘ ঘন | শর্ব্বরী,
বরিষে ∘ জল | কানন ∘ তল | মর্ম্মরি। (ঐ)

*   *

(৩+২—৩+২—৩+২—২) সকল ∘ বেলা | কাটিয়া ∘ গেল | বিকাল ∘ নাহি | যায় (ঐ)

*   *

(৩+২—৩+২—২) তমাল ∘ বনে | ঝরিছে ∘ বারি- | ধারা।
তড়িৎ ∘ ছুটে | আঁধারে ∘ দিশা | হারা। (ঐ)

*   *

(৩+৪—৩+৪—৩+৪—৩) নিশান ∘ ফর ফর | নিনাদ ∘ ধর ধর | কামান ∘ গর গর | গর্জ্জে।
(ভারতচন্দ্র—পরিবর্ত্তিত)

*   *   *

(৩+৪—৩+৪—৩+৪—৩+৪) মৈত্র ∘ করুণার | মন্ত্র ∘ দিতে দান | জাগ হে ∘ মহীয়ান্ | মরতে ∘ মহিমায়। (সত্যেন্দ্রনাথ)

মিশ্রপর্ব্ব—অসম

(৫—৪ | ৫—৪) দুয়ার ∘ মম | পথপাশে | সদাই ∘ তারে | খুলে রাখি।
কখন ∘ তার | রথ আসে | ব্যাকুল ∘ হয়ে | জাগে আঁখি।
('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

*   *   *

(৩+৪—৩+২)— ফুলের • পথে পথে | বাজিছে • যারে
নূপুর • রুনুঝুনু | কাহার • পায়ে। ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

* *

(৫—৩ | ৫—৩) শ্রাবণ ধারে • সঘনে | কাঁদিয়া মরে • যামিনী। (ঐ)

* *

(৩+৪—৪) মিলন • সুলগনে | কেন বল্।
নয়ন • করে তোর | ছল্ ছল্। (ঐ)

* *

(৩+৪+৪+৩) চাহিছ • বারে বারে • আপনারে • ঢাকিতে।
মন না • মানে মানা • মেলে ডানা • আঁখিতে। (ঐ)

* * * *

(৫+৩+৫) নীরবে গেলে • ম্লান মুখে • আঁচল টানি।
কাঁদিছে দুখে • মোর বুকে • না-বলা বাণী। (ঐ)

সমমাত্রিক—অসম

[এমনও দেখা যায়, পর্ব্বগুলি সমান ষৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক হইলেও, ৪+২ বা ৩+৬-এর পর্য্যায়ে মাঝে মাঝে এমন ছেদ পড়ে যে, চাল বেশ অসম হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে ৪।২ বা ৬।৩ যেন অসম পর্ব্বের মত কাজ করে। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, পর্ব্ব সমমাত্রিক হইলেও, তাহাদের পর্য্যায়-গত ধ্বনিতরঙ্গের গুরু-লঘু ঝোঁকগুলির (accent) বিশিষ্ট স্থানবিন্যাসই এইরূপ অসমতার কারণ। আমি এইরূপ ছন্দের তিনটি মাত্র উদাহরণ এখানে দিলাম, আরও নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।]

(১) নদীতীরে • দুই | কূলে কূলে | কাশবন | দুলিছে |

পূর্ণিমা • তারি | ফুলে ফুলে | আপনারে | ভুলিছে।
('ছন্দ',—রবীন্দ্রনাথ)

(২) আজি, ফাল্গুন-বন-পল্লব-ছায় কোন্ কোন্ রঙ্ ফুট্‌ল।
কেন, কিংশুক-ফুল চীন-বাস গায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। (করুণানিধান)

[এখানে পর্ব্বের প্রত্যেক অক্ষর, হসন্তবর্ণ-যোগে, যুগ্ম দুই-মাত্রার গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। তার উপরে, আদ্যপর্ব্বের পূর্ব্বে একটি Hypermetric বা ছন্দাতিরিক্ত শব্দ (আজি, কেন) থাকার জন্য ঐ পর্ব্বের আদ্য অক্ষরে প্রবল ঝোঁক পড়িয়াছে। এ চরণের চাল এইরূপ—

(আজি) ফাল্—গুন্+বন্ • পল্—লব্-ছায় • কোন্—কোন্+রঙ্ • ফুট্‌ল

প্রথম পর্ব্বের আদ্য অক্ষরের প্রবল আঘাত পরবর্ত্তী সকল পর্ব্বে ওই স্থানে একই রূপ পড়িবে—ইহাই স্বাভাবিক। সত্যেন্দ্রনাথের 'ওই সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ' এই একই ছন্দ।]

(৩) ভালবেসে সখি | নিভৃতে যতনে

আমার। নামটি লিখিয়ো | তোমার

মনের মন্দি-রে।

আমার। পরাণে যে গান | বাজিছে

তাহারি | তালটি শিখিয়ো | তোমার

চরণ-মঞ্জী-রে।

[উপরের উদাহরণগুলিতে অক্ষরের মাথায় যে (´) চিহ্ন আছে, তাহা ঝোঁক-(accent)-চিহ্ন; সর্ব্বশেষেরটিতে ভাব-অর্থের ঝোঁক এইরূপ পড়ে—তাহাতেই ছন্দটি অসম-মাত্রিক হয়, কেবল ছন্দ অনুযায়ী পড়িলে সম-মাত্রিকই থাকে।]

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে গীতিচ্ছন্দের গঠন—তাহার নানাবিধ পর্ব্ব এবং পর্ব্ববিন্যাসজনিত ছন্দ-বৈচিত্র্যের একটা মোটামুটি ধারণা হইবে। আমি উপস্থিত এগুলি বারংবার পাঠ করিয়া কানের পরিচয় ঠিক করিয়া লইতে বলি। কোন সূত্র বা নিয়ম-কানুনের চিন্তা না করিয়া—অর্থাৎ চোখে অণুবীক্ষণ লাগানোর মত, কানে কোনও ধ্বনি-বিশ্লেষণ-যন্ত্র না লাগাইয়া, সাদা চোখের মত, সাদা কানে প্রথমে এগুলিকে বাজাইয়া লওয়াই সুবুদ্ধিসঙ্গত। তাহার পর, দ্বৈমাত্রিক-ত্রৈমাত্রিক, সম-অসম প্রভৃতি সাধারণ পর্ব্বভেদ সত্ত্বেও, প্রত্যেকের মধ্যে যে ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য আছে তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য, যেটুকু ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা একান্ত আবশ্যক, তাহা করিলেই চলিবে। আমি অতঃপর, এই গীতিচ্ছন্দের বৈচিত্র্য-সাধনে খণ্ড-পর্ব্বের যে কাজ, ত্রৈমাত্রিক ছন্দে তিন-মাত্রার যুক্ত-পর্ব্ব এবং একাকার ছয়-মাত্রার পর্ব্ব প্রভৃতির বিশেষত্ব, এবং পর্ব্ব-মধ্যেও ঝোঁক (accent) গুলির স্থান-পরিবর্ত্তনে ছন্দস্পন্দনের যে বৈচিত্র্য-বিধান—সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব; এবং পরে পুনরায় পর্ব্ব ও পদ—পয়ার ও গীতিচ্ছন্দ সম্বন্ধে, আরও কিছু বলিব।

তৃতীয় অধ্যায়

'পদ' ও 'পর্ব্ব'—দুইয়ের প্রকৃতি-ভেদ ; পর্ব্বভূমক ছন্দের—'ঝোঁক' (accent), ও তজ্জনিত ছন্দস্পন্দ (Rhythm) ; যুগ্মপর্ব্ব ও 'ঝোঁক' ; 'ঝোঁকে'র স্থান-পরিবর্ত্তনে ছন্দের স্পন্দন-বৈচিত্র্য (Rhythmical Variation) ; পর্ব্বভূমক ছন্দের 'খণ্ডপর্ব্ব' ; খণ্ডপর্ব্বের বিশেষ মূল্য—ইহাই এ ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈভবের একটি কারণ।

গীতিচ্ছন্দের পর্ব্ব ও পয়ার-ছন্দের পদ এই দুইয়ের প্রকৃতি ও প্রভেদ একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিবার সময় আসিয়াছে। আমি প্রথমেই পর্ব্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। পদ ও পর্ব্বের পার্থক্য কানে অতি সহজেই ধরা পড়িবে, যথা—

বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া—

এই পদভূমক পংক্তিগুলিকে যদি এমন ভাবে সাজানো যায়—

নব বসন্ত সেদিন ফিরিতেছিল
ভুবন ব্যাপিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া
প্রথম প্রেমের মত—

—তাহা হইলে স্পষ্ট অনুভব করা যাইবে, এবারে এক নূতন ধরণের ঝোঁক পংক্তিগুলিকে নূতন ভাবে স্পন্দিত করিতেছে। প্রথম পংক্তিগুলির উচ্চারণে শব্দগত ঝোঁকের যে তারতম্য আছে, তাহা আমাদের কানে ছন্দেরই একটা বৈশিষ্ট্য বলিয়া অনুভূত হয় না, তাহাতে কোন নিয়মিত পর্য্যায়ও নাই ; কিন্তু এই শেষের পংক্তিগুলির শব্দসজ্জায় একটা নিয়মিত ঝোঁক এবং তজ্জনিত ছন্দস্পন্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে আছে তিন বা ছয় মাত্রার ধ্বনিভাগ—

নব বসন্ত • সেদিন • ফিরিতে • ছিল
ভুবন ব্যাপিয়া • কাঁপিয়া • কাঁপিয়া
প্রথম • প্রেমের • মত—

ত্রৈমাত্রিক ছন্দে এই তিন ও ছয় মাত্রার পর্ব্বচ্ছেদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; এক্ষণে এই ছন্দের মূলীভূত ঝোঁক (Stress বা ঠেস) ও তদনুযায়ী পর্ব্বের গঠন

এবং ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্যের কথা বলিব। সাধারণত প্রত্যেক পর্ব্বে একটিমাত্র ঝোঁকই যথেষ্ট—যেখানে প্রতি তিন-মাত্রায় পৃথক ঝোঁক থাকে, সেইখানে তিন মাত্রার পর্ব্বই পাওয়া যায়; কিন্তু সচরাচর ছয়-মাত্রায় একটি ঝোঁকই থাকে—এবং এই ঝোঁকের উপরেই পর্ব্বচ্ছেদ ও নিয়মিত ছন্দস্পন্দ নির্ভর করে। তিন মাত্রার পর্ব্ব যেমন পৃথক ঝোঁকের জন্যই ঘটে, তেমনই বিশেষ যত্ন ও কৌশলের দ্বারাও সেইরূপ পর্ব্ব রচনা করা যায়। তিন ও দুই মাত্রার মিশ্র পর্ব্বেও ঝোঁক একটাই, অতএব এমন নিয়ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, এক একটি ঝোঁকেই এক একটি পর্ব্ব, এবং তাহারই নিয়মিত পর্য্যায়-গুণে গীতিচ্ছন্দের বিশিষ্ট ধ্বনি-তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে পাওয়া যাইবে।

দ্বৈমাত্রিক (২+২)

ˊমহাঋষি • ˊগাহিলেন • ˊবিকলিত • ˊবচনে (হেমচন্দ্র)

* *

ˊশোন সখি • ˊগায় কারা • ˊআজ রাতে • ˊগুজরাতি • ˊগরবা (সত্যেন্দ্রনাথ)

ত্রৈমাত্রিক (৩+৩)

ˊভূতের মতন • ˊচেহারা যেমন • ˊনির্ব্বোধ অতি • ˊঘোর (রবীন্দ্রনাথ)

মিশ্র (৩+২)

ˊনন্দপুর • ˊচন্দ্র বিনা • ˊবৃন্দাবন • ˊঅন্ধকার (কালিদাস)

সাত-মাত্রার মিশ্র-পর্ব্ব হইলে পর্ব্বমধ্যে দুইটি ঝোঁকই পড়ে, যথা—

ˊখাঁচার+ˊফাঁকে ফাঁকে • ˊপরশে+ˊমুখে মুখে

ˊনীরবে+ˊচোখে চোখে • ˊচায় (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে—কিন্তু আসলে এখানে পর্ব্বের মাত্রাপরিমাণ অতিরিক্ত বলিয়াই পর্ব্বটি যুগ্মপর্ব্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি উহা এক একটি গোটা পর্ব্বই বটে—পদ-ভাগ বা ছন্দ-ভাগ নহে; ইহারা যেন দুই-কুঁজওয়ালা উটের মত দুই-ঝোঁকওয়ালা পর্ব্ব!

ত্রৈমাত্রিক ছন্দ-সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকি আছে। আমি বলিয়াছি, এই ছন্দের পর্ব্ব তিন-মাত্রার হইলেও, সাধারণত উহা পুরা ছয়-মাত্রার, অর্থাৎ (৩+৩) এর যুক্তপর্ব্ব হইয়া থাকে। ইহার কারণ, এক-একটি ঝোঁকেই এক-এক পর্ব্ব হয়; যেখানে ছয়-মাত্রায় একটি ঝোঁকই প্রধান, সেখানে পর্ব্বও একটা হয়; আবার যেখানে, কোন কারণে, প্রত্যেক তিন-মাত্রায় স্বতন্ত্র ঝোঁক পড়ে, সেখানে পর্ব্ব-দুইটি যুক্ত না হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যথা—

বাসর-শয়ন॰ করেছি রচন ॰ কুসুম থরে

এখানে পৃথক তিন-মাত্রার পর্ব্ব নাই, ছয়-মাত্রার যুক্তপর্ব্বই আছে; তার কারণ, কোনটাতে একটার বেশী ঝোঁক নাই। কিন্তু—

সেই মুকুল আকুল বকুল-কুঞ্জ-ভবনে

এখানে পর্ব্বগুলি এক-একটি সমাসবদ্ধ পদ হইলেও, মিল ও অনুপ্রাসের খাতিরে, দ্বিধাবিভক্ত হইয়া প্রত্যেক তিন-মাত্রায় পৃথক ঝোঁক পাইয়াছে; এজন্য, পর্ব্বগুলিকে ছয়-মাত্রার না ধরিয়া তিন-মাত্রার ধরাই উচিত, যথা—

সেই—মুকুল ॰-আকুল ॰ বকুল ॰-কুঞ্জ ॰-ভবনে

কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন আছে। এই ছয়-মাত্রার পর্ব্বের অনেক সময়ে দ্বৈমাত্রিক ভাগ লক্ষ্য করা যায়—একই ছন্দে পর্ব্বের গঠন ৩+৩-এর পরিবর্ত্তে ৪+২ কিম্বা ২+৪ হইয়া থাকে, যথা—

সঘন ॰ বরষা ॰ গগন ॰ আঁধার

এই খাঁটি ত্রৈমাত্রিক ছন্দের দ্বিতীয় চরণটি এইরূপ—

হের বারিধারে ॰ কাঁদে চারিধার।

আবার পূর্ব্বোদ্ধৃত 'বাসর-শয়ন করেছি রচন'-এর পূর্ব্বের চরণটির গঠনও এইরূপ, যথা—

নিশিদিন তাই ॰ বহু অনুরাগে
(বাসর-শয়ন ॰ করেছি রচন
কুসুম-থরে)

এ সকল স্থানে ৩+৩-এর পরিবর্ত্তে, ২+৪ কিম্বা ৪+২-এর মত গঠন দেখা যায়। এক্ষণে ইহার ব্যাখ্যা কি হইতে পারে তাহাই বলিব। ইহারা যে দ্বৈমাত্রিক

চরণ নয় তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহা হইলে, ৪ + ২-এর ভাগে, গীতিচ্ছন্দ অনুসারে প্রথম চার-মাত্রায় একটি ঝোঁক, এবং শেষের দুই মাত্রায় আর একটি থাকিবার কথা, যেমন—

এনে দেব • চুল-বাঁধা। রাঙা ডোর•• প্রিয়া—('ঘাসের ফুল')

—ইহার শেষের ছয়-মাত্রার ছন্দভাগ দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। আবার, ২ + ৪ —এরূপ পর্ব্বচ্ছেদ দ্বৈমাত্রিক গীতিচ্ছন্দের স্বভাব নয়। পয়ার-ছন্দের দ্বৈমাত্রিক লয়ও ইহাতে নাই, কারণ তাহার ছন্দপ্রবাহই অন্যরূপ, যথা—

কি যাতনা বিষে। বুঝিবে সে কিসে। কভু আশীবিষে। দংশেনি যারে (কৃষ্ণচন্দ্র)

—এ ঝোঁকগুলি পর্ব্ব-স্পন্দের ঝোঁক নয়—ইহাদের একটাও ছন্দমূলক ঝোঁক বা Rhythmical Accent নয়। এই ছন্দে পর্ব্বসুলভ গতি-বেগ নাই, বরং পদান্ত-যতির জন্য পদের যেটুকু গতিরোধ হয় তাহাতে ঝোঁকগুলির ধাক্কা সামলাইয়া যায়, সেজন্য পদমধ্যে দ্বৈমাত্রিক বা ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বচ্ছেদের মত কিছু ঘটে না—ঝোঁকগুলি যেন সমস্ত পদ জুড়িয়া পরস্পরের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে; এবং এইজন্যই, কেবল উচ্চারণ-রীতির বশে দুইটি ঠেস পড়ে, তাহার মধ্যে কোনটি Rhetorical বা ভাব-অর্থঘটিত স্বরবৃদ্ধি হইতেও পারে। কিন্তু ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বের এই ৪ + ২ বা ২ + ৪ গঠনেও ঝোঁক একটিই, যথা—

করিলাম বাসা • মনে হল আশা

* * *

এ জগতে হায় • সেই বেশি চায় • আছে যার—ভূরি ভূরি

[এখানেও লক্ষ্য করা যাইবে যে, 'আছে যার ভূরি ভূরি' এই (৬+২)-এর ছন্দভাগ, Rhythmical Variation-এর জন্য দুইটি চার-মাত্রার দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।]

অতএব, এই যে একটিমাত্র ঝোঁক প্রধান হইয়া উঠা, এবং তজ্জন্য পর্ব্বমধ্যে আর কোনরূপ অবকাশ না থাকা—ইহার জন্যই, গঠন যেমনই হউক, এইরূপ পর্ব্বও ছয়-মাত্রার ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বই বটে, অর্থাৎ, ইহাও ত্রৈমাত্রিক লয়যুক্ত হয়।

আমি পূর্ব্বে পয়ারছন্দের ছয়-মাত্রার পদে, ত্রৈমাত্রিক পদচ্ছেদ সত্ত্বেও, দ্বৈমাত্রিক লয়ের কথা বলিয়াছি।

এই ঝোঁক ও তজ্জনিত নিয়মিত পর্ব্ব-পর্য্যায়ই গীতিচ্ছন্দকে পয়ার-ছন্দ হইতে অতিশয় বিলক্ষণ করিয়া তুলিয়াছে। আমি পদ ও পর্ব্বের পার্থক্যবিচার পরে করিতেছি, তৎপূর্ব্বে গীতিচ্ছন্দের পর্ব্বগত ঝোঁকের স্থান-পরিবর্ত্তনে ছন্দতরঙ্গের যে লীলাবৈচিত্র্য ঘটে, তাহার পরিচয় দিব। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই পর্ব্বগত ঝোঁক, আমাদের সাধারণ উচ্চারণ-রীতির বশে পর্ব্বের আদ্য-অক্ষরকেই আশ্রয় করে, এবং তাহাতেই সেই ঝোঁকগুলি নিয়মিতভাবে Rhythmical বা ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া থাকে—ভাব, অর্থ, অথবা বাক্যের অন্বয়মূলক হইবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু এইরূপ রীতিমত বা বিধিবদ্ধ ঝোঁক-বিন্যাস কবিতার ছন্দ-সুষমার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইলেও, তাহাতে ভাব, অর্থ ও কল্পনার গৌরব ক্ষুন্ন হয়, ভাবৈশ্বর্য্যহীন কৃত্রিমতাই প্রশ্রয় পায়। ভাবচ্ছন্দের সহিত কাব্যচ্ছন্দের মিল না হইলে কোন কবিতাই কবিতা হয় না; এবং বিধিবদ্ধ হইলেও ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্যই উৎকৃষ্ট ছন্দসঙ্গীতের লক্ষণ—বৈচিত্র্যের মধ্যেই যে ঐক্য, তাহাই সকল বৃহত্তর সঙ্গতির মূল। এই Rhythmical Variation বা ছন্দের স্পন্দন-বৈচিত্র্য সকল শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায় প্রচুর পরিমাণে মিলিবে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্যচ্ছন্দে ছন্দস্পন্দের যে বৈচিত্র্য আছে, তাহা অনুকরণকারীদের অনেকের কবিতায় নাই; এইজন্যই, এক দিকে যেমন ছন্দোদোষদুষ্ট কবিতা অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তেমনই ছুতার মিস্ত্রির মাপ-ঠিক-রাখা ছন্দে কবিতা রচনা করিলে, সে কবিতায় সত্যকার কাব্যপ্রেরণার অভাব তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। প্রাচীন ক্লাসিক্যাল ছন্দবিধির সুকঠিন ছাঁচ আধুনিক কাব্যের পক্ষে অচল; ভাবের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, প্রাণ ও কান দুয়েরই সহযোগে, ছন্দকে—কাব্যের বহিরঙ্গ নয়—অন্তরঙ্গরূপে পরিণত করিয়া, এ বিষয়ে যে নব্য ছন্দ-রীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতেও কাব্যের মুক্তিলাভ হইয়াছে। নিয়মিত ও অনিয়মিত দুইপ্রকার ঝোঁক ও তজ্জনিত পর্ব্বচ্ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য আমি কয়েকটি পদ্য-পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—নিয়মিত ঝোঁকের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেও দিয়াছি। যথা—

নন্দপুর • চন্দ্র বিনা • বৃন্দাবন • অন্ধকার (কালিদাস)

নিত্য তোমার • চিত্ত ভরিয়া • স্মরণ করি (রবীন্দ্রনাথ)

স্বর্গে যবে • মত্ত আশা • সর্পসম • ফোঁসে (ঐ)

আবার • ধীরে ধীরে • গেল ফিরে • আলসে ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু পরের গুলিতে এমন নিয়মিত ঝোঁক পড়িবার নিয়ম নাই—

করিলাম বাসা • মনে হল আশা • আরামে দিবস • যাবে (রবীন্দ্রনাথ)

চমকি উঠিল • শুনি কিঙ্কিণী • চাহিয়া দেখিল • দ্বারে (ঐ)

ওরে স্বপন-দেশের • পরী-বিহঙ্গী • পাখা মেলে—উড়ে আয় (যতীন্দ্রমোহন)

[এখানে 'পাখা মেলে উড়ে আয়' এই ছন্দভাগটি, ঝোঁকের স্থান-পরিবর্ত্তনের ফলে, দুইটি চার-মাত্রার পর্ব্বের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আসলে উহা ত্রৈমাত্রিক ৬+২। 'বিহঙ্গী'তে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বে একটু ঝোঁক পড়ে।]

আবার—

এমন+দিনে তারে • বলা যায়

এমন+ঘনঘোর • বরিষায়

এমন+মেঘস্বরে • বাদল+ঝরঝরে

তপন+হীন ঘন • তমসায়। (রবীন্দ্রনাথ)

—ইহার পর্ব্বগুলির নিয়মিত ঝোঁক, পাঠকের রুচি বা ভাবগ্রাহিতা অনুসারে স্থানান্তরিত করিলেও ক্ষতি হয় না, যথা—

এমন দিনে (তারে) বলা যায়

(এমন) ঘনঘোর বরিষায়

(এমন) মেঘস্বরে (বাদল) ঝরঝরে

তপনহীন (ঘন) তমসায়।

এখানে দুই কারণে ঝোঁকের স্থান বদল হইয়াছে, প্রথম—বন্ধনী-দেওয়া শব্দগুলিকে Hypermetric-এর মত পড়িয়া পরবর্ত্তী শব্দের ঝোঁক প্রবল করার জন্য। দ্বিতীয়—শব্দবিশেষের ভাব-অর্থের উপরেই জোর (rhetorical) দেওয়ার জন্য; পাঠকের নিজ ভাব ও রুচি অনুযায়ী পাঠভঙ্গির জন্য, ছন্দ বজায় রাখিয়াই, ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য ঘটানো যেমন সম্ভব, তেমনই আরও কয়েকটি কারণে ছন্দের তরঙ্গলীলা বা স্পন্দবৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে।—

(১) পর্ব্বের মধ্যে বা অন্তে যুক্তাক্ষর থাকিলে ঝোঁকের স্থান বদল হয়, যথা—

কোথা গেল সেই • মহান শান্ত
নব নির্ম্মল • শ্যামল কান্ত
উজ্জ্বল নীল • বসন-প্রান্ত
সুন্দর শুভ্র • ধরণী। (রবীন্দ্রনাথ)

* *

চমকি উঠিল • শুনি কিঙ্কিণী
চাহিয়া দেখিল • দ্বারে (ঐ)

উপরের পর্ব্বগুলি ত্রৈমাত্রিক ছয়-মাত্রার পর্ব্ব, প্রত্যেক পর্ব্বে প্রধান ঝোঁক একটাই—এইগুলিতে আমি ডবল-চিহ্ন দিয়াছি। অপর ঝোঁকগুলি অপ্রধান—তাহাতে যে চিহ্ন দিয়াছি তাহা না দিলেও চলে, তথাপি সূক্ষ্ম হিসাবের খাতিরে তাহা দিয়াছি, অন্যত্র দিব না। পাঠককে এই প্রধান ঝোঁকগুলিই সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতে বলি, তাহাতে ছন্দকে কানে আরও ভাল করিয়া বাজাইয়া লইবার সুবিধা হইবে।

(২) যুক্ত-স্বর বা diphthong-ও ঐ এক কাজ করিয়া থাকে, যথা—

একি কৌতুক • নিত্য নূতন • ওগো কৌতুক • ময়ী (রবীন্দ্রনাথ)

* * *

জলসিঞ্চিত • ক্ষিতি-সৌরভ • রভসে (ঐ)

(৩) পর্ব্বগত মিল বা অনুপ্রাসের জন্যও ঝোঁকের স্থান পরিবর্ত্তন হয়, এবং ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য ঘটে, যথা—

বাজে পূরবী-র • ছন্দে রবি-র

শেষ রাগিণী-র • বীণ [রবীন্দ্রনাথ]

[এখানে প্রতি পর্ব্বে দুইটি ঝোঁকই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—মধ্য-মিল বা অনুপ্রাসের বাজনা না বাজাইয়া উপায় নাই। এই দ্বিতীয় ঝোঁকগুলির প্রকৃতি কিন্তু স্বতন্ত্র।]

অথবা—

হের বারিধারে • কাঁদে চারিধার [রবীন্দ্রনাথ]

(৪) একই ত্রৈমাত্রিক ছন্দে যুক্ত ও অযুক্ত পর্ব্ব থাকায় ঝোঁকের স্থান সমান নিয়মিত হইতে পারে না, যথা—

গুরু গুরু মেঘ • গুমরি • গুমরি,

গরজে • গগনে • গগনে (রবীন্দ্রনাথ)

* *

না মানে • শাসন • বসন • বাসন • অশন • আসন • যত • (ঐ)

উপরি উদ্ধৃত উদাহরণ-দুইটির প্রথমটিতে ধ্বনির খাতিরে, ও দ্বিতীয়টিতে অর্থের খাতিরে, তিন মাত্রায় পৃথক ঝোঁক পড়িয়াছে। অর্থের খাতিরে ঝোঁক —যাহাকে ইংরেজীতে Rhetorical Accent বা Emphasis বলা হয়—খাঁটি গীতিকবিতার ছন্দ-প্রবাহে আবশ্যক হয় না; সেখানে সকল ঝোঁকই Rhythmical বা ছন্দানুবর্ত্তী হইলে ভাল হয়। কিন্তু গাথা বা কাহিনী (Ballad বা Narrative) কবিতায় এইরূপ ভাব বা অর্থঘটিত ঝোঁক প্রায় আসিয়া পড়ে, যথা—

দরজার পাশে • দাঁড়িয়ে সে হাসে | দেখে জ্বলে যায় • পিত্ত (রবীন্দ্রনাথ)

এখানে যে দুইটি স্থানে ডবল-চিহ্ন দিয়াছি—তাহা Rhythmical Accent নয় —Rhetorical Accent বা Emphasis। তথাপি এই ঝোঁকের স্থান-পরিবর্ত্তন

এত সহজে ঘটে যে, খাঁটি গীতি-কবিতাতেও এইরূপ পরিবর্তন অসম্ভব নহে, যথা—

ওই মন উদাসীন • ওই আশাহীন

ওই ভাষাহীন • কাকলি (রবীন্দ্রনাথ)

আবার এমন ভাবেও পড়া যায় —

ওই মন উদাসীন • ওই আশাহীন

ওই ভাষাহীন • কাকলি

ইহার কারণ অবশ্য ওই মিলের অনুপ্রাসই বটে।

পর্বভূমক গীতিচ্ছন্দে এই যে ঝোঁকের সৃষ্টি হয়, ইহা আদৌ পর্বের গঠনে মাত্রার একটা বিশেষ হিসাবের জন্য ঘটিলেও, হসন্তবর্ণ ও যুক্তবর্ণের বিন্যাস-কৌশলে এই ঝোঁকের অনেক তারতম্য ঘটে। সাধুভাষার প্রকৃতি স্বরধ্বনি-প্রধান বলিয়া, এই ঝোঁক সত্বেও তাহাতে পয়ারের মত যে মন্থর গতি-বেগ সম্ভব সে সম্বন্ধে পরে বলিব। এক্ষণে এই হসন্ত ও যুক্তবর্ণের জন্য ইহাতে যে ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য সাধারণত ঘটিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত দিব। যুক্তাক্ষরের অভাব হেতু ত্রৈমাত্রিক চরণের যে ছন্দস্পন্দ তাহা এইরূপ—

অনিমেষ তারা • নিবিড় নিশায়,
লহরীর লেশ • নাহি যমুনায়,
জনহীন পথ • আঁধারে মিশায়,
পাতাটি কাঁপে না • গাছে। (রবীন্দ্রনাথ)

ইহার সহিত নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির ছন্দস্পন্দনের তুলনা করিলে যুক্তাক্ষরের প্রভাব বুঝিতে পারা যাইবে—

ভক্ত-দেহের • রক্ত-লহরী • মুক্ত হইল • কি রে!
বীরগণ জন • নীরে
রক্ততিলক • ললাটে পরালো • পঞ্চনদীর • তীরে (রবীন্দ্রনাথ)

দ্বৈমাত্রিক ছন্দের একটি যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত চরণ এইরূপ—

বিভূতির • বিভা ছায় • সারাদেহে • হোথা কার (সত্যেন্দ্রনাথ)

ইহার সহিত তুলনীয় ঐ একই ছন্দের—

বজ্রেরি • তূর্য্যে এ • গর্জ্জেছে • কে আবার (নজরুল ইসলাম)

মিশ্র-পর্ব্বের যুক্তাক্ষরহীন চরণের ছন্দস্পন্দ, যথা—

কুসুম+রথে • মকর+কেতু • উড়িত+মধু • পবনে (রবীন্দ্রনাথ)

এবং যুক্তাক্ষরের প্রভাবে তাহার আর এক রূপ—

নন্দপুর • চন্দ্র বিনা • বৃন্দাবন • অন্ধকার

[মিশ্রপর্ব্বে দুই জাতীয় পর্ব্ব থাকে বলিয়া, ৩+২-এর প্রতি ভাগে একটি করিয়া পৃথক্ ঝোঁক পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম পর্ব্বে যুক্তাক্ষর থাকায়, এমন একটি প্রবল ঝোঁক পড়ে যে, তাহার জন্য দ্বিতীয় পর্ব্বের ঝোঁক লুপ্ত হইয়া যায়; তাই এই পাঁচ-মাত্রার পর্ব্বে একটি ঝোঁকই প্রধান হইয়া উঠে। পর্ব্বমধ্যস্থ হসন্তবর্ণের ফলেও এরূপ ঝোঁকের সৃষ্টি হয়, যথা—

থম্‌কে দিয়ে • চম্‌কে চেয়ে • থম্‌কে গেল • তক্ষুনি ('ঘাসের ফুল')

'নন্দপুর • চন্দ্র বিনা—' এই কারণে পাঁচ মাত্রায় একটিমাত্র ঝোঁক পাইয়াছে, কিন্তু—

কুসুম+রথে • মকর+কেতু • উড়িত+মধু • পবনে

—দুই ভাগে দুই ঝোঁক রক্ষা করিতেছে। ইহার কারণ—যেমন যুক্তাক্ষরের অভাব, তেমনই প্রত্যেক বর্ণ স্বরান্ত হওয়াতেও উহার ৩+২ পর্ব্বভাগ স্পষ্ট হইয়া উঠে; এবং সেইজন্য দুইটিতেই ঝোঁক পড়ে। 'এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে • তপনহীন ঘন তমসায়'—এখানেও প্রত্যেক বর্ণ স্বরান্ত হইলে ছন্দটি ঠিকমত বাজিয়া উঠে। কিন্তু পর্ব্বের এইরূপ গঠনে ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য ঘটে না—সংস্কৃত ছন্দের মত একঘেয়ে হইয়া উঠে।]

শুধু ঘন ঘন যুক্তাক্ষর-বিন্যাসই নয়—পর্ব্বান্ত হসন্ত-বর্ণ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিতে পারিলে, স্বর-প্রসারণের কোন অবকাশ আর থাকে না বলিয়া, এই বাংলা ছন্দেও প্রবল আঘাত-মূলক ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি করা যায়, যথা—

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন (নজরুল ইসলাম)

ইহা পড়িতে হইবে এইরূপ—

ওরে হত্যা-নয়াজ • স-ত্যা-গ্রহ শক্তি-রুদ্বো • ধন্

ইহার কোনখানে স্বর-প্রসারণের অবকাশমাত্র নাই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে, বাংলা গীতিচ্ছন্দে ঝোঁকের তারতম্য, ও তাহার মূলে হসন্ত, স্বরান্ত, ও যুক্তবর্ণের যে প্রভাব আছে, তাহার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইবে।

কিম্বা,

মাঝে গহ্‌ • বর তাহে • পশি জল • ধায়।
ছল ছল • করতালি • দেয় অনি • বায়॥ (ত্রৈমাত্রিক)

প্রথমটিতে যুক্তাক্ষরের জন্য কোন ঝোঁক নাই—কেবল, আট মাত্রার সমান প্রবাহের পরে যতি পড়িয়াছে; ইহাতে এক একটি পদের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে ঝোঁকের বশে নিয়মিত ধ্বনিভাগ বা পর্ব্বের সৃষ্টি হইয়াছে।

পর্ব্ব ও পদের প্রসঙ্গে, উভয়ের আর একটি ছন্দোগত পার্থক্যের কথা এইখানেই উল্লেখ করিব। গীতিচ্ছন্দের যে ছন্দস্পন্দ বা ধ্বনি-তরঙ্গের আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাতে আর একটি বস্তুর বিশেষ মূল্য আছে, ইহার নাম—খণ্ডপর্ব্ব, ইহা ছন্দের চরণান্তিক অংশ; ইহাতে যেমন ছন্দের অশেষ বৈচিত্র্যবিধান হয়, তেমনই এই খণ্ডপর্ব্বযোগে গীতিচ্ছন্দের ছন্দভাগও নানা আয়তনের হইয়া থাকে। পয়ারের পদ এইরূপ খণ্ডিত হইতে পারে না—অন্তত আধুনিক পয়ার-জাতীয় ছন্দে কোন পদই—চরণান্তিক হইলেও—খণ্ডপদ নহে; অথচ রবীন্দ্রনাথও (বোধ হয় ছন্দবাগীশদের পাল্লায় পড়িয়া) এ ভুল করিয়াছেন। পয়ারের প্রত্যেক পদই পূর্ণ, কারণ,—প্রথমত, তাহার ছন্দপ্রবাহ ঠেকাইবার জন্য শেষে কোন খুঁটির প্রয়োজন হয় না; দ্বিতীয়ত, তাহার পদগুলি পর্ব্বের মত নির্দ্দিষ্ট গঠন বা নিয়মিত পর্য্যায়ের নহে, এজন্য খণ্ডতার কথাই উঠে না। ইহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, তাহা হইলে, অমিত্রাক্ষরের ৮+৬, শেষের ২ মাত্রা পূরণ না করিয়াই, এমন ডিঙাইয়া পরের চরণে পৌছিতে পারিত না। এই খণ্ডপর্ব্বও গীতিচ্ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য—ইহার বৈচিত্র্য ও বৈভবের একটা বড় সহায়। এই খণ্ডপর্ব্ব সম্বন্ধে দুইটি নিয়ম লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমত, মূল পর্ব্বের খণ্ড বলিয়া ইহা আয়তনে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র; দ্বিতীয়ত, যুক্ত ও মিশ্র-পর্ব্বের খণ্ডপর্ব্ব, গঠনে ও আয়তনে, সেই যুক্ত ও মিশ্র-পর্ব্বের নানাবিধ ভাগের বশ্যতা স্বীকার করে। ছন্দের পর্ব্ব যদি অসম ও মিশ্র হয়, তাহা হইলে তাহাতে আর খণ্ডপর্ব্ব থাকে না, সেই খণ্ডপর্ব্বই একটি অসম পূর্ণপর্ব্ব হিসাবে গণ্য হইতে পারে। আমি এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা না করিয়া কতকগুলি পদ্য-পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে নানা আকারের নানাবিধ খণ্ডপর্ব্ব এবং ছন্দের উপরে তাহাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে।

[প্রত্যেকের বামে যে দুইটি করিয়া সংখ্যা-চিহ্ন আছে, তাহার প্রথমটি মূল পর্ব্বের ও দ্বিতীয়টি খণ্ডপর্ব্বের মাত্রা-সংখ্যা]

দ্বৈমাত্রিক

(৪ | ১)—খিলখোলা • কর্দ্দাতে • যাব চল্ • সাধ জেগে • ছে (সত্যেন্দ্রনাথ)
(৪ | ২)—দেবতার • অবতার • বসুধার • তলে ('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)
(৪ | ৩)—দিন শেষ • হয়ে এল • আঁধারিল • ধরণী (রবীন্দ্রনাথ)

ত্রৈমাত্রিক

(৬ ১)—কুঞ্জে আমার • এসে ফিরে গেছে • অকাল বৈশা-খী ('ঘাসের ফুল')
(৬ ২)—আমি, কুসুম শয়নে • মিলাই সবমে • মধুর মিলন • রাতি (রবীন্দ্রনাথ)
(৬ ৩)—নূপুরের মত • বেজেছি চরণে • চরণে (ঐ)
(৬ ৪)—জলে ডুব দেওয়া • নূতন তোর কি • দহচারী (কালিদাস)
(৬ ৫)—এমন করিয়া • কেমনে কাটিবে • মাধবী রাতি (রবীন্দ্রনাথ)

[চার ও পাঁচ-মাত্রার খণ্ডপর্ব্বে যথাক্রমে ৩+১ এবং ৩+২ এইরূপ ভাগ আছে—ত্রৈমাত্রিক যুক্ত-পর্ব্বের চরণেও খণ্ডপর্ব্ব যদি তিন মাত্রার বেশি হয়, তাহাতেও এইরূপ ভাগ (৩+১) থাকাই স্বাভাবিক ; সেখানে চার-মাত্রার খণ্ডপর্ব্ব যদি এইরূপ (৩+১) না হইয়া—(২+২), অর্থাৎ, গোটা চার-মাত্রার হয় তাহা হইলে উহাকে খণ্ডপর্ব্ব না বলিয়া একটি ভিন্নজাতীয় পর্ব্ব বলাই সঙ্গত, যেমন—

বহুদিন হ'ল • কোন্ ফাল্গুনে • ছিনু আমি তব • ভর-সায়

এখানে 'ভরসায়' একটি দ্বৈমাত্রিক পর্ব্ব এই ত্রৈমাত্রিক চরণের শেষে যুক্ত হওয়ায় ছন্দে একটি বিশেষ দোলা লাগিয়াছে। ইহার সহিত—

৬ | ৪ (৩+১)—লস্কর মোরা • সূর্য্যদেবের • স্বাস্থ্য মোদের • সঙ্গ-তি (সত্যেন্দ্রনাথ)

কিম্বা, ঠিক এইরূপ—

আঁধার ধাঁধার • জবাব মেলে না • জানো না কি ('স্বপন-পসারী')

তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, এই দুই জাতীয় খণ্ডপর্ব্বের মাত্রা-পরিমাণ এক হইলেও, একটি দ্বৈমাত্রিক ও অপর দুইটি ত্রৈমাত্রিক বলিয়া ছন্দধ্বনির পার্থক্য আছে]

মিশ্রপর্ব্ব—সম

৫ (৩+২) | ১—ঘুমাতে তুমি • গভীর আল • সে (রবীন্দ্রনাথ)
৫ (৩+২) | ২—সাগর জলে • সিনান করি • সজল এলো • চুলে (ঐ)
৫ (৩+২) | ৩—শ্যামল তৃণ • শয়নতলে • ছড়ায়ে মধু • মাধুরী (ঐ)
৫ (৩+২) | ৪ (৩+১)—মখমলেরি • বিছ্না পরে • ঘুমায় কোলে • সারঙ্-গী('স্বপন-পসারী')
৫ (৩+২) | ৪ (২+২—প্রকৃতিবধূ • চাহিবে মধু • পরিবে নব • আভরণ (রবীন্দ্রনাথ)
৭ (৩+৪) | ১—খাঁচার+পাখী বলে • শিখানো+গান গাহ • বনের+পাখী বলে • না
৭ (৩+৪) | ২—খাঁচার+পাখী ছিল • সোনার+খাঁচাটিতে • বনের+পাখী ছিল • বনে (ঐ)
৭ (৩+৪) | ৩—মুখে সে+চাহে যত • নয়ন+করি নত • গোপনে+মরে কত • বাসনা

('ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ)

৭ (৩+৪) | ৪ (৩+১)—নিশীথে+সুখ তার • হেরিব+ঘুম ঘোরে • দিবসে+স্মরি তাহা • কাঁদিব+রে

৭ (৩+৪) | ৪ (২+২)—কবরী+ঘেরি রহে • নবীন+ফুলমালা • কাজলে+আরো কালো • দুনয়ন

৭ (৩+৪) | ৫ (৩+২)—ছিলাম+আনমনে • একেলা+গৃহকোণে • কে যেন+ডাকিল রে • অলকে চল্ (রবীন্দ্রনাথ)

[৩+৪ মিশ্রপর্ব্বের খণ্ডপর্ব ছয়মাত্রার হয় না, কারণ, ছয়মাত্রার ভাগ—৩+৩, ২+৪, ৪+২ হইবে, এবং তাহাতে খাঁটি ত্রৈমাত্রিক ছন্দের একটি পর্ব্ব গড়িয়া উঠিবে—তাহা মিশ্রও হইবে না, খণ্ডও হইবে না।]

মিশ্রপর্ব্ব—অসম

ইহাতে খণ্ডপর্ব্ব একটি পূর্ণপর্ব্বের সামিল—অতএব খণ্ডপর্ব্ব নাই, যথা—

কণ্ঠে খেলিতেছে • সাতটি সুর • সাতটি যেন • পোষাপাখী

—ইহার শেষ পর্ব্বটিও একটি পূর্ণ অসম-পর্ব্ব, খণ্ডপর্ব্ব নহে।

এই খণ্ডপর্ব্বগুলির সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। ত্রৈমাত্রিক ছন্দে ছয়মাত্রার পর্ব্বকে পূর্ণপর্ব্ব ধরিলে, ছন্দের শেষে একটি খণ্ডপর্ব্ব না থাকিলে, ছন্দ-প্রবাহ সমাপ্ত হয় না, কিন্তু দৈমাত্রিক ছন্দে খণ্ডপর্ব্ব না থাকিলেও ছন্দ-পূরণ হইতে পারে, যথা—

মেঘ ডাকে • গম্ভীর • গরজনে।
ছায়া নামে • তমালের • বনে বনে।

মিশ্রপর্ব্বের চরণেও খণ্ডপর্ব্ব অত্যাবশ্যক নয়।

এইখানেই আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ অতি সংক্ষেপে করিব। চরণের শেষে খণ্ডপর্ব্বের মত—চরণের পূর্ব্বে, ছন্দের অতিরিক্ত (Hypermetric) যে অক্ষর থাকে, তাহার দ্বারাও এক প্রকার ছন্দ-হিল্লোলের সৃষ্টি হয়। সাধারণত ইহার ফলে চরণের আদ্য পর্ব্বে যে একটি প্রবলতর ঝোঁক পড়ে, সেই ঝোঁক পরের পর্ব্বগুলিতেও বজায় থাকে। যথা—

যারা নিত্য কেবল • ধেনু চরায় • বংশীবটের • তলে
যারা গুঞ্জাফলের • মালা গেঁথে • পরে, পরায় • গলে।

নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশটিতে এই কৌশলে ছন্দে এমন দোলা লাগিয়াছে যে মূল ছন্দটি কাণে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়—

দূর—বাঁবলাগাছের | ফাঁকে—বাঁকা চাঁদটাই
　　মিছা—জাগায় স্বপন।
হোথা—আকাশ ঝুলিয়া | যেন—পড়েছে মেঘে,
ক্যাপা—আশ্বিনে ঝড় | আসে—ঝড়ের বেগে,
ট্রেন—ছুটবে আঁধারে | আমি—শুনব জেগে
　　খালি—তারি ঝন ঝন,
পোড়া—চুরুট হইতে | জানি—ঝরবেই ছাই,
　　ছাই—উড়বে তখন। —('কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল')

পর্ব্ব ও খণ্ডপর্ব্ব সম্বন্ধে ইহার অধিক আলোচনার অবকাশ নাই। এইবার আমি পদ ও পর্ব্বের প্রভেদ আর একটু বিস্তারিতভাবে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

পর্ব্বভূমক ছন্দের ঝোঁক—Rhythmical Accent বা ছন্দঘটিত স্বরবৃদ্ধি; পদভাগ ও ছন্দভাগ —দুই প্রকার যতি—পদভূমক ও পর্ব্বভূমকের পার্থক্য—'ঝোঁক'-এরও পার্থক্য; পর্ব্বভূমকের 'ছন্দ-ভাগ' ও 'চরণ'—ছাঁদ বা প্যাটার্ণ; বাংলা ছন্দে চারমাত্রার প্রভাব—দৃষ্টান্ত; চারমাত্রার বৈমাত্রিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব্বে পর্ব্বভূমক ছন্দের মূল উপাদান Rhythmical Accent বা ছন্দ-প্রয়োজনমূলক ঝোঁক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা নাকি বাংলা ভাষার ধ্বনি বা উচ্চারণ-প্রকৃতির বিরোধী, অতএব এইরূপ ঝোঁকের উপরে বাংলা ছন্দ নির্ভর করে না—এমন আপত্তির সম্ভাবনা জানিয়া আমি এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব। যাঁহারা সাহিত্য অপেক্ষা সাহিত্যের পুরাতত্ত্ব, কাব্যের কবি-ভাষা অপেক্ষা সে ভাষায় প্রাচীনতম ভঙ্গি, এবং ছন্দের দেহ-লাবণ্য অপেক্ষা তাহার অস্থিসংস্থানে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, ধ্বনিবিজ্ঞান ও উচ্চারণতত্ত্বই যাঁহাদের ইষ্ট, তাঁহাদের গবেষণার মূল্য নাই এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু সাহিত্যরস-সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তাঁহাদের—শুধু বুদ্ধি নয়—একটু রস-বুদ্ধি থাকাও আবশ্যক; নহিলে, আমাদের দেশে এক্ষণে যে সাহিত্য-বিদ্যাহীন সাহিত্যিক-অভিমান দিন দিন বাড়িয়া চলিয়য়াছে, তাহা আরও বেপরোয়া হইয়া উঠিবে। কবিতার ছন্দ ব্যাখ্যা করিবার কালে, যদি কেবল stress, accent প্রভৃতির অতি সূক্ষ্ম ভেদাভেদ বিচারই মুখ্য হইয়া উঠে, এবং সে আলোচনার বৈজ্ঞানিক মর্য্যাদাই ব্যাখ্যাকারকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে, তবে তাহার ফল কি হয়, তাহাও আমরা ইতিমধ্যে দেখিয়াছি। যাহার কানের বহির্যন্ত্রে কেবল নিষ্প্রাণ জড়-ধ্বনির আঘাতই ধরা দেয়, কবিতার ভাষা বা ছন্দ—কোনটারই রস মরমে পশিতে পারে না, তাহার মত ব্যক্তির ছন্দবিচার-পদ্ধতি ছাত্রকে ধমকাইয়া বাধ্য করিতে পারে বটে, কিন্তু রসিকের রস-জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করিতে পারে না; শুধু তাহাই নয়, সে বিচার সত্যকার ছন্দ-পরিচয়ের দিক দিয়া যেমন ভ্রম-সঙ্কুল, তেমনই উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ পণ্ডিতের মত খণ্ডন করা আমার কাজ নয়—সে শক্তিও আমার নাই। কবিতার ছন্দেও, স্বাভাবিক উচ্চারণঘটিত ঝোঁক এবং অন্য দুই এক প্রকার ঠেস

ছাড়া, বিশুদ্ধ ছন্দঘটিত ঝোঁক যে নাই এবং থাকিতে পারে না—ইহার উত্তরে, প্রথমত, অমি বলিব যে, এই পর্ব্বভূমক ছন্দই বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দান; ইহা সৃষ্টি করিতে রবীন্দ্রনাথকে একটা কৃত্রিম রীতি বা convention-এর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল—যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে এক প্রকার 'গুরু-লঘু'র মাত্রা-ভেদ আমদানি করিবার জন্য পরে আর একটি convention সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই নূতন ছন্দ-সঙ্গীতের জন্য রবীন্দ্রনাথকে স্বাভাবিক উচ্চারণের উপরেই একটু কৌশল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বাঙালীর কান তাহাতে অভ্যস্ত না থাকায় বহুকাল তাঁহার এই ছন্দ-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে নাই। সে সময়ের কাব্যপিপাসুরা এখনও স্মরণ করিবেন—রবীন্দ্রনাথের এই সকল কবিতার নূতন পাঠভঙ্গি সে কালের প্রাচীনপন্থী শ্রোতৃমণ্ডলীর কিরূপ হাস্যোদ্রেক করিত; ঐ ছন্দের সুর লইয়া অনেকে রীতিমত বিদ্রূপ করিতেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, এই নূতন পাঠভঙ্গি সেকালের বাঙালীর কানে অনভ্যস্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, আমার এই ছন্দ-ব্যাখ্যান কোন তত্ত্বমূলক আলোচনা নয়—আমার অভিপ্রায় নিতান্তই নিরীহ; সাধারণ কাব্যরসপিপাসু বাঙালীর কানকে একটু সাহায্য করিবার জন্য, আমি বাংলা ছন্দের রসরূপটিই একটু ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসী। কেমন করিয়া পড়িলে কোন ছন্দের পূর্ণ রূপটি কানে আদায় করিয়া লওয়া যায় তাহা বুঝাইতে হইলে. একেবারে কান ও কণ্ঠের মিলন ঘটাইতে হয়; তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই, আমি কোন প্রকারে বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। যাঁহাদের কাব্যরসজ্ঞান নাই বলিলেই হয়, এজন্য—কবিতা-পাঠ যে কত বড় একটা আর্ট, তাহাতে কণ্ঠের কত কারিগরি, উচ্চারণের কত কৌশল আবশ্যক হয়—সে বোধ যাঁহাদের নাই, যাঁহারা কবিতার আবৃত্তি শুনিবার কালে কানের ঘটিকাযন্ত্রটিকে কেবল ধ্বনিবিজ্ঞান বা উচ্চারণতত্ত্বের চাবি দ্বারা 'অ্যালার্ম' দিয়া রাখেন, একটু সুরভঙ্গি বা স্বরভঙ্গির স্বাধীনতা যাঁহাদের সুষুপ্ত ছন্দবোধকে ব্যতিব্যস্ত করে, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিও কেমন করিয়া বেমালুম হজম করেন জানি না, কিন্তু আমার এই আলোচনা তাঁহাদের জন্য নয়; কারণ, বলা বাহুল্য আমি এই যে ছন্দ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি, ইহার সাক্ষাৎ বিধানদাতা আমার কান ও আমার কণ্ঠ; এবং তাহারা যে বাংলা ছন্দের

মর্য্যাদা হানি করে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। অতএব Rhythmical Accent সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে কোন ভুল নাই।

এইখানেই আর একটি কথাও বলিয়া রাখি। আমি যে ভাবে কতকগুলি পদ্য-পংক্তির ছন্দ-রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাদের পর্ব্বচ্ছেদ ও ছন্দভাগ যেরূপ দেখাইয়াছি, তাহাই তাহাদের একমাত্র রূপ নয়; ছন্দের মূলপ্রকৃতি বজায় রাখিয়াই তাহাদের রূপভেদ সম্ভব; রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছন্দ' নামক পুস্তকখানিতে ইহার কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন।

প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল ছন্দের কবিতায় পদই মাত্রা-পরিমিত মাত্র-গুণযুক্ত হইয়া ছন্দের চাল বা measure বলিয়া গণ্য হইত; ইহাই ইংরেজী অর্থে—foot। আমাদের বাংলা পয়ার-জাতীয় ছন্দে, মাত্রার গুণ (হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান) ব্যতিরেকেও, কেবল পরিমাণ অনুসারে যে ছন্দভাগ ঘটে, তাহাই এক একটি পদ; এবং তাহার জন্য চরণমধ্যে যে যতি পড়ে তাহাও চরণ-গঠনমূলক Metrical Pause হওয়া সত্ত্বেও, তাহা দ্বারাই Rhythmical Pause বা ছন্দঘটিত যতির কাজও হইয়া থাকে; অর্থাৎ, তাহারই তালে চরণগুলি ছন্দিত হইয়া থাকে। গীতিচ্ছন্দের পর্ব্বগুলি এইরূপ ছন্দভাগ নহে—সেগুলি ছন্দভাগেরও অন্তর্ভূত এক একটি সুপরিমিত ও সুনিয়মিত তরঙ্গভঙ্গ, এবং তাহার বেগ Rhythmical Pauseকেও অভিভূত করে। পদ যদি Rhythmical Sectionও হয়, তথাপি তাহার ছন্দোগত আর কোন অঙ্গ-ভাগ নাই। পর্ব্বভূমক ছন্দের ছন্দভাগ এই জন্যই ঘটে যে, চরণের গতিচ্ছন্দকে কানে ঠিক রাখিতে হইলে যে কয়টি পর্ব্বের হিসাব একসঙ্গে রাখা দরকার, তাহাদের পরে একটু যতির আবশ্যক। পদভূমক ছন্দের পদই তাহার Rhythmical Section হওয়ায় সেই ছন্দভাগের আয়তন এবং ছাঁদ কতকটা নির্দ্দিষ্ট; অর্থাৎ, তাহারা যেমন সাধারণত ৬, ৮, ১০ মাত্রার হইয়া থাকে, তেমনই দ্বৈমাত্রিক, ত্রৈমাত্রিক—সম, অসম বা মিশ্র প্রভৃতি বৈচিত্র্য তাহাতে নাই; তাহার গঠনে খণ্ডপর্ব্বেরও কোন কাজ নাই, অতএব পর্ব্বভূমক ও পদভূমক ছন্দভাগ একজাতীয় নহে; ইহার কারণও সেই একই—এই দুই ছন্দের ছন্দঃপ্রবাহের গতি একরূপ নয়; তাহারও কারণ, ইহাদের চরণ-মধ্যস্থ যতির প্রকৃতি এক নয়। পর্ব্বভূমক ছন্দে Rhythmical Section থাকিলেও,

সেখানে যতির এতখানি প্রভাব নাই; নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ হইতে এই প্রভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।—

অঘ্রাণে শীতের রাতে।। নিঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া। (রবীন্দ্রনাথ)

কিংবা—

ও রে দুষ্ট দেশাচার।। কি করিলি অবলার
কার ধন কারে দিলি | আমার সে হ'ল না। (হেমচন্দ্র)

এবং—

ওই কি প্রদীপ | দেখা যায় পুর ॰ মন্দিরে?
ও যে দুটি তারা | দূর পশ্চিম ॰ গগনে! (রবীন্দ্রনাথ)

কিংবা—

তোমরা | হাসিয়া ॰ বহিয়া | চলিয়া ॰ যাও
কুলুকুলু কল | নদীর ॰ স্রোতের ॰ মত। (ঐ)

প্রথম দুইটিতে প্রত্যেক ভাগ এক একটি পদ—মাঝে সুস্পষ্ট যতি আছে; শেষের দুইটিতে কানে ছন্দ ঠিক রাখিবার জন্য একটু সামান্য বিরাম আছে, স্পষ্ট যতি কোনখানে নাই। প্রথমগুলি পদ, দ্বিতীয়গুলি ছন্দভাগ মাত্র; এই ছন্দভাগের সঙ্গে পর্ব্বচ্ছেদের কোন সম্বন্ধ নাই, যথা—

ভূতের মতন ॰ চেহারা যেমন | নির্ব্বোধ অতি ॰ ঘোর

কিংবা—

দরজার পাশে ॰ দাঁড়িয়ে সে হাসে | দেখে জ্বলে যায় ॰ পিত্ত

এখানে যে ছন্দভাগ হইয়াছে, তাহাই অনেকটা পদের অনুরূপ; কিন্তু পর্ব্বচ্ছেদের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। পর্ব্বচ্ছেদ যেমন এক একটি ঝোঁকের বিরাম, তেমনই এই ছন্দভাগ ছন্দপ্রবাহের ছাঁদটি রক্ষা করে মাত্র, এবং এই ছাঁদ অনুসারেই পর্ব্বভূমক ছন্দের যে এক একটি ভাগ পাওয়া যায়, তাহাতে এই ছন্দের নানাবিধ প্যাটার্ন বা ছাঁচ গড়িয়া উঠে। পর্ব্ব দিয়াও পদ নির্দ্ধারণ করা যায়, কিন্তু তাহা করিতে হইলে রীতিমত যতির ব্যবস্থা করিতে হয়, যথা—

হের, যমুনা বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা।

কিংবা—

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা।

এইখানে পর্ব্বভূমক ও পদভূমক ছন্দের এই যতিঘটিত প্রভেদ, এবং তজ্জন্যই এই উভয়ের ছন্দভাগও কেন ঠিক এক প্রকৃতির নয়, তাহার আরও স্পষ্ট নিদর্শন দিব। Rhythmical Section ও পদভাগ যে এক নয়, অন্তত পর্ব্বভূমক ছন্দে চরণমধ্যস্থ সুস্পষ্ট যতির অভাবই যে তাহাকে পদভূমক ছন্দ হইতে পৃথক করিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আমি একটি দো-আঁশলা ছন্দের কবিতা পাঠ করিব। এই ছন্দে পর্ব্বচ্ছেদের আমেজ আছে, উপযুক্ত স্থানে যুক্তাক্ষরকে পূরা মাত্রার মর্য্যাদা দেওয়াতেই এইরূপ ঘটিয়াছে; তথাপি ইহার চাল খাঁটি পয়ারের, অর্থাৎ, ইহা পর্ব্বচারী নয়, পদচারী; ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের "নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল" কবিতাটির ছন্দ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে বলি।—

উস্কখুস্ক চুলগুলি | চোখ থেকে তুলে দাও,
পায়ের নূপুর দুটি | খুলে নাও—

পড়িতে গেলেই দেখা যাইবে, ইহার গঠনে চার মাত্রার পর্ব্ব উঁকি দিলেও, চাল পয়ারের মত, অর্থাৎ ইহার লয়—দ্বৈমাত্রিক, দ্বৈমাত্রিক পর্ব্বের মত পড়িলে কবিতার ভাব ক্ষুণ্ণ হয়, গতির মন্থর লয় নষ্ট হয়, ইহার ছন্দপ্রবাহে রীতিমত ছেদ আছে—যতিগুলি আরও স্পষ্ট; পয়ারের আমন্থর গতি রহিয়াছে বলিয়া, এক ভাগ আর এক ভাগের উপরে গড়াইয়া পড়ে না। ইহাকে পর্ব্ব-ছন্দে পাঠ করিলে যে সুর বাজে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যথা—

উস্কখুস্ক • চুলগুলি | চোখ থেকে • তুলে দাও

কিন্তু ঐরূপ যতির জন্য, উহারা যথাক্রমে ৮+৮ ও ৮ +৪, অর্থাৎ ১৬ ও ১২ 'অক্ষরে'র পয়ার-পংক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ কবিতারই আরও দুই পংক্তি—

সাজাও বালিশ শিরে | সুকোমল ছন্দে,
সুরভিয়া | অগুরুর গন্ধে,

দেখিতে স্পষ্ট পর্ব্বভূমক হইলেও, ইহাদের চাল যে পর্ব্বের চাল নয়—পদের চাল, তাহার প্রমাণ, 'সাজাও বালিশ শিরে' অথবা 'সুরভিয়া' এই দুইটি ছন্দভাগই পর্ব্বঘটিত ঝোঁক বর্জ্জন করিয়া চলে, ইহাদের মধ্যে কোনটায় Rhythmical Accent নাই—সহজ উচ্চারণ বা অর্থঘটিত accent আছে। অথচ এই ছন্দে

যুক্তাক্ষরের স্থান-গত মর্য্যাদাও রহিয়াছে, এজন্য ইহাতে পয়ারই যেন একটু বিশিষ্ট গীতিসুর লাভ করিয়াছে। অতএব পদ ও পর্ব্বের মধ্যে যতই সাদৃশ্য থাকুক, তাহাদের আসল বৈলক্ষণ্য—(১) ঝোঁকের জাতিভেদ, এবং (২) যতির বিভিন্নতা। এই জন্য যাঁহার কান সজাগ, তিনি এই দুই ধরনের ছন্দধ্বনি, কোন হিসাব না করিয়াই, শুনিবামাত্র পৃথক্ চিনিয়া লইতে পারিবেন—ইহাদের ঝোঁক, যতি ও লয় এতই বিলক্ষণ।

আমি এখানে পর্ব্ব-প্রয়াণের যতিকে Rhythmical Pause এবং পদান্ত-যতিকে Metrical Pause বলিব; অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পর্কে শেষেরটির বিশেষ আলোচনা পরে করিব। পদভূমক ছন্দের বিভিন্ন ছাঁদ অনুসারে এই পদান্ত' যতি—৮ + ৬, ৮ + ১০ প্রভৃতির মত হইয়া থাকে। পর্ব্বভূমক ছন্দের Rhythmical Section কতকটা তদ্রূপ বটে, কিন্তু পদ শুধুই Rhythmical Section নয়—Metrical Section'ও বটে, এবং যেহেতু উহা সর্ব্বত্র ছন্দ মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয় না, এবং উহাতে পর্ব্বহিসাবে মাত্রা গণনা সম্ভব নয়, সেজন্য চরণের মোট মাত্রাসমষ্টির দ্বারাই উহার ছন্দরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, যেমন—১১ অক্ষর, ১২ অক্ষর, ১৮ অক্ষরের ছন্দ; অথচ এইরূপ নির্দ্দেশে ছন্দের আসল বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আরও অর্থহীন। কিন্তু পর্ব্বভূমক ছন্দে খাঁটি Rhythmical Pauseই আছে, Metrical Pause সেই একেবারে শেষে ঘটিয়া থাকে। অতএব যখন পর্ব্বভূমক ছন্দের বিশিষ্ট ছন্দভাগ বা বিভিন্ন মাত্রা-পরিমাণের কথা উঠে, তখন পর্ব্বচ্ছেদ অথবা Rhythmical Section-এর কোন প্রশ্নই থাকে না—পর্ব্বের সহিত পর্ব্ব, এবং খণ্ডপর্ব্বের যোগে, নানাবিধ ছাঁদ গড়িয়া উঠে। উপরে যে পর্ব্বভূমক ছন্দের উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে Rhythmical Section দেখানো হইয়াছে; নিম্নোদ্ধৃত পুঞ্জপদীর (Stanza) প্রত্যেক পংক্তিই এক একটি Metrical Section বা বিশিষ্ট ছন্দভাগ—ইহাদের মধ্যে আর কোন ভাগ নাই।

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা;
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা। (রবীন্দ্রনাথ)

—এই যে নানা আয়তনের ছন্দভাগ, ইহা হইতেই পর্ব্বভূমক ছন্দের নানা ছাঁচ রচনা করা যাইতে পারে ; এবং ছোট হউক বা বড় হউক, ইহাদের মধ্যে আর কোন যতি নাই, পর্ব্বচ্ছেদ মাত্র আছে। কিন্তু পর্ব্ব-শেষকে পদ-শেষ মনে করিয়া এমন ভুলও করা হয় যে, সে ভুল সংশোধন করিতে রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে —

আঁধার ॰ রজনী ॰ পোহাল।
জগৎ ॰ পূরিল ॰ পুলকে।

—এই ৯ মাত্রার ছন্দভাগকে গোটা একটি ভাগ না ধরিয়া, ইহাকে ৬+৩-এর যুক্ত অর্থাৎ জোড়া-দেওয়া পদ বলিয়া যিনি মনে করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই পর্ব্বচ্ছেদ ও পদভাগের পার্থক্য মানেন না। আসলে উহা ত্রৈমাত্রিক ছন্দের নয়-মাত্রার ছাঁদ ; 'আঁধার রজনী'-কে একটি গোটা পর্ব্ব ও 'পোহাল'-কে একটি খণ্ডপর্ব্ব ধরিলেও কিছু আসে যায় না ; কারণ, পূর্ণ ও খণ্ড-পর্ব্ব দুইয়েরই যোগে পর্ব্বভূমক ছন্দের নানা ছাঁদ পাওয়া যায়। পর্ব্বভূমক ছন্দের এইরূপ ছন্দভাগকে আমি পদ, খণ্ড-চরণ বা চরণ না বলিয়া, ছাঁদই বলিলাম। এইরূপ নানা আয়তনের ছন্দভাগের নমুনা আমি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি—ইহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি পৃথক ছাঁচ বা পুরা প্যাটার্ন, এবং ইহাদের দ্বারাই বৃহত্তর বা জটিলতর প্যাটার্ন নির্ম্মাণ করা যায়।—

(৮ মাত্রা)—ওগো সুন্দর চোর
(৯ মাত্রা)—গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
(„) সেদিন শারদ প্রভাতে
(১০ মাত্রা)—তোমারে কে করে বঞ্চিত
(„) অবলারে কোরো মার্জ্জনা
(১১ মাত্রা)—নত মুখে গেল চলি তরুণী
(১২ মাত্রা)—এ বেশভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ।

পর্ব্বের আয়তনই ৭ মাত্রা (মিশ্র) পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাই আট মাত্রাই এইরূপ ছন্দভাগের ন্যূনতম পরিমাণ ; আবার, ১২ মাত্রার বেশি হইলেই মাঝে একটি

Rhythmical Pause পড়িবেই, এজন্য এই বারো মাত্রাই বৃহত্তর ছন্দভাগ। এইরূপ ছন্দভাগে পর্ব্বচ্ছেদের জন্য কোন বাধা ঘটে না, কারণ তাহাতে ছন্দ-প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় না; এই ছন্দ-প্রবাহে যেখানে প্রথম একটু বিরাম আবশ্যক হয়, সেইখানেই ছন্দভাগ হয়। এই বিরামের দীর্ঘতম অবকাশ বারো মাত্রা, তাই ইহা অপেক্ষা বড় ছন্দভাগ বা খণ্ড-চরণ হয় না। অসম মিশ্রপর্ব্ব মিলিয়াও ইহার চেয়ে বড় ছন্দভাগ সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ—

বসেছে নববর ॰ সলাজ মুখে | পরিয়া নানা • আভরণ

—ইহার বৃহত্তর ভাগটি বার মাত্রার-বেশি হইতে পারে নাই।

উপরে পর্ব্বভূমক ছন্দভাগের হিসাবে একটা ভুল হইয়া গিয়াছে—আমি যে বারো-মাত্রাকেই এইরূপ ছন্দভাগের দীর্ঘতম পরিমাণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাহা যে ঠিক নয়—তার প্রমাণ—

খাঁচার পাখী ছিল ॰ সোনার খাঁচাটিতে |
বনের পাখী ছিল বনে

—এখানে প্রথম ছন্দভাগটি (Rhythmical Section) চৌদ্দ মাত্রার; দুইটি সাতমাত্রার পর্ব্ব ইহাতে আছে। পর্ব্ব ত্রৈমাত্রিক ছয়-মাত্রার হইলে, দুইটি পর্ব্বে বারো মাত্রা হয়, এবং তাহাই সে ছন্দের দীর্ঘতম ছন্দভাগ। আবার, পাঁচ-মাত্রার চালেও এই রকমের ছন্দভাগ দীর্ঘতম বলিয়া মনে হয়—

একদা তুমি ॰ ফিরিতে যবে • অঙ্গ ধরি।
পথিক বধূ ॰ কাঁদিত কত ॰ মিনতি করি।

এখানেও, তিনটি পর্ব্বে এই দীর্ঘতম ছন্দভাগ পাওয়া গিয়াছে, এবং ইহার মাত্রা-পরিমাণ পনরো। অতএব এই পনরোকেই উর্দ্ধতম মাত্রা-সংখ্যা ধরিলে ভুল হইবে না। ছন্দভাগের ন্যূনতম মাত্রা-সংখ্যা, অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম ছন্দভাগের কথাও—এখানে আর একবার বলিব। দীর্ঘতম ও ক্ষুদ্রতম আকারের মধ্যবর্ত্তী যে নানা ছোট-বড় ছন্দভাগ পাওয়া যায়—খণ্ডপর্ব্বের সাহায্যেই তাহা হইয়া থাকে। অতএব, খণ্ডপর্ব্বহীন একটি মাত্র পর্ব্বে ক্ষুদ্রতম ছন্দভাগ বা খণ্ড-চরণ হইয়া থাকে—মোটামুটি এমন নিয়ম নির্দ্দেশ করিলে ক্ষতি নাই; কিন্তু ইহাও নির্ভর করিবে চরণের গঠনের উপরে; এবং পর্ব্বের আয়তনও সেই পক্ষে সুবিধাজনক হওয়া

চাই। আমার মনে হয়, ছয় মাত্রাই সকল পর্ব্বভূমক ছন্দভাগের ন্যূনতম পরিমাণ —পূর্ব্বে যে আট মাত্রার কথা বলিয়াছিলাম, তাহাও সংশোধন করিয়া লইলাম।

ত্রৈমাত্রিক ছন্দে এই ভাগ অতি সহজ; সাধারণ ভাগ আট মাত্রার, যথা—

স্বপনের • ঝরোকায় | তারা উঁকি • দিয়ে যায়
* * *
স্মরণ-সরণি 'পরে | ফুল ফোটে • থরে থরে (সত্যেন্দ্রনাথ)

বারো মাত্রার ভাগও হয়, যথা—

ছায়া নামে • তমালের • বনে বনে

ইহাও তিন পর্ব্বের একটি চরণ—খণ্ডপর্ব্বের অবকাশ ইহাতে নাই। "আঁধার রজনী পোহাল"-ও ঠিক এই ছাঁচের ত্রৈমাত্রিক ছন্দভাগ। নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় চার মাত্রার এক একটি পর্ব্বকে স্পষ্ট ছন্দভাগ বা পদরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে—

নিরঞ্জন
নিদ্‌পুর,
নিকেতন
মৃত্যুর—
বায়ু হায়
মূরছায়,
ঢেউ নাই
সিন্ধুর। (সত্যেন্দ্রনাথ)

তথাপি এমন মিল ও পংক্তি-সজ্জা সত্ত্বেও Rhythmical Pause আট মাত্রার আগে পড়ে না।

পয়ারের পদ ও গীতিচ্ছন্দের এইরূপ ছন্দভাগ—এ দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য যেমনই থাকুক, ইহাদের প্রকৃতিগত প্রভেদ বুঝাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। তথাপি এই প্রভেদের আরও লক্ষণ আছে। প্রায় ত্রৈমাত্রিক গীতিচ্ছন্দের মতই একটি পুরাতন পয়ার-ছন্দের কবিতা লওয়া যাক্—

মদনমোহন | মুরলীবদন | বল বিবরণ | কোথায় ছিলে।
বাঁধি প্রেমজালে | কে নিশি জাগালে | কে তব কপালে | সিন্দুর দিলে।

ইহার প্রত্যেক ভাগ যে এক একটি পদ—পর্ব্ব নয়, তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। পদগুলি ছয় মাত্রার, এবং হিসাব ঠিক পয়ারের মতই। মাত্রার সংখ্যা-

পূরণ ছাড়া ধ্বনিস্থানের আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই—পর্ব্বের যাহা প্রাণ, সেই ঝোঁক ইহাতে নাই, কাজেই ছন্দস্পন্দজনিত প্রবাহ-বেগ নাই। তাহার ফলে, এই ভাগগুলির মধ্যে যে যতি আছে তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া, গীতিচ্ছন্দের পর্ব্বের মত, ইহারা তরঙ্গবৎ পরস্পরকে অনুধাবন করে না—এজন্য ইহার ছন্দ-প্রকৃতিই স্বতন্ত্র, ইহা পয়ারজাতীয় পদভূমক ছন্দ। পর্ব্বে পর্ব্বে যে সংসক্তি আছে, পদে পদে তাহা নাই, এই জন্যই—

নদীতীরে বৃন্দাবনে | সনাতন (একমনে)

—এখানে যদি 'সনাতন' পর্য্যন্ত একটি পূরা ছন্দভাগ ধরা যায়, তবে এই ৪+৪ | ৪ মাত্রার চরণটি ছন্দ বজায় রাখিয়া পড়িতে গেলেই বুঝা যাইবে যে, উহা এই ৮ ও ৪-এর মধ্যবর্ত্তী যতিটুকুকে রক্ষা করিয়াই ছন্দিত হইতেছে। কিন্তু চার মাত্রার পর্ব্বভূমক ছন্দের আচরণ অন্যরূপ, যথা—

শোন্ সখি * আজ রাতে | কারা গায় * গুজরাতি | গর্‌বা

এখানেও ছন্দভাগ ছিল আট মাত্রার, কিন্তু যেমন ইহার শেষের পর্ব্বগুলি বাদ দেওয়া গেল, যথা—

শোন্ সখি * আজ রাতে * কারা গায়
(জোছনায় মোহ পায় মুরছায়)

অমনই, ছন্দটি তিনটি চার-মাত্রার পর্ব্বে ভাগ হইয়া গেল—আট মাত্রার পরে কোন যতির প্রয়োজন আর রহিল না, পর্ব্বগুলি এমনই পরস্পরের অনুধাবন করিয়া থাকে।

পর্ব্ব ও পদের ছন্দপ্রবাহঘটিত প্রভেদ ইহাই; পর্ব্বে যে ঝোঁক থাকে এবং তজ্জন্য যে ছন্দস্পন্দযুক্ত প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তাহা পর্ব্বচ্ছেদ কিংবা ছন্দভাগের সামান্য ও বিশেষ বিরামকেও লঙ্ঘন করিয়া ছুটিতে থাকে। ইহার পর, আমি যে Metrical ও Rhythmical Pause-এর অর্থ ও ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহা স্মরণ রাখিলে, পদ ও পর্ব্বের প্রভেদ সম্বন্ধে আর কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক হইবে না। এই প্রসঙ্গে পর্ব্বের এই পরস্পর সংসক্তির কারণ ও তাহার দৃষ্টান্ত আর এক প্রকার ছন্দ হইতে দেখাইব। বাংলা গীতিচ্ছন্দে পর্ব্ব যে কারণে ছন্দস্পন্দযুক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করে, সংস্কৃত ছন্দেও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর-বিন্যাসের ফলে,

পদ হইতে পদে সেইরূপ একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বজায় থাকে—সেখানে পদগুলিও এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়; ইহার ফলে, ছন্দভাগের আয়তনও সংস্কৃত ছন্দে যেরূপ বৃদ্ধি পায়, বাংলায় তেমন নয়। নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলির ছন্দভাগ এইজন্য এত দীর্ঘ হইতে পারিয়াছে—

শাপেনাস্তংগমিতমহিমা | বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।

এখানে প্রথম ছন্দভাগটির মাত্রা-পরিমাণ ১৫। আবার—

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা | যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী

—এখানেও ছন্দভাগ ১৬ মাত্রায় পৌছিয়াছে।

সাধুভাষার ছন্দে অধুনা যে দুইটি ঠাট দাঁড়াইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আলোচনা করিলাম, এবং সে আলোচনাও প্রধানত গীতিচ্ছন্দ-সংক্রান্ত; পয়ারজাতীয় পদভূমক ছন্দের সম্বন্ধে যেটুকু বলিয়াছি, তাহাতে কেবল গীতিচ্ছন্দের বৈশিষ্ট্যই প্রমাণিত হইয়াছে। পয়ার-জাতীয় ছন্দের যাহা কিছু উৎকর্ষ, তাহার সঙ্গীত-গুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের আলোচনাকালে ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ মিলিবে। এক্ষণে এই গীতিচ্ছন্দ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। গীতিচ্ছন্দ পয়ার-জাতীয় ছন্দ হইতে বিলক্ষণ হইলেও তাহাতে সাধুভাষার উচ্চারণরীতির প্রভাব আছে—পর্ব্বগত ঝোঁক সত্ত্বেও স্বরধ্বনির মর্য্যাদা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না। এ ছন্দের গঠনবিশেষে ইচ্ছামত ঘন ঘন ঝোঁক এবং সেই ঝোঁককে একটু প্রবলতর করিবার উপায় থাকিলেও, পয়ারের আমন্থর গতি বা লয় ইহাতেও অনেকখানি বজায় রাখা যায়—স্বর-সংকোচন ও স্বর-প্রসারণের দ্বারা ইহার ধ্বনিস্রোতকে গম্ভীর ও বিলম্বিত করা যায়; ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে পাওয়া যাইবে।—

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।
উতরিব যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি,
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে। (রবীন্দ্রনাথ)

*　　*　　*

তোমার দু'খানি কালো আঁখি 'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
　　যূথীর মালা,
তোমারি ললাটে নব বরষার
　　　　বরণডালা। (রবীন্দ্রনাথ)

—এখানে পর্ব্বান্তের হসন্তযুক্ত অক্ষর যেমন স্বর-প্রসারের ধ্বনিমন্থরতা লাভ করিয়াছে, তেমনিই যুক্তাক্ষরগুলিতেও উঁচট খাওয়ার প্রয়োজন নাই—প্রায় পয়ারের মতই, তাহাদের পূর্ব্বাক্ষর একটি শান্ত গুরুত্বের অধিকারী হইয়াছে। সাধুভাষার ছন্দেই ইহা সম্ভব; তাই ঠাট ভিন্ন হইলেও ইহার জাত ভিন্ন নয়; ইহা কথ্যভাষার ছন্দের মত ভিন্নগোত্রীয় নয়। তথাপি সাধুভাষার এই দুই ঠাট ও কথ্য-ভাষার ছন্দধ্বনি একই ছন্দে মিলাইয়া সত্যেন্দ্রনাথ যে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এখানে তাহার একটু পরিচয় দিব। প্রথমেই লক্ষ্য করা যাইবে যে, ইহা সম্ভব হইযাছে চার মাত্রার পর্ব্বভূমক ছন্দে। এই জন্য আমি পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, বাংলা ভাষার বাক্‌প্রকৃতিতে এই চার-সংখ্যার একটা রহস্য আছে—এই চারের কোঠাতেই সকল ছন্দ উঁকি মারে। গণনায় পুরা চার অক্ষর বা মাত্রা সর্ব্বত্র ঠিক না মিলিলেও একটা মোটামুটি চারের ধ্বনিভাগ আমাদের বাক্‌বন্ধে নিহিত আছে।—

একদা এক | বাঘের গলায় | হাড় ফুটিয়া | ছিল

—এই খাঁটি গদ্য-বাক্যটিতেও একরূপ চারের চালই পাওয়া যায়, ইহাই যেন, আমাদের বাক্যচ্ছন্দের মূল ভিত্তি। এইবার সত্যেন্দ্রনাথের সেই কবিতার দুইটি পদপুঞ্জ উদ্ধৃত করি—

চৈত্রী এ জোছনায় এ কি হায় কুয়াসার কান্না!
কান্নার হাহা-হাওয়া, গান না রে, গান না!
আকাশের পরকোলা　　কাদের নিশাসে ঘোলা?
তারালোকে খোলা যত জানলা!
ভরা নয়নের কোলে　　মুকুতার মুখ দোলে—
ঠোঁটে চুনি, চুলে তার পান্না!

* * *

কে সে ভরেছিল মন, মনে পড়ে তারে? সেই ভরণী?
বিরহিণী যে রোহিণী নিয়েছিল ধরণী?
কোথা রে চাঁদের রাধা, কোথা সেই অনুরাধা?
শ্রবণা শ্রবণ-মন-হরণী?
কোথা অতীতের সাথী মুক্তাহাসিনী স্বাতী?
স্বপন-গাঙে কি বায় তরণী?

—এখানে ছন্দের এক অপূর্ব্ব রাসায়নিক সংমিশ্রণে পয়ারের পদ ও যতি, গীতি-ছন্দের পর্ব্বস্পন্দ, এবং ছড়া-ছন্দের হসন্তধ্বনি যতদূর সম্ভব বজায় রহিয়াছে। ইহার মূল ছন্দ পর্ব্বভূমক দ্বৈমাত্রিক চার মাত্রার,—আটমাত্রার পদভাগ এবং ছন্দ-ভাগ দুই-ই ইহাতে আছে; প্রথম দুই চরণে গীতিচ্ছন্দের Rhythmical Pause, এবং বাকি অংশে ত্রিপদীর Metrical Pause রহিয়াছে। "কান্নার হাহা-হাওয়া, গান না রে গান না।"—এই হসন্তপ্রধান শব্দতরঙ্গে, এবং এ কবিতার অন্যত্র অনেক চরণে, ছড়ার ছন্দের সুর বাজিতেছে। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় পদ-পুঞ্জটিতে হসন্তের প্রভাব প্রায় নাই বলিলেই হয়—সেখানে হসন্তপূর্ব্ব অক্ষরগুলি পয়ারের স্বর-গৌরব হারায় নাই, এবং অধিকাংশ বর্ণই স্বরান্ত। একই ছন্দে ছন্দসঙ্গীতের এই যে ঘন ঘন রূপান্তর সম্ভব হইয়াছে, ইহার কারণ, ছন্দটি দ্বৈমাত্রিক, এবং ইহার চাল চার-মাত্রার, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই চার-মাত্রার পর্ব্বে সর্ব্বত্র চার অক্ষর (স্বরধ্বনির স্থান) না থাকিলেও ছড়ার ছন্দের সেই চার অক্ষরের চাল এই পর্ব্বগুলির অনেক স্থানে উঁকি দিতেছে। ছন্দের এই ধ্বনি-সঙ্কর—পর্ব্বগুলি চারের ঘরানা বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে; ছন্দ ত্রৈমাত্রিক হইলে গীতিচ্ছন্দেও ছড়ার ছন্দের আদল আনা যাইতে পারে, কিন্তু পয়ারের কোন লক্ষণ তাহাতে থাকে না; যথা—

দুটি বোন তারা * হেসে যায় কেন * যায় যবে জল * আন্‌তে?

এখানে কোথাও পয়ারের দ্বৈমাত্রিক লয় নাই, এবং পদান্তিক যতি বা Metrical Pause'ও নাই। অতএব ইহাতে তিন প্রকার ছন্দ-সঙ্গীতেরই মিশ্রণ ঘটে নাই; কেবল, পর্ব্বভূমক ছন্দের পর্ব্বগত ঝোঁককে আশ্রয় করিয়া, ছড়ার ছন্দই কতকটা প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে।

এই চারমাত্রার চাল বা চারের ঘরানাই বাংলা বাক্যচ্ছন্দের (Speech Rhythm) অনুকূল, এবং সেইজন্য এইরূপ ধ্বনিভাগ—পদ, পর্ব্ব ও ছড়ার ছাঁদ এই তিনের সমান আশ্রয় হইয়া থাকে—ইহা যেমন সত্য, তেমনই তদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় না যে, আধুনিক বাংলা ছন্দের মূলে একই নিয়মসূত্র বিদ্যমান, অর্থাৎ, নূতন বাংলাছন্দে কোন সত্যকার জাতিভেদ নাই। এ বিষয়ে একটি বড় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে,—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই বোধ হয় প্রথম বাংলাছন্দের এই জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া এক নূতন ছন্দ-রীতির উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন; আমি এইখানেই তাহার একটু সবিস্তার উল্লেখ করিব।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছড়ার ছন্দ ও পয়ার এই দুয়ের ভেদ উঠাইয়া দিয়া তাঁহার কবিতা-গুলিকে এইরূপ ছন্দে ঢালিয়া, সম্ভবতঃ কাব্যভাষা ও কাব্য-ছন্দকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন—

> একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা
> একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে, ('আলেখ্য')
>
> *   *   *
>
> বহে শীতের প্রখর বাতাস উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া কাপড়,
> তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া! (ঐ)

—এ ছন্দ যে খাঁটি ছড়ার ছন্দ নয়, তার প্রমাণ, ইহার পর্ব্বগুলির মাত্রা সর্ব্বত্র ঠিক নাই, অর্থাৎ, চার-চার অক্ষর (syllable) ইহার আবশ্যিক ছন্দভাগ নয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছন্দভঙ্গ হয় না। তা ছাড়া, এই ছন্দে বিশিষ্ট যতির (Metrical Pause) স্থানও আছে, পর্ব্বচ্ছেদের Rhythmical Pause বা ছন্দোমূলক যতি অপেক্ষা সেই যতির প্রভাবই বেশি, যথা—

> একখানি তার তরী ছিল | বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা

—পড়িবার সময়ে এই পদান্তিক যতিই রক্ষা করিতে হইবে; পর্ব্ব অনুসারে ঝোঁক দিয়া এইরূপ পাঠ করিলে এ ছন্দের বৈশিষ্ট্যই লোপ পাইবে, যথা—

> ´একখানি তার | ´তরী ছিল | বিজন শূন্য | ´ঘাটে বাঁধা

তেমন করিয়া পড়া সর্ব্বত্র সম্ভবও হইবে না, যেমন—

> বহে শীতের প্রখর বাতাস উড়িয়ে তাদের ছেঁড়া কাপড়

—এখানে প্রথম হইতে 'বাতাস' পর্য্যন্ত একটানে পড়িতে হইবে, নহিলে স্পষ্ট ছন্দভঙ্গ হইবে। ইহার পরের পংক্তিও ঐরূপ—

গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপে আগুন ছোটে, জানে না সে

—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পর্ব্ব ত্যাগ করিয়া পদভাগ অনুসারেই পাঠ করিতে হইবে, এবং তাহাতে ঝোঁকগুলি সমান ভাবে পড়িবে না। এইরূপ পদভূমকের ছাঁচে ঢালিয়া না লইলে, 'বহে শীতের প্রখর বাতাস', অথবা, 'গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপে' প্রভৃতি পদগুলি পর্ব্ব বা ছড়ার গোত্রে কূল পাইবে না। আবার—

এবটি যুবা সুগৌর, হ্রস্ব, চড়ে' একখান চতুরশ্ব
মন্দগতি 'ফেটিনাখ্য' যানে, যাচ্ছেন সগৌরবে,—
অতি সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি, পবনে তাঁর রেশ্‌মি কুর্ত্তি,
বেশ্‌মি ধুতি, জরির টুপি,—বয়স বছর পঁচিশ হবে,
সুবিস্তৃত পরিসর যেন বিন্ধ্য মহীধর
কিম্বা ইন্দ্র ঐরাবতে,—তিনি হচ্ছেন বিয়ের বর।

—এখানে পদভাগ যেমন সুস্পষ্ট, অক্ষর (syllable) ও বর্ণের ভেদও তেমনই সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে; কাবণ, এখানে সর্ব্বত্র মাত্রার পরিমাণ—৪, এবং তাহাতেও বর্ণ ও অক্ষর সমমূল্য—ইহাই যেন ঘোষণা করা হইয়াছে। আবাব, ইহা যে পর্ব্বভাগের ছন্দ নয়—পদভাগের ছন্দ, তাহাও নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে, এই পদভাগ সর্ব্বত্র আট মাত্রার, যতিও অতিশয় নির্দ্দিষ্ট। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আরও একটি দৃষ্টান্ত দিব—

এই যে মহাসৃষ্টি একি | শূন্যে উড্ডীন পরমাণুর | উদ্‌ভ্রান্ত সম্পাত?

এ আশ্চর্য্য বিশ্বনিয়ম | এ আশ্চর্য্য বুদ্ধি বিকাশ— | এ কি অকস্মাৎ?

এই যে আকাশ ব্যেপে এই যে | মহাছন্দে মহানৃত্য, | গীতি সুগম্ভীর—

এ কি ভাবশূন্য প্রলাপ? | এ কি মদোন্মত্ত হাস্য | ব্রহ্মাণ্ডপতির? (আলেখ্য)

—এখানেও পর্ব্বের পরিবর্ত্তে পদভাগ আবও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; এবং ঝোঁকগুলিও, চার-চার অক্ষর পর্ব্বের আদ্য ঝোঁক না হইয়া, অতিশয় স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গির অর্থানুরূপ (Rhetorical) ঝোঁক হইয়া উঠিয়াছে; পদভাগও, পয়ারের মত—৮, ৮, ও ৫ মাত্রার। এ যেন পর্ব্ব, পদ ও ছড়ার এক অদ্ভুত মিশ্রণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই নূতন ছন্দসৃষ্টির প্রয়াস হইতে সেই এক তত্ত্বের আরও প্রমাণ পাইতেছি, তাহা এই যে, পয়ারে শুধুই স্বরান্ত বর্ণ নয়, হসন্ত বর্ণেরও প্রায় সমান মর্য্যাদা আছে; কথ্যভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণে আমরা এই হসন্তকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করি বলিয়া, সেই হসন্তলঙ্ঘনকারী, এবং বিশুদ্ধ, অর্থাৎ—অর্থানুসারী ঝোঁক-প্রধান—বাক্যচ্ছন্দকে পর্ব্ব ও পদের পার্থক্য-মুক্ত করিয়া একটা নিছক গণিতমূলক ছন্দ গঠন করা যায় বটে—এবং তদ্দ্বারা বাংলাছন্দের একটা মূলসূত্র নির্দ্দেশ করাও হয়ত' সম্ভব, কিন্তু সেই ছন্দ যে কবিতার ছন্দ নয়—ছন্দের সঙ্গে কবিতার প্রাণের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক যে আর থাকে না, গদ্য ও পদ্যের ভেদ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়—এই ধরণের কবিতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ব্যঞ্জন বা হসন্তপ্রধান কথ্যবাংলার ধ্বনিই স্বতন্ত্র, তাই তাহার ছন্দও ভিন্ন প্রকৃতির; তাহাতে হসন্ত বা যুক্তবর্ণের মাত্রা-হিসাবে কোন পৃথক মূল্য নাই, এজন্য তাহার চালও যেমন—তাহার সুরও তেমনই, পয়ার হইতে এত বিলক্ষণ। বাংলা ভাষার অপর রীতি—যাহাকে সাধুভাষা বলা হয়—তাহা এমনই স্বরপ্রধান যে, তাহার অন্তর্গত হসন্ত বর্ণকেও কোন না কোন উপায়ে স্বর-গৌরব দান করিতে হয়। এইজন্য খাঁটি পয়ার পর্ব্বমাত্রকেই পরিহার করে; 'পদ-চার'ই তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—পদভাগ ব্যতিরেকে তাহা পদ্য হইয়া উঠে না। বাংলা বাক্যচ্ছন্দের প্রকৃতিমূলে যাহাই থাক, ঐ দুই ভাষার দুই ভঙ্গিকে একই নিয়মের অধীন করিয়া ছন্দ রচনা করিলে যাহা হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা দেখাইয়া দিয়া, এবিষয়ে ছন্দ-রসিকের সব সংশয় দূর করিয়াছেন। এই ছন্দে পয়ারের যতি ও অক্ষরবৃত্তের (syllable) ঝোঁক এই দুইয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা আছে—বাংলা ভাষার কথ্যরূপটিকে কথ্যভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিতেই ছন্দে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ ছন্দে কোন প্রকার সুরের অবকাশ মাত্র নাই—খাঁটি সাদা জল, একটু রঙ বা গন্ধ নাই। ইহাতে ছড়ার ছন্দের একঘেয়ে চার-মাত্রার চাল নাই, কাজেই স্বরের নৃত্যভঙ্গিও নাই; আবার, পয়ারের বা পদভূমক ছন্দের ৮ বা ১০ মাত্রার চাল বজায় থাকিলেও, অর্থাৎ, ইহার যতি পয়ারের মত হইলেও, ইহাতে হসন্ত ও স্বরান্ত বর্ণের সেই প্রতিযোগিতা নাই (কারণ, হসন্ত বর্ণগুলি উহ্য হইয়া আছে)—যাহার ফলে বাংলা পয়ার ছন্দ সাধারণ ছন্দ-বিজ্ঞানকে উপহাস করিয়া এক অপূর্ব্ব

স্বরবৈচিত্র্যের অধিকারী হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই নূতন ছন্দ যেমন বাংলা-ছন্দে, অক্ষর ও বর্ণের অভেদ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, তেমনই ইহাও প্রমাণ করিয়াছে যে, ছন্দ একটা পৃথক বস্তু নয়; ব্যাকরণ বা ধ্বনিবিজ্ঞানই ছন্দো-মীমাংসার পক্ষে যথেষ্ট নয়—ছন্দমাত্রেই কবিতার ছন্দ, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে; কবিতা রচনা-কালেও যেমন, ছন্দসূত্র-নির্ম্মাণ-কালেও তেমনই, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

চার মাত্রার দ্বৈমাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। চার মাত্রার বলিয়া—এই ছন্দের চলনে কোন বৈচিত্র্য বা জটিলতা নাই, কেবল এক হইতে তিন মাত্রার খণ্ড-পর্ব্ব, এবং পর্ব্ব-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে যাহা কিছু বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তৎসত্বেও ইহার একটা বিশেষ সুবিধা এই যে—হসন্ত, স্বরান্ত ও যুক্তবর্ণের সমাবেশে, ইহার সুর অনায়াসে সকল পর্দ্দায় উঠিতে ও নামিতে পারে; পূর্ব্বে তাহার উদাহরণ দিয়াছি।

পর্ব্বভূমক ছন্দের সাধারণ রেওয়াজ ত্রৈমাত্রিক—তার কারণ বোধ হয় এই যে, ত্রৈমাত্রিকই পয়ার হইতে অধিকতর বিলক্ষণ; দ্বৈমাত্রিকে পর্ব্বস্পন্দ থাকিলেও, পয়ারের সঙ্গে উহার একটা গূঢ় সগোত্রতা আছে; তাই, আমাদের কবিরা ত্রৈমাত্রিকের স্বাদ-বদলের জন্যই, দ্বৈমাত্রিককে বেশ একটু রকম-ফেরের মত উপভোগ করেন। এই ছন্দের ছন্দভাগ সাধারণত—(৪+৪) ৮ মাত্রার হইয়া থাকে, এবং এই ৮ সর্ব্বত্র ৪+৪ না হইয়া অনায়াসে ৬(৩+৩)+২ হইয়া থাকে; ত্রৈমাত্রিক ছন্দভাগও এইরূপ ৬+২ হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। অতএব এই আটের মধ্যে তিন ও চার মাত্রার লুকাচুরি-খেলা সব সময়েই সম্ভব; অর্থাৎ, এই গঠনের ছন্দভাগে Rhythmical Variation-এর বড়ই সুবিধা হয়। দ্বৈমাত্রিক ছন্দে, লয় ঠিক রাখিয়া, এই ৩+৩+২ এবং ৪+৪ কেমন মিলিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত—

> হাঁগো, এ কাদের দেশে
> বিদেশী নামিনু এসে—
> তাহারে শুধানু হেসে
> যেমনি,

অমনি কথা না বলি,
ভরাঘট ছলছলি,
নতমুখে গেল চলি
তরুণী,
এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী। (রবীন্দ্রনাথ)

—এখানে এই পুঞ্জপদী কবিতাটির প্রথম দিককার ছন্দভাগ—৩+৩+২, কিন্তু শেষের দিকে ৪+৪ এর গঠন আছে। লয় হিসাবে ইহারা সর্ব্বত্র এক—প্রথম দিকে তাহা মোট আটের মধ্যে মিলাইয়া আছে, শেষের দিকে চারের চাল স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। এইরূপ গঠনের লয়ের কথা আমি পূর্ব্বে, ত্রৈমাত্রিক ও পয়ার উভয়বিধ ছন্দের প্রসঙ্গে, ব্যাখ্যা করিয়াছি। উপরে উদ্ধৃত কবিতাটিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, প্রথম দিকে স্পষ্ট চারের পর্ব্ব না থাকায়—এবং ত্রৈমাত্রিকের তরঙ্গ-প্রয়াতও থাকায়, ছন্দ অপেক্ষাকৃত মন্দগতি হইয়াছে; কিন্তু শেষের দিকে, তাহা হ্রস্বতর পর্ব্ব-স্পন্দের সুযোগে দ্রুততর হইয়া ভাবকেও কেমন রূপ দিয়াছে! আট মাত্রার ছন্দভাগের এই দ্বৈমাত্রিক চাল যেন পদ ও পর্ব্বের সমন্বয়-স্থল—ইহাতে ত্রৈমাত্রিক ৩+৩+২ ও দ্বৈমাত্রিক ৪+৪ যেমন নিহিত আছে, তেমনই, পয়ারের আট মাত্রার পদও যেন ইহাকে পিছন হইতে ধরিয়া আছে; এজন্য ইহা দ্বারা ভাব অনুযায়ী সব রকমের লয় সৃষ্টি করা যায়।

তথাপি, এইরূপ ছন্দভাগ ঐ তিন ঠাটেই সম্ভব হইলেও, ঝোঁক বা পর্ব্বস্পন্দ হিসাবে তাহা এক নয়। পর্ব্বভূমক ছন্দে ইহাতে দুইটির বেশি ঝোঁক পড়িবে না।

হাঁগো-এ কা * দের-দেশে
বিদে-শী না * মিনু-এসে

—এই দ্বৈমাত্রিক লয় যেমন এখানেও রহিয়াছে, তেমনই ঝোঁক প্রতি চারের হিসাবে একটা করিয়াই আছে; কেবল Rhythmical Variation-এর জন্য একটু ওলট-পালট হইয়াছে, যথা—

হাঁ গো এ | কাদের দেশে,

বিদেশী | নামিনু এসে—।

কিন্তু শেষের দিকের—

ভ'রা-ঘট * ছ'ল-ছলি

ন'ত-মুখে * গে'ল-চলি

—প্রভৃতির গঠনে ঝোঁক যেমন নিয়মিত, তেমনই, দুই মাত্রার টুকরাগুলি ছন্দের গতিকে তুরঙ্গ-প্রয়াত করিয়া তুলিয়াছে। আট মাত্রার পয়ারের পদে ঝোঁক যেমন ভিন্ন প্রকৃতির—তেমনই তাহার নিয়মও স্বতন্ত্র; যথা—

মনে পড়ে বরিষার | বৃন্দাবন অভিসার (রবীন্দ্রনাথ)

কিংবা

শ্যামল তমাল তল | নীল যমুনার জল (ঐ)

—এখানে, আদ্য ঝোঁক, যুক্তবর্ণের জন্য পূর্ব্বাক্ষরের স্বরসংকোচ, এবং হসন্ত-শেষ অক্ষরের স্বরপ্রসারণ প্রভৃতির ফলে, ছন্দের তরঙ্গ সম্পূর্ণ অন্যরূপ, যেমন্—

ম'নে পড়ে বরিষা-র | বৃ'ন্দা ব ন অ'ভি সা-র

এবং—

শ্যা'মল্ ত'মা ল্ ত'-ল্ | নী-ল্ য'মু না-র জ'ল্

অথবা, আরও টানিয়া—

শ্যা'ম-ল্ ত'মা-ল্ ত-ল্ | নী-ল্ য'মু না-র জ-ল্।

সর্ব্বশেষে, আমি এই চার মাত্রার পর্ব্বভূমক ছন্দের একটা সুবিধার কথা বলিব। এই ছন্দেই, বাংলায় সংস্কৃতের মত দীর্ঘতম চরণ গঠন করা যায়; শুধু তাহাই নয়, সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের তরঙ্গায়িত ছন্দে এক একটি বৃহত্তর পদও যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী পদের অনুধাবন করিয়া অপূর্ব্ব সুর-গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করে, তেমনই, এই ছন্দেও সেইরূপ দীর্ঘচ্ছন্দ সুর-তরঙ্গের অবকাশ আছে, যথা—

মুখরিত দিগ্‌দশ * চকিত জগজ্জন | পবন চলিত মৃদু * মন্দে (অজ্ঞাত)

*　　　*　　　*

পতন অভ্যুদয় * বন্ধুর পন্থা | যুগ-যুগ ধাবিত * যাত্রী (রবীন্দ্রনাথ)

—যেমন, তেমনই—

ডুববে পাহাড় বন * ডুবে যাবে চরাচর | ধরণীর উন্মাদ * নৃত্যে,
অদূরে গুহার মুখে * সিংহের গর্জ্জন | শিহর তুলিবে তব * চিত্তে।
('ঘাসের ফুল')

পঞ্চম অধ্যায়

ছড়ার ছন্দ ; সাধুভাষা ও কথ্যভাষার উচ্চারণগত ধ্বনি-ভেদ ; স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি—কথ্যভাষা ব্যঞ্জনবহুল বা হসন্ত-প্রধান ; অক্ষর-মাত্রা ও পর্ব্বচ্ছেদ ; পর্ব্বের মধ্যস্থ ও অন্তস্থ হসন্তবর্ণের প্রভাব, ও তজ্জন্য আদ্য অক্ষরে প্রবল ঝোঁক—স্বর-বিস্ফোরণ ও ব্যঞ্জনের ঠোকাঠুকি ; এ ছন্দ অক্ষরমাত্রিক হইলেও মাত্রাগুণবর্জ্জিত—এক প্রকার 'অক্ষর (syllable)-মাত্রিক পর্ব্বভূমক' ; বাংলা কবিতায় এই ছন্দের প্রসার—রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ; এ ছন্দের আদি-রূপ ; প্রতি পর্ব্বে হসন্ত-বর্ণের সংখ্যা ; এ ছন্দের বৈচিত্র্য,—অধিক নয় কেন ; ইহাতে Hypermetric-এর ব্যবহার ; রবীন্দ্রনাথের মতে এ ছন্দ ত্রৈমাত্রিক—কি অর্থে ?

এইবার আমি ছড়ার ছন্দ বা কথ্যবাংলার ছন্দ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। সাধুভাষার ছন্দ হইতে যখন এই ছন্দে আসি, তখন ভাষার উচ্চারণরীতিগত প্রভেদ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। আমরা যে-ভাষায় সাহিত্য রচনা করি, অথবা—করিতাম (কারণ, এখন উভয় ভাষাতেই তাহা করা হইতেছে), তাহার উচ্চারণে স্বর-ধ্বনির প্রাধান্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্বরযুক্ত না হইলে অক্ষর বা syllable হইতে পারে না, ইহা সত্য, কিন্তু সাধুভাষার যে ধ্বনিপ্রকৃতি, তাহাতে স্বরের মর্য্যাদা যতখানি বিদ্যমান, কথ্য বাংলায় তাহা নাই। ওখানে ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরের যে শাসন মানে, এখানে স্বরধ্বনি সেইরূপ ব্যঞ্জনের শাসন মানে ; ওখানে যাহা ব্যঞ্জনারূঢ় স্বর, এখানে তাহা স্বরারূঢ় ব্যঞ্জন। ওখানে মাত্রার হিসাবে যুক্তাক্ষরের যে-কারণে যে-ওজন আছে, এখানে তাহা নাই ; মাত্রার একরূপ হিসাব এখানেও আছে, কিন্তু সে হিসাবে স্বর-সঙ্কোচন বা বা প্রসারণের প্রশ্ন নাই—মধ্যস্থ বা অন্তস্থ বর্ণে স্বরের অভাবে, শব্দের আদ্য-অক্ষরে যে টঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ করিবার জন্য যে কয়টি ধ্বনিস্থানের আবশ্যক, তাহারই একটা হিসাব আছে। বাংলা উচ্চারণে সর্ব্বত্র শব্দের বা বাক্যাংশের আদিতে যে ঝোঁক পড়ে—যে ঝোঁক পর্ব্বভূমক এবং পদভূমক ছন্দেও ভিন্ন প্রকারে কাজে লাগে, সেই ঝোঁক এই ছড়ার ছন্দে—ভাষা ব্যঞ্জনবহুল বা হসন্তপ্রধান বলিয়া—একটু স্বতন্ত্র ক্রিয়া করিয়া থাকে। কথ্যবাংলার বাক্য ছন্দিত হইতে গেলেই—ওই ঝোঁকেরই বিশিষ্ট শক্তির গুণে, চারিটি ধ্বনিস্থান লইয়া এক একটি পর্ব্ব গড়িয়া উঠে ; এই চারের রহস্য বাংলা বাক্-প্রকৃতিরই আদি রহস্য, তাই কথ্য বাংলায় তাহা এমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। আমি শব্দের আদ্য

অক্ষরে যে টঙ্কার উৎপন্ন হওয়ার কথা বলিয়াছি, এবং তাহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি—সেই বাংলা উচ্চারণ-রীতি—সাধুভাষার ছন্দেও আছে; কিন্তু এই ছড়ার ছন্দে সেই ঝোঁক যে উপায়ে ঐ ছন্দকে রূপ দেয়, তাহা যে ঐ মধ্য বা অন্ত্য হসন্ত বর্ণের কারণে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এই ছন্দের সাধারণ রূপটির প্রধান উপাদান দুইটি—(১) ইহার ধ্বনিস্থানের সংখ্যা সর্ব্বদাই চার, (২) আদ্য বর্ণের ঝোঁকটিকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য ধ্বনিস্থানের উপযুক্ত অবকাশে হসন্তের সন্নিবেশ। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত লওয়া যাক, যথা—

ব্ষ্টি পড়ে | টাপুর-টুপুর | নদ্‌ী এল্‌ | বান

—'নদেয় এল বান' নয়। এখানে প্রত্যেক অক্ষর বা স্বরান্ত বর্ণই গণনীয়, এবং সেই গণনায় চারিটি করিয়া ধ্বনিস্থান পাওয়া যাইবে। তথাপি, তাহা চার মাত্রা নয়, কারণ এ অক্ষরগুলি আদ্য-অক্ষরের ঝোঁককে ধারণ করিয়া থাকে মাত্র; ধ্বনিগুলির যে কাল-পরিমাণ তাহা পিণ্ডীকৃত হইয়া, ছন্দের তাল রক্ষা করে—অক্ষরের কোন গৌরব বা পৃথক মর্য্যাদা রক্ষা করে না। এই ভাষায় যুক্তাক্ষরের কোন বিশেষ মূল্য নাই—সকল বর্ণই মুক্ত, কেহ যুক্ত নয়; এখানে যুক্তবর্ণ কার্য্যত পরস্পর অযুক্ত থাকে, হসন্তই থাকে, এবং ঐ মধ্যস্থ হসন্ত আদ্য-অক্ষরের স্বরকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করে না, তাহার 'ঝোঁক', বা উচ্চারণক্রিয়ার জোরকে বর্দ্ধিত করে মাত্র—ইহাকে accent বা স্বরবৃদ্ধি, stress বা ঠেস, বলা যাইতে পারে। সাধুভাষায় যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব অক্ষরে যেটুকু জোর বা স্বরবৃদ্ধি ঘটে, তাহা এইরূপ 'ঠেস' হইতে স্বতন্ত্র; সে উচ্চারণে এইরূপ ঠকর বা উচট খাওয়া নাই, দ্রুততাও নাই, স্বরের একটু দীর্ঘত্ব অথবা গুরুত্ব আছে মাত্র। কিন্তু 'বিষ্টি পড়ে'র বিষ্‌টি'তে—যুক্তাক্ষর নয়—হসন্তই ধর্ত্তব্য; তাহার ফলে, পূর্ব্ব-অক্ষরে যাহা ঘটে, তাহাকে আমি 'স্বর-বিস্ফোরণ' বলিব, এবং ইহাতেও একরূপ ব্যঞ্জন-সংঘাতই ঘটিয়া থাকে। সাধুভাষায় স্বরের প্রাধান্য থাকায় 'বৃষ্টি' এই শব্দটির উচ্চারণ—বৃ-ষ+টি (স্বর-প্রসারণ) এবং বৃ'ষ+টি (স্বর-সঙ্কোচ)—এই দুই প্রকার হইতে পারে। কিন্তু এই ভাষার উচ্চারণে, 'বিষ্টি'র 'ষ্‌'—পূর্ব্ব অক্ষরের স্বর-বিস্ফোরণের ফলে যেন ছিটকাইয়া উঠিয়া দুইদিকের ব্যঞ্জনধ্বনিকে সংঘট্টিত করিয়া তোলে,

যথা—'বি'ষ'টি' ; সাধুভাষার উচ্চারণে দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে, এখানে তাহা থাকে না। সাধুভাষার এই উচ্চারণ-ধর্ম্মই তাহাকে প্রাকৃত ভাষা হইতে এমন বিলক্ষণ করিয়াছে ; এখানে যে ধ্বনি ভেক-প্রলম্ফী, সেখানে তাহা গজেন্দ্রগামী ; এখানে যাহা রীতিমত 'ঠেস', ওখানে তাহা মাত্রার একরূপ গুরুত্ব বা দীর্ঘত্ব ; এবং, পর্ব্বভূমক ছন্দে পর্ব্বের সঙ্কীর্ণ অবকাশে পূর্ব্বাক্ষরের সেই গুরুত্বই, দ্রুততর গতির সুবিধা পাইয়া, একটু নাচিয়া উঠে মাত্র ; কিন্তু সেখানেও দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে একটু ফাঁক থাকে—স্বরবিস্ফোরণের দ্বারা এমন সংঘট্টিত হইতে পারে না।

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে...
রক্ততিলক ললাটে পরাল (রবীন্দ্রনাথ)

—ইহাদের পর্ব্বগুলির লয় একই, এজন্য, 'কাদের' 'গগন', 'তিলক' প্রভৃতির আদ্য-অক্ষরের উচ্চারণে জোর যতখানি, 'কণ্ঠে', 'রক্ত' 'প্রভৃতিতেও ততখানি হওয়াই সঙ্গত—'ক''ণ্‌ঠে', 'ম''ন্‌থে' না হইয়া 'কণ্‌+ঠে' 'মন্‌+থে' হওয়াই আবশ্যক।

কথ্যভাষায় স্বরধ্বনির এই লীলার অবকাশ না থাকায় ইহার অক্ষরের কোন মাত্রা-গুণ নাই—বাংলা সাধুভাষায় সেই গুণ যেটুকু যে হিসাবে বিদ্যমান আছে, এখানে সেটুকুও নাই। তথাপি, একটা মাপ না থাকিলে ছন্দ হয় না ; এখানে সেই মাপ কি হিসাবে আছে, তাহা বলিয়াছি ; প্রত্যেক পর্ব্বে স্বর বা স্বরান্ত বর্ণের একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায় বলিয়া, এই ছন্দকে একপ্রকার 'অক্ষরবৃত্ত পর্ব্বভূমক-ছন্দ'—নাম দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলা কাব্যে এই ছন্দের প্রসার পূর্ব্বে তেমন ছিল না, তাহার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে—ছড়া, ব্রতকথা এবং অতি প্রাচীন প্রবচনের অনেক পংক্তি এই ছন্দে রচিত হইয়া থাকিলেও, যখন হইতে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক কর্ষণ সুরু হইয়াছে, এবং বোধ হয়, তজ্জন্য শিষ্ট-সমাজে মুখের ভাষাতেও যখন সেই সংস্কৃতির প্রভাব পড়িতে সুরু হইয়াছে, তখন হইতেই সকল পদ্য-রচনাতে পয়ারের ভঙ্গিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেখা যায়। আমি নিম্নে দুই চারিটি প্রবচন উদ্ধৃত করিতেছি ; এগুলি খুব শুদ্ধ সাধুভাষার রচনা নয়, তথাপি ইহাদের ছন্দও ছড়ার ছন্দ নয়। ইহা হইতে মনে হয়, বাংলা ভাষার আদিম প্রকৃতি ও তাহার পদ্য-ছন্দ যেমনই

হউক—সেই আদিমতা অনেকদিনই ঘুচিয়াছে; মুখের বুলি যখনই রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছে, তখনই, উচ্চারণে ও ছন্দে সেই আদি ভঙ্গি পরিত্যক্ত হইয়াছে, যথা—

পরের সোনা না দিও কানে।
প্রাণ যাবে তোর হেঁচ্‌কা টানে॥

* *

যত হাসি তত কান্না
বলে গেছে রামশর্ম্মা॥

* * *

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা।
যথা ইচ্ছা তথা যা॥

* * *

মনের অগোচর পাপ নেই।
মার অগোচর বাপ নেই॥

* * *

যার শিল যার নোড়া।
তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া॥

* * *

থাকতে দিল না ভাত কাপড়।
মরলে করবে দানসাগর॥

* * *

দশে মিলি করি কাজ।
হারি জিতি, নাহি লাজ॥

* * *

যত ছিল নাড়া-বুনে।
সব হ'ল কীর্ত্তুনে॥

* * *

বিবাহ তৃতীয় পক্ষে।
সে কেবল পিণ্ডি রক্ষে॥

* * *

ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন
বাইরে কোঁচার পত্তন।

উপরের প্রবচনগুলির পদ্য-ভঙ্গি স্পষ্ট পয়ারের, অর্থাৎ—মাত্রিক; হসন্তের গোলমাল যেখানে যেটুকু আছে, তাহা রচনার দোষ—সে দোষ সেকালের সকল কবিদের রচনায় আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ছড়ার ছন্দ চিরদিনই অতিশয়

গ্রাম্য ও মেয়েলী রচনায় আপনা হইতেই আসিয়া পড়িত বটে, কিন্তু তাহা অতিশয় চল্‌তি প্রবচনের মধ্যেও গ্রাহ্য হয় নাই।

এই ছড়ার ছন্দকে ইদানীন্তন কালে, প্রথমে রবীন্দ্রনাথ, ও পরে সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিগণ একটি বিশিষ্ট ছন্দধ্বনির গৌরবে উন্নীত করিয়া, তাহাকে বাংলা গীতিকবিতায় এক অভিনব সঙ্গীত-সৃষ্টির কাজে লাগাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ গীতি-প্রতিভার বলে, কেবল কাব্যরস-সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে ইহাকে যেভাবে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহাতে ইহার ধ্বনিপ্রকৃতির গাণিতিক হিসাব বা অক্ষর-বিন্যাসের সূক্ষ্ম পারিপাট্যের বালাই নাই; কেবল পর্ব্বসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, বিবিধ চরণ-গঠন, এবং শব্দযোজনার যাদুমন্ত্রে, তিনি এই ছন্দকে কাব্যের কৌলীন্য দান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এই ছন্দের ষৎপরোনাস্তি কর্ষণ করিয়া, ইহার বিশিষ্ট ধ্বনি হইতেই নানা ভঙ্গির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আমি প্রথমে এ ছন্দের আদি রূপের কথাই বলিব।

বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এল | বান

অথবা,

কৃষ্ণকলি | আমি তারেই | বলি,

কালো তারে | বলে গাঁয়ের | লোক (রবীন্দ্রনাথ)

—ইহাই এ ছন্দের আদি রূপ—প্রতি পর্ব্বে চারিটি স্বরান্ত বর্ণ বা অক্ষর, এবং প্রতি পর্ব্বের আদ্য-অক্ষরে একটি করিয়া ঝোঁক। এই ঝোঁকের কথা আগে বলিয়াছি। বার বার পড়িলেই বোঝা যাইবে—এই ঝোঁকের জন্য, ঐ আদ্য-অক্ষরের সঙ্গে একটি হসন্ত-বর্ণ থাকা আবশ্যক যেমন, 'বিষ্‌-টি পড়ে', 'কৃষ্‌-ণ-কলি'; কিন্তু 'টাপুর টুপুর'-এ আদ্য অক্ষরের পরেই হসন্ত নাই—প্রথম শব্দটির অন্তে আছে, এবং তাহাতেই ওই ঝোঁকের পুষ্টিসাধন হইয়াছে। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই পর্ব্বের শেষের হসন্ত কোন কাজই করিতেছে না—না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। বাকি অপর পর্ব্বগুলিতে, এইরূপ স্থানে—আদিতে বা অন্তে—হসন্তবর্ণ নাই; তাহার ফলে, ঝোঁকগুলি স্বচ্ছন্দ বা স্বাভাবিক না হইয়া একটু অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। অবশ্য, যদি শব্দের উপরে Rhetorical ঝোঁক বা Emphasis থাকে,

তাহা হইলে হসন্তের এইরূপ পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয় না—যেমন 'কালো তারে'—এখানে 'কালো'র উপরে অর্থের জোর থাকায় হসন্তের অভাব ধরা পড়ে না। তেমনই—

> ´আমি নাবব | ´মহাকাব্য
>
> ´সংরচনে,
>
> ´ছিল মনে—
>
> ´ঠেকল কখন | ´তোমার কাঁকণ
>
> ´কিঙ্কিণীতে—(রবীন্দ্রনাথ)

—এখানে সব কয়টি পর্ব্বেই—হয় হসন্ত, নয় অর্থঘটিত জোরের দ্বারা—আদ্য অক্ষরের ঝোঁক বজায় আছে; কেবল 'ছিল মনে'র 'ছি' অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, কারণ ইহাতে কোনটাই নাই। 'ছিল মনে' যদি 'ছিলেন মনে' হইতে পারিত, তবে এই দোষ ঘটিত না, কারণ, হসন্তটি আদ্য-অক্ষরে যুক্ত না থাকিয়া যদি শব্দের শেষেও থাকে, তাহা হইলেও ঝোঁকটির বলহানি হয় না। এখানেও লক্ষ্য করা যাইবে যে পর্ব্বের অন্তস্থিত হসন্তের কোন পৃথক মূল্য নাই।

অতঃপর প্রশ্ন উঠিতে পারে—ছড়ার ছন্দের এই যে পর্ব্ব, উহাতে কয়টি হসন্ত-বর্ণ স্থান পাইতে পারে? কারণ, আমরা দেখিয়াছি উপযুক্ত স্থানে একটি হসন্ত থাকিলেই এ ছন্দের ঝোঁকঘটিত প্রয়োজন সম্পূর্ণ হয়, এবং ঝোঁকযুক্ত আদ্যবর্ণ ও তিনটি স্বরান্ত বর্ণের দ্বারা ইহার পর্ব্বগত ধ্বনিপরিমাণও পূরণ হইয়া থাকে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পর্ব্বান্তিক হসন্ত বর্ণে ইহার ধ্বনি-পরিমাণ ক্ষুণ্ণ বা পূর্ণ হয় না। তবে কি চারিটি ধ্বনিস্থানেই অক্ষরের সঙ্গে হসন্ত-বর্ণ থাকিলে ক্ষতি নাই? তাহা নহে। আদ্য-ঝোঁকের জোরে হসন্তবর্ণের ধ্বনি যতই অবলুপ্ত হউক, উহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে পর্ব্বমধ্যে একটা ভার-সঙ্কার হয়—দেখা যায় যে, একই পর্ব্বে অতিরিক্ত হসন্তবর্ণ দুইটির বেশি হইলে ছন্দপীড়া ঘটে, অথচ যথাস্থানে একটি থাকিলেও কাজ চলিয়া যায়। অতএব বলা যাইতে পারে, এই ছন্দের পর্ব্বগত ধ্বনি-পরিমাণের একটা স্থিতিস্থাপকতা আছে, এবং তাহারও একটা সীমা আছে। চারিটি স্বরান্ত বর্ণ, এবং আদ্য-অক্ষরের ঝোঁকের জন্য একটি হসন্ত বর্ণ—ইহাই ইহার ন্যূনতম হিসাব

হইলেও, আর একটি মাত্র হসন্ত বর্ণকে সে হেলায় বহন করিতে পারে। তিনটিতে ছন্দ পীড়িত হয়—তখন সেই তিনটির দুইটিকে একটি স্বরান্তের ওজন দিয়া পর্ব্ব-রচনা করিলে, ভারসাম্য কতকটা রক্ষা হইয়া থাকে ; যথা,—

আ́য় আ́য় সই • জ́ল আনিগে • চ́ল্ ('ইন্দিরা')

—ইহার প্রথম পর্ব্বটিতে তিনটি মাত্র অক্ষর (syllable) ও তিনটি হসন্ত বর্ণ আছে ; কিন্তু তাহাতেই পর্ব্বের ধ্বনি-পরিমাণ বজায় আছে ; কারণ, ঐ তিনটি হসন্তের দুইটিতে একটি অক্ষরের কাজ করিতেছে। কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, (কোন এক ছন্দ-পণ্ডিত যেমন বলিয়াছেন) এই ছড়ার ছন্দে মাপের কোন নির্দ্দিষ্ট হিসাব নাই। বরং, ইহাই বলা যাইতে পারে যে, এই ছন্দের মাপ অতিশয় সহজ ও সুনির্দ্দিষ্ট—হসন্তবর্ণের জন্য সে মাপের কিছুই ব্যতিক্রম হয় না ; কেবল ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, একটিও হসন্তবর্ণ না থাকিলে পর্ব্বটি পঙ্গু হইয়া থাকে, এবং দুইয়ের বেশি হইলে ছন্দ টলিতে থাকে। আমি আরও সূক্ষ্ম হিসাবের মধ্যে যাইব না—বিশেষ জানিবার জন্য, সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলি।

এই ছন্দের সাধারণ রূপ যাহা, তাহাতে অধিক বৈচিত্র্য নাই—পর্ব্বের সংখ্যা কম বা বেশির জন্য, এবং নানা আকারের খণ্ডপর্ব্বযোগে, যাহা কিছু বৈচিত্র্য ঘটে ; নিম্নে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিলাম—

(১) চারিটি পর্ব্ব আছে, খণ্ডপর্ব্ব নাই—

এই যে ছিল • সোনার আলো • ছড়িয়ে হেথা • ইতস্ততঃ
আপ্‌নি-খোসা • কম্‌লা-কোয়ার • কমলা-ফুলি • রোয়ার মত। (সত্যেন্দ্রনাথ)

(২) চার পর্ব্ব ও এক খণ্ডপর্ব্ব—বৃহত্তম চরণ। (খণ্ডপর্ব্ব এক হইতে তিন অক্ষরের হইতে পারে, তাহাতে এই চার পর্ব্বের চরণই একটু ছোট-বড় হইয়া থাকে।)—

ওখানে ঠাঁই | নাই প্রভু আর | এই এশিয়ায় | দাঁড়াও সরে' | এসে—
বুদ্ধ-জনক | -কবীর-নানক | -নিমাই-নিতাই | -শুক-সনকের | দেশে। (সত্যেন্দ্রনাথ)

(৩) তিনটি পর্ব্ব—খণ্ডপর্ব্ব নাই—

অযুত ঢেউয়ের | তপ্তনিশাস | সুপ্তিহারা,
ফির্‌তেছিল | হাওয়ার ছায়া | -মূর্ত্তি পারা। (সত্যেন্দ্রনাথ)

(৪) Hypermetric বাদে, মূল চরণে তিনটি পর্ব্ব ও একটি দুই অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব—

ওরে বিহান হ'ল • জাগো রে ভাই • ডাকে পর • স্পরে (রবীন্দ্রনাথ)

(৫) তিনটি পর্ব্ব ও একটি ৩ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব—

স্বর্ণ-শরে • পূর্ণ একি • গন্ধরাজের • তূণখানি! (সত্যেন্দ্রনাথ)

(৬) তিনটি পর্ব্ব ও একটি ১ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব—

এস তুমি • যূথির বনে • দুকূল বুলা • বে (ঐ)

*   *   *

অশ্রুমেঘের • শ্রাবণ দেখে • বন্ধু কোথা • যাও (ঐ)

(৭) দুইটি পর্ব্ব ও একটি খণ্ডপর্ব্ব—

শামার শিসে | সুরের স্তবক | হেন,
প্রাণ ছিল যার | গানের উচ্ছাস | -ভরা
কণ্ঠ তাহার | হঠাৎ নীরব | কেন,
শিউলি-বীথির | শেষ বুঝি ফুল | -ঝরা। (ঐ)

(৮) একটি পর্ব্ব ও একটি ৩ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব; তিন অক্ষর হইলেও দুই স্থানে দুই রকমের গঠন লক্ষণীয়।—

তোর চুমোতে • হয় যে লাল।

খোকাখুকীর • হাত পা গাল॥ (সত্যেন্দ্রনাথ)

*   *   *

কিশোর কিশ • লয় পরে

তোমার পরশ • সঞ্চরে (ঐ)

উপরে ছড়ার ছন্দের কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলাম, ইহাতে সেই পুরানো ছড়ার—

আয় বৃষ্টি • হে—নে।

ছাগল দেবো • মে—নে॥

—সেই ছাঁদটি নানা আকারের চরণে—

সবুজ পরী টল্‌ল না।
তোমার ভয়ে ভুল্‌ল না॥ (সত্যেন্দ্রনাথ)

—হইতে দীর্ঘতম চরণে ও বিচিত্র খণ্ডপর্ব্বে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি, আদি ছড়ার ছন্দের এই ছাঁদ, ধ্বনি-বৈচিত্র্যে পয়ার বা পর্ব্বভূমকের মত সম্পদশালী নয়। সত্যেন্দ্রনাথ হসন্তের কৌশলে যে মাত্রাবৃত্তের উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা এই ভাষার এই ছন্দই নহে; এবং ইহার চার অক্ষরের পর্ব্বকে দুইয়ে বা তিনে ভাঙিয়া তিনি যেটুকু বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাও অতিরিক্ত কৌশলসাপেক্ষ,—ইহা মনে রাখিলে, এ ছন্দের এই একঘেয়ে চারের চালই যে উহার সেই বৈচিত্র্যহীনতার কারণ এবং এই ভাষার স্বরধ্বনির দৈন্যই যে, কৌশলসত্ত্বেও, ইহার সঙ্গীত-গুণকে গ্রাম্য-ছড়ার অধিক ঊর্দ্ধে উন্নত হইতে দেয় নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমাদের কণ্ঠের স্বভাবে যে আদ্য-ঝোঁক অলঙ্ঘনীয়, তাহার জন্যই এই ছন্দেও, accent বা স্বরবৃদ্ধির স্থান-পরিবর্ত্তনের দ্বারা, খাঁটি accent-মূলক ছন্দের রূপ-বৈচিত্র্য আমদানি করা সম্ভব হয় নাই; সত্যেন্দ্রনাথের Young Lochinvar-এর অনুকরণ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। বাংলার এই আদ্য-ঝোঁককে হঠাইয়া একটু মাঝখানের দিকে আনিবার একমাত্র উপায়—চরণের আরম্ভে, তাহার বাহিরে, কিছু ছন্দাতিরিক্ত অক্ষর বসাইয়া দেওয়া, যেমন—

(এল) উতলা হাওয়া (ফুল) পুলক নিয়ে

(ক্ষীর) সাগর জলে (আলো) ঝলক দিয়ে! (সত্যেন্দ্রনাথ)

—ইহার প্রত্যেক পংক্তিতে আসল পর্ব্ব আছে দুইটি—বন্ধনীর মধ্যে যাহা আছে, তাহা ছন্দাতিরিক্ত (Hypermetric)। তথাপি এখানে ওই Hypermetric-সহ প্রত্যেক চরণ দুইটি ধ্বনিভাগে ভাগ হইয়াছে; এবং ঐ Hypermetric-এর জন্যই ঝোঁক আদিতে না পড়িয়া মধ্যস্থানে পড়িয়াছে।

ছড়ার ছন্দেও এইরূপ হয়, যথা—

(কোথাকার) ঢেউ লেগেছে

(আজি ঐ) গগন পরে,

(ধোঁয়াধার) সোঁত ভেঙেছে

মেঘের ঘরে। (সত্যেন্দ্রনাথ)

কিংবা—

(তুলে) ঢেউ গুঞ্জগাথার | কুঞ্জে ঘোরে,
(মধু-বিষ) মিশিয়ে বিধি | গড়লে ওরে!
(জানে ও) হুল ফোটাতে,
(জানে ও) ভুল ছোটাতে,
(পারে ও) ফুল ফোটাতে | প্রাণের তারে | গমক হেনে। (সত্যেন্দ্রনাথ)

ছন্দাতিরিক্ত অংশগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়াছি—ওই অক্ষরগুলি যেন কোন রকমে পার হইয়া, আসল পর্ব্বের আদ্য অক্ষরে ধাক্কা দিতে হয়। এখানেও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে, ঐ ছন্দাতিরিক্ত অংশেরও একটা মাপ আছে; এল, ফুল, ক্ষীণ, আলো—সাধুভাষার প্রকৃতি অনুসারে (কবিতাটির ছন্দ—পাঁচ মাত্রার পর্ব্বভূমক) যেমন দুই মাত্রার, তেমনই, 'কোথাকার', 'আজি ঐ' এবং 'ধোঁয়াধার'-ও কথ্যভাষার প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেকটিই তিন অক্ষরের, ইহাতে হসন্তের হিসাব নাই। কিন্তু মাঝের ছোট পংক্তিগুলিতেই Hypermetric-এর ক্রিয়া স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 'জানে ও হুল্ ফোটাতে'—যেন একটি সাত অক্ষরের (syllable) টানা একই পর্ব্ব; ঝোঁকটি তাহার মধ্যস্থলে—ঠিক চতুর্থ স্থানে (৩—১—৩) পড়িয়াছে। এজন্য Hypermetric-এর অক্ষর সংখ্যার সঙ্গে মূল পর্ব্বের অক্ষর-সংখ্যার একটা যোগ আছে দেখা যায়—না থাকিলে ছন্দটি ভালরূপ বাজিবে না। এমনই করিয়া Hypermetric-এর সাহায্যে আদ্য-ঝোঁককে লঙ্ঘন করিয়া পর্ব্বের মধ্যস্থানে ঝোঁক দেওয়া যায়—আদ্য-ঝোঁক এখানে গৌণ হইয়া থাকে। বাংলা শব্দের আদ্য-ঝোঁককে আর কোন উপায়ে, এই সকল ছন্দে, হটাইয়া লওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ, এই ছড়ার ছন্দের পর্ব্বচ্ছেদ চার না ধরিয়া, তাহাকে যে তিনের ঘরানা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। ওই ঝোঁককে যদি দুই মাত্রার ওজন দেওয়া যায়, এবং প্রতি পর্ব্বের চারকে দুই ভাগ করিয়া প্রতি ভাগে একটি পৃথক ঝোঁকের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের ঐ মত ঠিকই।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যেমন সেই ছাঁদ রক্ষা করিয়াই কবিতা রচনা করিয়াছেন—চারের পর্ব্বকে দুইয়ে ভাঙ্গিয়াছেন, এবং প্রত্যেকটিতে পৃথক ঝোঁকের উপায় করিয়াছেন, যেমন—

দুর্দ্দম • তোমার—শৌর্য্যের • বরে,

পর্ব্বত • দাঁড়ায় | গর্ব্বের • ভরে,

—তেমনই, এইরূপ কৌশল না করিলে ছড়ার ছন্দের পক্ষে এই চলন ও এই সুর স্বাভাবিক নয়; 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'কে—

বিষ্টি • পড়ে | টাপুর • টুপুর

এইরূপ করিয়া পড়িলে, তাহা স্বাভাবিক হয় না—ওইরূপ সুরে পড়া নিয়মও নয়। এখানে উহা স্পষ্টই চারের চাল, এবং আদ্য অক্ষরে একটা ঝোঁকই আছে। বরং, ইহাকে এইরূপ ত্রৈমাত্রিক-হিসাবে গণনা না করিয়া, অনায়াসে দ্বৈমাত্রিকের হিসাবে লওয়া যায়—ঐ চার আসলে দুইয়েরই গুণিতক, যথা—

কৃষ্ণ-কলি • আমি-তারেই • বলি

*   *   *

(যারা) নিত্য-কেবল • ধেনু-চরায় • বংশী-বটের • তলে (রবীন্দ্রনাথ)

—এ ছন্দে সর্ব্বত্র ঐ চারকে দুইয়ের ভাগে ভাগ হইতে দেখা যায়; কেবল, ঐ আদ্য-অক্ষরের ঝোঁকের জন্য প্রতি পর্ব্বের প্রথম খণ্ডে এমন একটা তিনের আমেজ থাকে যে, হঠাৎ পর্ব্বগুলিকে পর্ব্বভূমকের পাঁচ মাত্রার বলিয়া ধাঁধা লাগে। কিন্তু এ ভুলও চোখের ভুল—যেখানে ধ্বনিস্থান হসন্তসমেত পাঁচটা, এবং আদ্য অক্ষরের পরে হসন্ত বা যুক্ত বর্ণ থাকে সেইখানেই এইরূপ মনে হয়; কিন্তু কান ঠিক থাকিলে, ঐ ঝোঁক এবং তজ্জনিত লয়ের পার্থক্য ধরা পড়িবেই। কারণ, পর্ব্বভূমক ছন্দে স্বরধ্বনিগুলি যেমন সজাগ, তেমনই, পর্ব্বের মাত্রা-গণিত কালের পরিমাণও বেশি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক বাংলাছন্দের একটি নূতন রূপ—সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্ত-প্রাণ মাত্রাবৃত্ত', উপসংহার—বাংলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাংলাছন্দ ও 'Bar and Beat'-তত্ত্ব।

ছড়ার ছন্দ সম্বন্ধে পূর্ব্বের অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'হসন্ত-প্রাণ মাত্রাবৃত্ত' সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্তযুক্ত অক্ষরকেই (যথা—তুম্, দের্, সব্, নার্) গুরু, এবং সকল স্বরান্ত বর্ণকে (যথা—তা, কে, কি, প, স) লঘু ধরিয়া বাংলা কবিতায়, সংস্কৃতের অনুকরণে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। উহা ছড়ার ছন্দ নয় বটে; তথাপি, কথ্য বাংলা-ভাষার উচ্চারণ বজায় রাখিয়াই—আমাদের কণ্ঠের হসন্তপ্রবণতাকেই কাজে লাগাইয়া, তিনি এক নূতন ছন্দধ্বনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, বাংলা কবিতায় যে অভিনব ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, তাহা অতিশয় শ্রুতিসুখকর এবং শিল্পহিসাবে উপভোগ্যও বটে; কিন্তু সে ছন্দ কৃত্রিম, তাহাতে খাঁটি কবিতা অপেক্ষা 'চিত্রকাব্য' রচনাই সম্ভব। কারণ, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে আদ্য-ঝোঁককে কোন ক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না; এজন্য গুরু-লঘু—স্বরসন্নিবেশকালে, সেই ঝোঁককে লঙ্ঘন করিয়া—ছন্দের আবশ্যকমত, যে কোন স্থানে স্বর-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা কৃত্রিম ধ্বনিচাতুর্য্যই প্রধান হইয়া উঠে—কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। তথাপি সত্যেন্দ্রনাথ, বাঙালী কবির একটা বহুকালের আকাঙ্ক্ষা কতকটা সহজ উপায়ে মিটাইতে চাহিয়াছিলেন; প্রাচীন বাঙালী কবিদের সংস্কৃত-ছন্দে বাংলা কবিতা-রচনার কথা ছাড়িয়া দিলেও, আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষা যে প্রবল ছিল, তাহার প্রমাণ—

> চরণ অরুণবর্ণে লজ্জিছে রক্তপদ্মে,
> ক্বণিত কখনো তাহে স্বর্ণমঞ্জীর মঞ্জু। (বলদেব পালিত)
>
> *   *   *
>
> তথাপি তাহে হইয়া অতৃপ্ত
> নিশীথিনী-কান্ত নিতান্ত ধৃষ্ট
> সরোবরে শুভ্র কর প্রসারি
> জাগাইছে সুপ্ত কুমুদ্বতীরে। (ঐ)

—দীর্ঘস্বরকে ও যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণকে 'গুরু' করিয়া পড়িলে বাংলায় এরূপ ছন্দ যে কিরূপ হাস্যকর হয়, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু তথাপি আমাদের কবিগণ নিরস্ত হন নাই; সত্যেন্দ্রনাথ, বাঙালী কবিগণের সেই পুরাতন পিপাসা—দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার মতই—মিটাইয়াছেন; তিনি দীর্ঘ-হ্রস্বের এইরূপ হাস্যকর প্রমাদ না ঘটাইয়া হসন্তবর্ণের সন্নিবেশ-কৌশলে, একরূপ গুরু-লঘু মাত্রাভেদ ঠিক করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও, সংস্কৃত ছন্দের পদভাগ না মানিলে, এবং হসন্তপূর্ব্ব স্বরগুলিকে একটু সাবধানে উচ্চারণ না করিলে, ছন্দ বজায় রাখা যায় না—বাংলা স্বরে ও সুরে পড়িলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; যথা—

ভরপুর অশ্রুয়—বেদনাভারাতুর | মৌন কোন সুর—বাজায় মন (সত্যেন্দ্রনাথ)

—ইহার পদভাগ যেমন বাংলা নয়, তেমনই সর্ব্বত্র হসন্তের পূর্ব্ববর্ণে স্বর-বৃদ্ধিও স্বাভাবিক হয় না,—'ভারাতুর'-এর 'তুর'কে কিছুতেই দীর্ঘ করা যায় না।

চপল পায় • কেবল ধাই

কেবল গাই • পরীর গান।

পুলক মোর • সকল গায়,

বিভোল মোর • সকল প্রাণ। (সত্যেন্দ্রনাথ)

—এই পাঁচ মাত্রার ছন্দে, হসন্তের সংখ্যা ও স্থাননির্দ্দেশ নিয়মিত হওয়ায়, এমন একটি সুর বাজিয়াছে, যাহা সাধারণ পর্ব্বভূমকে নাই। তথাপি কবির অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় নাই; তিনি এখানে প্রত্যেক পর্ব্বের পাঁচ মাত্রাকে তিনটি অক্ষর ধরিয়া, এইরূপ গুরু-লঘু বিন্যাস করিতে চাহিয়াছেন—চপল্ পায়্; অর্থাৎ প্রথমটি 'লঘু' ও পরের দুইটি 'গুরু'—এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হয় নাই—প্রতি পর্ব্বের প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়িবেই, এবং সে ঝোঁক ঐ অন্তস্থিত হসন্তের জন্য আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ওই আদ্য-ঝোঁকই এইরূপ সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। তথাপি ঐ পর্ব্বগুলি, তিন ও দুইয়ের ভাগ হওয়ায়, এবং ঠিক ঐ সকল স্থানে হসন্তবর্ণের সন্নিবেশ থাকায়, প্রতি পর্ব্বে যেমন দুইটি করিয়া ঝোঁক মিলিয়াছে, তেমনই হসন্তপূর্ব্ব স্বরধ্বনিগুলির একটি লঘু-ললিত প্রয়াণ-ভঙ্গিও উহাতে সম্ভব

হইয়াছে—সে যেন সত্যই—'vowels that elope with ease'। পংক্তিগুলির ছন্দচিত্র কতকটা এইরূপ—

চ́ প́ ল্ পা́-য়—কে́ ব́-ল্ ধা́-ই

কে́ ব-ল্ গা́-ই প́রী́-র গা́-ন

—ইত্যাদি।

আবার—

উদ্দাম ॰ সাগর | মন্থন করো,

আন্ধের ॰ বরুণ | ছত্তর ॰ ধরো

সিংহল ॰ শ্রীভোজ | লাখ্দ্বীপ ॰ ভরো,

—জয়! জয়! (সত্যেন্দ্রনাথ)

—এখানে চারের চাল দুইয়ে ভাগ হইয়া গিয়াছে—প্রত্যেক ভাগের আদ্য-ঝোঁক রীতিমত stress বা 'ঠেস্' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানেও প্রত্যেক অর্দ্ধপর্ব্বের অন্ত্য হসন্তবর্ণ আদ্য-ঝোঁকেরই বৃদ্ধিসাধন করিতেছে। তা ছাড়া, আর একটি কৌশল ইহাতে আছে— প্রত্যেক পর্ব্বের প্রথম ভাগের আদ্য-অক্ষরের পরে একটি করিয়া যুক্তাক্ষর আছে, দ্বিতীয় ভাগটিতে তাহা নাই; তাহার ফলে ঝোঁকের বেশ তারতম্য ঘটিয়াছে—একটি ঝোঁক বড়, একটি ঝোঁক ছোট; এবং এই বড়-ছোট ঝোঁক পর পর সাজানো আছে বলিয়া একটি চমৎকার ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টি হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ এই ছন্দ সংস্কৃত ছালিক্য-ছন্দের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন; অনুকরণ যেমন হউক—ছন্দটি সুন্দর এবং তাহা বাংলা হইয়াছে।

পর্ব্বভূমক ছন্দেও—মাত্রার কেবল পরিমাণ রাখিয়া নয়—গুরু-লঘু ভেদ করিয়া, একটু ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা যায়, যথা—

দ্বৈমাত্রিক—

ভোমরায় ॰ গান গায় ॰ চরকায় ॰ শোন্ ভাই! (সত্যেন্দ্রনাথ)

কিংবা

পাড়ময় • ঝোপঝাড়

জঙ্গল • জঞ্জাল,

জলময় • শৈবাল

পান্নার • টাঁকশাল (ঐ)

ত্রৈমাত্রিক—

ওই চন্দন যার • অঙ্গের বাস • তাম্বুল-বন • কেশ (ঐ)

কিংবা

ওগো আলতায় লাল • পায় তল যার • মঞ্জীর তার • বাজবেই (করুণানিধান)

[এখানে দ্বৈমাত্রিক পর্ব্বের চারিটি মাত্রা দুইটি ডবল-মাত্রা, বা গুরুমাত্রায় পরিণত হইয়াছে; প্রতি অক্ষরে একটি করিয়া হসন্তযুক্ত থাকায় এইরূপ হইতে পারিয়াছে, যথা— ভোম্‌ রায় | গান গায়' ইত্যাদি। ত্রৈমাত্রিকেরও ছয়মাত্রা, ঐ একই কারণে, তিনটি সমান গুরু-মাত্রায় পরিণত হইয়াছে।]

সত্যেন্দ্রনাথ এই হসন্ত-জনিত লঘু-গুরু ভেদকে অধিকতর দুঃসাহসের সহিত, রীতিমত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-রচনার কাজে লাগাইয়াছিলেন,—তাহাতে সর্ব্বত্র সফল না হইলেও কোন কোন রচনায় প্রায় সফল হইয়াছিলেন—অন্ততঃ পাঠকালে মনে হয়, এমন ছন্দকে সহজ বাংলা উচ্চারণের ভঙ্গিতে ধরা যায়, এবং সেইরূপ ভঙ্গিতে ঐ ছন্দের মাত্রাবিধি খুব নিখুঁতভাবে পালন না করিলেও চলে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি-গুলিকে সাধারণ পর্ব্বভূমক ছন্দ অনুযায়ী এইরূপ বিশ্লেষ করা যায়—

সারা-নিশি-ভরা • যন্ত্রণার

দুঃস্বপন • টুটল মোর,

অশ্রু আর • দুর্দ্দশার

হয় রে শেষ • হয় রে ভোর।

—ইহার প্রথম পংক্তিতে দুইটি অসম পর্ব্ব আছে—৬ মাত্রার, ও ৫ মাত্রার; বাকিগুলির সব ৫ মাত্রার পর্ব্ব। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, উহার ধ্বনি-প্রবাহ সাধারণ পর্ব্বভূমক হইতে স্বতন্ত্র; প্রথম ছয় মাত্রার পর্ব্বটি (ইহাতে একটিও যুক্তাক্ষর বা হসন্তবর্ণ নাই) এক ঝোঁকে পড়িবার পর যে দুইটি ধাক্কা পাওয়া যায়, এবং তাহাদের স্থান যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, পর্ব্বভূমক ছন্দে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। এই ব্যবস্থার ফলে এ ছন্দের রূপ স্বতন্ত্র, যথা—

(সারানিশিভরা) যন্-ত্রঁ ণাব্

ছস্-সঁ-পন্ ৹ টুট্-লঁ-মোর—ইত্যাদি

দেখা যাইতেছে, ছন্দের প্রথম ছয় মাত্রার কোথাও ঝোঁক বা মাত্রার গুরুত্ব নাই, পরের সকল পর্ব্বেরই পাঁচ মাত্রা তিনটি অক্ষরে পরিণত হইয়াছে; এই তিনের প্রথম ও শেষ অক্ষর গুরু, এবং মাঝের অক্ষর লঘু; ('লঘু'র মাথায় একটি ৹-চিহ্ন দিয়াছি)। এমনই করিয়া পর্ব্বভূমক গীতিছন্দকে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে রীতিমত অক্ষর-মাত্রিক ছন্দে পরিণত করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যে ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হয় নাই। এই গুরু অক্ষরের উপরে যে জোর পড়িতেছে, তাহা দুই রকমের হইতে পারে—(১) অক্ষরের স্বরধ্বনির প্রসারণ-মূলক অথবা (২) ছড়ার মত, স্বরবিস্ফোরণ-মূলক। প্রথমোক্ত ভঙ্গিতে পড়িলে, মাত্রার গুরু-লঘু ভেদের মর্য্যাদা বজায় থাকে, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা স্বাভাবিক শোনায় না; শেষোক্ত ভঙ্গিতে পড়িলে, হসন্তের পুরা দাম আদায় করা যায় বটে, এবং উচ্চারণেও কৃত্রিমতা থাকে না, কিন্তু তাহাতে এইরূপ নিয়মিত ও ঘন ঘন ঝোঁক দেওয়ার ফলে, ছন্দধ্বনি যন্ত্রবৎ শুনিতে হয়; তাহার জন্য কবিতা ক্ষুন্ন হয়। এই জন্যই আমি সত্যেন্দ্রনাথের এই নূতন ছন্দ-পদ্ধতির কলাকৌশল স্বীকার করিলেও, তাহার পূর্ণ সার্থকতা স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করি। এই ছন্দে, পর্ব্বভূমকেরই এক, এক পংক্তি বেশ লীলায়িত হইতে পারে—মাঝে মাঝে এমন পংক্তি—

উড়ে চলে গেছে বুলবুল,

শূন্যময় স্বর্ণ-পিঞ্জর।

অথবা, যেমন এই কবিতায়—

একাকী আছিনু মুহ্যমান

*   *

আহা! ওরে বাছা! মোর দুলাল

—বেশ খাপ খায় বটে, কিন্তু ওই নিয়মেই ছোট ছোট পর্ব্বগুলির পুনরাবৃত্তি অতিশয় কৃত্রিম হইয়া উঠে। তা ছাড়া, সংস্কৃত ছন্দের মত পদভাগ বা পর্ব্ব-বিন্যাস আমাদের বাক্ প্রকৃতির অনুগত নয়।

ছড়ার ছন্দের সেই হসন্তকে একটা বিশিষ্ট ওজন দিয়া, এবং এইরূপ হসন্তযুক্ত অক্ষরের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দেই সংস্কৃত ছন্দের ঠাট যেটুকু আমদানি করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমি তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

বাংলা ছন্দের একটা মোটামুটি পরিচয় দিলাম। এই পরিচয় মুখ্যত বাংলা কবিতা-পাঠের জন্য—ছন্দের তত্ত্বব্যাখ্যা আমার উদ্দেশ্য নয়। তথাপি, আমাকে মাঝে মাঝে যে ধরনের তত্ত্ব-বিচার করিতে হইয়াছে, তাহা আসলে বাংলা ছন্দের রূপভেদ বুঝাইবার জন্য, এবং তাহাতে, কবিতা-পাঠের যে ভঙ্গি বা ছন্দ-অনুসরণ-মূলক উচ্চারণ—তাহাকেই ভিত্তি করিয়া, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় কয়েকটি নিয়ম নিরূপণ করিয়াছি। বাংলা ছন্দের যে তিনটি ঠাট এক্ষণে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে বাংলা কাব্যে তাহার বীজ মাত্র ছিল, অর্থাৎ তাহাদের কোনরূপ পৃথক হিসাব ছিল না; সকল হিসাবই এক হিসাবের—পয়ারের—অধীন ছিল; কবিদের কেবল এই বোধ মাত্র ছিল যে, ছন্দ-রচনায় একটু মাত্রা-জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। এই মাত্রা-জ্ঞানও খুব স্থূল রকমের ছিল—কারণ, কান ছাড়া আর কোন প্রমাণ না থাকায়, এবং সুর করিয়া পাঠ করার জন্য, কানকে আবশ্যকমত 'সুর ঠারিয়া', অর্থাৎ মাত্রা-পরিমাণের ফাঁকগুলি পড়িবার সময়ে সুরে সারিয়া লইয়া, কবিতার ছন্দ বজায় রাখা হইত। অধুনাতন কাব্যে পয়ারের যে রূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সুরের অবকাশ নাই; তাহার উপর, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আধাররূপে, যতি ও স্বরবৃদ্ধির (accent) নূতনতর বিন্যাস-বিধির ফলে, একটা সম্পূর্ণ নূতন ছন্দধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে—সাধারণ পয়ার বা

পদভূমক ছন্দ উৎকৃষ্ট কাব্যচ্ছন্দে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই সাধুভাষার মাত্রিক ছন্দকেই একটা নূতন ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন—যুক্তাক্ষরঘটিত ডবল মাত্রাকে গণনীয় করিয়া তিনিই পর্ব্বভূমক ছন্দের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাংলা কাব্যে এই ছন্দের প্রাচীন প্রয়োগ বা ইতিহাস আমি এখানে বিবৃত করিব না; কেবল, বৈষ্ণব-পদাবলীর ব্রজবুলির উচ্চারণে, আবশ্যকমত স্বরমাত্রা দীর্ঘ করিয়া, যে ছন্দের একটি ঠাট দেখা দিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিব, যথা—

রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন—

কিংবা—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু,
পেখনু পিয়ামুখ চন্দা।

ইহাদের প্রথমটিকে খাঁটি বাংলা দ্বৈমাত্রিক পর্ব্বভূমকের চার মাত্রার হিসাবে ধরা যায়—হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ না করিলেও চলে, যথা—

বজনী শা ॰ ঙন ঘন | ঘন দেয়া ॰ গরজন

কিন্তু দ্বিতীয়টির মাত্রাগুলি সমান নয়—হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে, যথা—

আজু র * জনী হাম | ভাগে পো * হাইনু

পেখনু * পিয়ামুখ *চন্দা

এখানে স্থানবিশেষের মাত্রাকে দুই মাত্রা ধরিলে প্রত্যেক পর্ব্ব চার মাত্রার, শেষে একটি তিন মাত্রার খণ্ডপর্ব্ব আছে। খাঁটি বাংলা ছন্দে ঐ হ্রস্ব-দীর্ঘের স্থানে কেবল যুক্তাক্ষরের সাহায্য লইলেই, মাত্রার একটা গুণ-ভেদ করিয়া ছন্দ-রচনা করা যায়; এইরূপ ছন্দ-রচনাব ঝোঁক প্রাচীন কবিতার বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু এই রীতিকে সজ্ঞানে বিধিবদ্ধভাবে অবলম্বন করা হয় নাই—সর্ব্বত্র, ঐ সঙ্গে হ্রস্ব-দীর্ঘেব প্রতি একটা অবুঝ আসক্তিই সেই কৌশল ব্যর্থ করিয়াছে। ববীন্দ্রনাথ ইহাকেই উদ্ধার করিয়া এই নূতন ছন্দটি বাঙালী কবিকে দান করিয়াছেন।

ছড়ার ছন্দের পরিচয়ও কিঞ্চিৎ দিয়াছি, ইহার মূলে আছে হসন্তের প্রতাপ। কথ্য ভাষায় উচ্চারণ-ভঙ্গিতে যে ছন্দ সম্ভব, তাহাতেই ছড়ার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে—সেই উচ্চারণে মাত্রার পরিমাণ অগ্রাহ্য করা চলে। এই হসন্ত বর্ণগুলিকে প্রয়োজনমত মাত্রার মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া, অথবা স্বর-মাত্রাকে একটু টানিয়া

হসন্তের দ্বারা মাত্রাপূরণ করা সম্ভব বলিয়া—স্বরধ্বনি, ও হসন্তধ্বনি এই দুইয়ের একটা খিচুড়ি পয়ার বা পদভূমক ছন্দে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। একটা সামান্য উদাহরণ দিতেছি—

পরের সোনা | না দিও কানে।
প্রাণ যাবে তোর | হেঁচকা টানে।

—ইহাতে দুইটি করিয়া পদভাগ আছে; কিন্তু দ্বিতীয় চরণে এই ছন্দের রূপ যেমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, প্রথমটিতে তাহা হয় নাই। ইহার প্রতি চরণ ১১ অক্ষরের, পদভাগ যথাক্রমে ৬+৫। পাঁচের চেহারাটি প্রথম চরণে, ও ছয়ের চেহারা দ্বিতীয় চরণে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ, প্রথম চরণের ছয় মাত্রার পদে, ও দ্বিতীয় চরণের পাঁচ মাত্রার পদে ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই—চলতি ভাষার হসন্তের দোলা দিয়া কানকে তুষ্ট করা হইয়াছে। যদি প্রত্যেক পদকে চারিটি অক্ষরের (syllable) পর্ব্ব ধরিয়া ছন্দ ঠিক করা হয়, তাহা হইলেও বাধা আছে—প্রধান বাধা ইহাতে ছড়ার ছন্দের মত সেই উচ্চারণের ধাক্কা নাই; বরং প্রত্যেক পদকে চার মাত্রার ধরিয়া হসন্তগুলাকে কোন রকমে সেই মাত্রাগুলির মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া যায়। বরাবর উচ্চারণের এই দোটানার জন্য, বাঙালী কবির পক্ষে ছন্দের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই; তাহার একটা বড় কারণও এই যে, সেই সকল কবিদের কাব্যসংস্কারে গ্রাম্যতা-দোষ ঘুচে নাই; অনেক পরে ভারতচন্দ্রে আসিয়া বাংলা কবিতা, ভাষায় ও ছন্দে, নাগরিকসুলভ রুচির পরিচয় দিয়াছিল।

কিন্তু বাংলা ছন্দের এই সকল অনিয়ম ও অপরিচ্ছন্নতাকেই তাহার মূল প্রকৃতির লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, যাঁহারা ওই দুই ধ্বনি-প্রকৃতির দুই ভাষা, ও ছন্দের তিন ঠাটকেই এক গাড়ে ঠেলিয়া দিয়া, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইতে চান, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিলেও বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। ইঁহাদেরই একজন 'Bar and Beat' নামক একটি 'থিয়রি'র সাহায্যে সর্ব্বসমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে এই 'Bar and Beat'-এর যে ব্যাখ্যা দেখিয়াছি তাহা অতিশয় মনোরম হইলেও, তিনি বাংলা ছন্দের যে বিভিন্ন ঠাট-নির্দ্দেশ ও তাহার বহুল বিশ্লেষণ যে ভঙ্গিতে করিয়াছেন, এবং সেই

সকল ঠাটের যে পারিভাষিক নামকরণও করিয়াছেন—তাহাতে 'Bar and Beat'-এর দোহাই যে কেমন করিয়া দেওয়া চলে, সে যুক্তি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। আমি প্রথমেই, ইংরেজী ছন্দশাস্ত্র অনুসারে (কারণ এই 'থিয়রি'টি আদৌ নূতন বা মৌলিক নয়) এই 'Bar and Beat'-এর একটা সহজ অর্থ দিতেছি। যেখানে পদ্যের পদ-পদ্ধতিতে কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রার পদ-বিভাগ (foot) নাই, এবং মাত্রার পরিবর্ত্তে অক্ষরের (syllable) স্বরবৃদ্ধি (accent)-ই গণনীয়, সেখানে এক বা একাধিক accent তদাশ্রিত ধ্বনিপর্ব্বকে (sound group) যে ভাবে পৃথক করিয়া লয়, সেই পৃথক অংশগুলি এক একটি foot-এর কাজ করিয়া থাকে; এইরূপ foot-কে Bar বলে, এবং ঐ accent বা স্বরবৃদ্ধিই তাহার Beat। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে—Irregular, অর্থাৎ অনিয়মিত ছন্দেই এই 'Bar and Beat' থিয়রি প্রযোজ্য। বাংলা ছন্দের যে প্রকৃতি, এবং তাহার ঠাটগুলির যে ব্যাখ্যা ও পরিচয় আমি এ পর্য্যন্ত করিয়াছি, তাহাতে, এই 'সর্ব্বংখল্বিদং ছন্দে'র মত ছন্দ-তত্ত্বের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বাংলা ভাষার আদিম বা মূল প্রকৃতি যেমনই হউক, তাহার ধ্বনিরূপের ভেদসত্ত্বেও, সর্ব্বত্র ছন্দের একটা রীতিমত হিসাব সম্ভব। এক হিসাব আর এক হিসাবের সঙ্গে মেলে না বলিয়া, এবং যেমন করিয়া হউক মিলাইতেই হইবে বলিয়া, আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা কবিতায় যত কুশ্রী ও ছন্দোদোষদুষ্ট পংক্তি আছে সেই সকলকে উদ্ধৃত এবং প্রামাণ্য করিয়া, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ ও ধ্বনি-বিজ্ঞান-রসিকদিগের প্রাণ তৃপ্ত করিবার জন্য, বাংলা ছন্দের মূলসূত্ররূপে এই 'Bar and Beat'-তত্ত্বকে 'দণ্ড ও আঘাতে'র মত আস্ফালন করিবার কোন হেতু নাই। আমরা দেখিয়াছি, পয়ার বা পদভূমক ছন্দের পদপদ্ধতিতে মাত্রা-গণনার উপায় আছে; পর্ব্বভূমক ছন্দে এই মাত্রার গণনা আরও হিসাবসম্মত; এবং ছড়ার ছন্দে, চোখ বুজিয়া—কেবল যেন আঙুলের সাহায্যে—পর্ব্বগুলির আয়তন নির্ণয় করা যায়। বাংলা ভাষায় ছন্দের দুই জাতি কেন হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি অনুসারে ছন্দের প্রকৃতিভেদ অবশ্যম্ভাবী। সাধু-ভাষার ছন্দেরও যে দুইটি ঠাট দাঁড়াইয়াছে (পদভূমক ও পর্ব্বভূমক), তাহারও মূলে এক তত্ত্বই আছে। অতএব সবগুলিকে জোর করিয়া এক ছন্দ পদ্ধতির অধীন করিবার জন্য, একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তাহারই সমাধানের বাহাদুরি

—বাহাদুরি মাত্র ; তাহাতে বাংলা ছন্দতত্ত্বের কোন উপকার হইবে না। Beat, বা প্রবল ঠেস—কথ্য বাংলায় সম্ভব হইলেও, আমরা দেখিয়াছি, ওই ঠেস সর্ব্বত্র আদিতে পড়িয়া থাকে, এবং তাহারই টানে পর্ব্ব বা পদের যে বিশ্লেষ ঘটে, তাহাও স্বাভাবিক ; কিন্তু তাহার উপরে ছন্দ নির্ভর করে না, ইহাও সত্য ; কেবল ঝোঁকের সংখ্যা বাড়ে বা কমে। বাংলা ছন্দে 'Bar and Beat'-এর আভাস যেখানে যেটুকু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়, তাহারও দৃষ্টান্ত দিতেছি, যথা—

(১) কালি কালো মিশি কালো | অমাবস্যার নিশি কালো—

গদাধরের পিসি কালো,

কিন্তু, জানো না | কি কালো | সেই কালো রঙ ! (দ্বিজেন্দ্রলাল)

কিংবা

(২) যদি জানতে চান | আমি ঠিক কি রকম | স্ত্রী চাই—

ফর্সা | কি কালো | কি ঝাঝারি রঙ,

লম্বা | কি বেঁটে | কি ক্ষীণা | পীনা

দেখতে ঠিক পরী | কি দেখতে ঠিক সং (ঐ)

—প্রথমটিতে Hypermetric বাদ দিয়া একটা পর্ব্ব-পরিমাণের হিসাব হয়তো পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টিতে তাহাও সম্ভব নয় ; অতএব এই দ্বিতীয়টিতেই, বাংলা ছন্দের 'Bar and Beat'-লক্ষণ আছে। কিন্তু এই ছন্দ কি বাংলা কাব্যের ছন্দ হইতে পারিয়াছে ? Hypermetric বাদ দিয়া, এবং যুক্ত বা হসন্ত বর্ণের হিসাব কোন রকমে মিটাইয়া, ইহাকেও, কোন একটা রীতিমত ছন্দে দাঁড় করাইতে পারিলেও—ইহা সাধারণ বাংলা কাব্যচ্ছন্দ নয়, একরূপ গদ্যচ্ছন্দ বলিলেও চলে। এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার পূর্ব্বে বলিয়াছি, অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ আমার নাই ; আমি কেবল এই অভিনব আবিষ্কারের একটু পরিচয় দিলাম মাত্র। এইবার আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা বলিব।

দ্বিতীয় ভাগ

বাংলা পয়ার ও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর

প্রথম অধ্যায়

মধুসূদন ও বাংলাকাব্যের তথা ছন্দের নবরূপ, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা ছন্দ; বাংলা ছন্দের আদি ও মধ্যরূপ।

মধুসূদন বাংলা কাব্যে যে নবরূপ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবিপ্রতিভাই তাহার একমাত্র নিদর্শন নয়; তিনি যে নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এক হিসাবে সেই ছন্দই বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতিকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা-কাব্যের একটা দিক বা দেশ অধিকার করিয়া যে ভাবে তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, তাহার ফল আধুনিক মিলহীন পয়ার-ছন্দের কবিতায় এখনও লক্ষ্য করা যাইবে; মধুসূদন সেই আদি বাংলা কাব্য-ছন্দকে নূতনতর সঙ্গীত-গৌরবে উন্নীত করিয়া চিরকালের রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছেন। এই ছন্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ইহার তাল, লয় ও ধ্বনিতরঙ্গের রহস্য-সন্ধান, এ পর্য্যন্ত কেহ বিশেষভাবে করেন নাই। ইদানীন্তন কালে বাংলা কাব্যে গীতিচ্ছন্দের একাধিপত্য হওয়ায়, এ ছন্দের মহাকাব্যোচিত সেই স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষ বাঙালীর কানে অনভ্যস্ত ও অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং যাঁহারা ইতিমধ্যে বাংলা ছন্দোবিজ্ঞান রচনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারাও এ ছন্দের মহিমা কর্ণগোচর করিতে পারেন নাই—তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাই, এই ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলিব, কারণ সে ছন্দের মূল প্রকৃতির একটু পরিচয় না দিলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাখ্যাও সুসম্পন্ন হইবে না।

আধুনিক বাংলা কাব্য যেমন আর সকল বিষয়ে প্রাচীন কাব্যের আদর্শ হইতে ভিন্নমুখী হইয়াছিল, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে কাব্যচ্ছন্দের যে নূতন দ্বার খুলিয়া গেল, তাহাও যেমন বৃহৎ তেমনই ভিন্নমুখী—অমিত্রাক্ষর প্রাচীন বাংলা ছন্দের পূর্ণতম রূপান্তর। ইহা মিলহীন, এবং দুই একটি বিষয়ে সাদৃশ্যহীন সেই প্রাচীন পয়ার নহে; এই ছন্দ বাংলা ভাষার পক্ষে এতই নূতন, ইহার রূপ এতই স্বতন্ত্র যে, তাহার আভাসও প্রাচীন কবিদের স্বপ্নগোচর ছিল না। অতএব এ ছন্দের পরিচয়

দিবার জন্য পয়ার ছন্দের আদিরূপ ও তাহার বিবর্ত্তনের ইতিহাস প্রভৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাই যথেষ্ট নহে। প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যের মধ্যে ভাষা ও ছন্দগত যোগসূত্র যেমনই থাকুক, এ কাব্যের মূল প্রবৃত্তিই যেমন ভিন্নমুখী, তেমনই মধুসূদনের ছন্দও এমন আধুনিক যে, এক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক ছন্দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মের একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই ছন্দ-পরিচয় সমাপ্ত হয় না। আমি বলিয়াছি—এই ছন্দ সর্ব্বাংশে আধুনিক, সেই আধুনিকত্বই ইহার সর্ব্বাধিক গৌরব। এই ছন্দের মূলীভূত যে সম্পূর্ণ নূতন এক rhythm কবির কানে ধরা দিয়াছিল—তাহা যে নূতন গদ্যভাষার ইঙ্গিতে ঘটিয়াছিল, এমন অনুমান মিথ্যা নহে। অতএব এ ছন্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সেই নূতন বাচন-ভঙ্গির দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেকার কাব্য-ভাষা বাংলা কথ্যভাষার মত এমন স্বরোদ্ঘাতিনী ছিল না; ভাবচিন্তার নূতন প্রকাশরীতির জন্য, বাংলা গদ্যের সুরবর্জ্জিত বচনবিন্যাসে—সাধুভাষার অঙ্গেই—কেবলমাত্র উচ্চারণ-ঘটিত এক ধ্বনি-সৌষম্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ছন্দস্পন্দের মূল কারণ যে স্বরোদ্ঘাত, তাহা পূর্ব্বতন যুগের সুপরিণত ভাষাতেও কাব্যচ্ছন্দের সহায় হইতে পারে নাই—সকল পদ্যই সুরসহকারে পাঠ করা হইত বলিয়া ভাষার উচ্চারণগত এই প্রকৃতিও প্রায় ঢাকা পড়িয়া যাইত; সেই ছন্দই ছিল ভিন্ন উপাদানের—ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্য আধুনিক বাংলা ছন্দকে—বিশেষত এই অমিত্রাক্ষর বা তজ্জাতীয় কোন পয়ার-ছন্দকে খাঁটি বৈজ্ঞানিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক মনোবৃত্তির বলে, সেই প্রাচীন ছন্দের সমগোত্রীয় করিয়া, বাংলা ছন্দের একটা মূল সূত্র আবিষ্কার বা প্রণয়ন করা সম্ভব হইলেও, তাহাতে সর্ব্বকালের পুণ্ডরীকসম্প্রদায় চরিতার্থ হইতে পারেন, কিন্তু কাব্যরসপ্রাণ শেখরগণের তাহাতে কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হইবে না; বরং, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-বৎ সেই ছন্দ-ব্রহ্মবাদের ধ্বনিবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যার দাপটে, তাঁহারা সর্ব্বছন্দ-রসপিপাসা বর্জ্জন করিয়া বিবাগী হইয়া যাইবেন বলিয়াই আশঙ্কা হয়।

পূর্ব্বের আলোচনায় পয়ার-জাতীয় ছন্দকে (যাহার উপরে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পত্তন হইয়াছে)—অর্থাৎ বাংলার বনিয়াদী ছন্দকে 'পদভূমক' বলিয়া নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা করিয়াছি, এক্ষণে এই পদভূমক পয়ারকেই পুনরায় আর এক দিক দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, মধুসূদনের ছন্দ এক হিসাবে যেমন

ঐ জাতেরই পয়ার-ছন্দ, তেমনই আর এক দিকে তাহা 'পয়ার' হইতে অতিশয় বিলক্ষণ। এই পয়ার কেমন করিয়া অমিত্রাক্ষরের উপযোগী হইল—ইহার জাতি-কুলশীলের মধ্যে এমন কি নিহিত ছিল যাহার জন্য মধুসূদন ইহাকে এমন কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। এই পয়ারের আদি রূপ বাংলা পদ্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—ইহার 'পদ-চার' বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক পদ-চারণ। অতএব মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই পয়ারকে আশ্রয় করায় খাঁটি বাংলা ছন্দেরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পয়ারকে বাছিয়া লইতে মধুসূদনের কোনরূপ চিন্তা করিতে হয় নাই, ইহা তাঁহার হাতের কাছেই ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, বাংলা যত বড় কাব্য সকলই এই পয়ার ছন্দে রচিত; প্রাচীন কবিগণ যখনই কোনও ঢালাও বর্ণনা কাহিনী বা পালা-গান রচনা করিতে বসিয়াছেন, তখনই পয়ারের ডাক পড়িয়াছে; আবার যখনই একটু বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে, বা একটু লিরিক ভাবের আমদানি করিতে চাহিয়াছেন, তখনই অন্য ছন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আর একটি বড় ইঙ্গিতও তিনি পাইয়াছিলেন, এই পয়ার ছন্দেই সহজ বাচন-ভঙ্গির অবকাশ আছে, বাংলা বাক্যরীতি এই পয়ারের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথাপি মধুসূদনকে আরও ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইয়াছিল; এ দৃষ্টিও তিনি কানের সাহায্যে লাভ করিয়াছিলেন,—পয়ারের অন্তর্নিহিত ছন্দশক্তিকে তিনি যেন এক আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; বাংলা অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদান-গুলিকে, তিনি সেই দৃষ্টির দ্বারা, ঐ পয়ারের মধ্যেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; নতুবা, ইংরেজী অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখকের এই উক্তি বাংলার সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইত না;—

"And so was the music of the blank verse, or unrhymed five-stress lines of Marlowe and Shakespeare and Milton; and as we listened, it was easy to believe that 'stress' and 'quantity' and 'syllable' all playing together like a chime of bells are concordant and not quarrelsome in the Modern English Verse."

বাংলা পয়ারের ঐতিহাসিক বিকাশধারা একটু লক্ষ্য করিলে, তাহার জাতি-কুলশীলের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তাহাতে দেখা যাইবে, ভাষার সেই আদি রূপ হইতেই তাহার যে ছন্দ-প্রবৃত্তি— শেষে যতই তাহার রূপান্তর হউক, ভাষার প্রকৃতি যতই স্বতন্ত্র হইয়া উঠুক—তাহার অঙ্গ হইতে তাহা সম্পূর্ণ ঘোচে নাই; এজন্য—মাত্রা (Quantity), অক্ষর বা বর্ণ (Syllable), এবং শব্দের উচ্চারণ-ঘটিত যে স্বর-বৈষম্য (Stress), এই সকলকেই মিলাইয়া লইয়া, তাহাকে তাহার স্ব-প্রকৃতি ও কুলধর্মের সমন্বয় করিতে হইয়াছে।

অতঃপর আমি বাংলা পয়ারের সেই ইতিহাসগত প্রবৃত্তির একটু পরিচয় দিব, তাহাতে দেখা যাইবে, বাংলা ভাষাও যেমন ক্রমে একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, তেমনই তাহার ছন্দও উত্তরোত্তর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে। সে আর্টের ক্ষেত্রেও কোন শাস্ত্রশাসন মানিবে না; প্রাচীন ছন্দবিধির বাঁধা রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সে মাঠে-বাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে; বীণা ফেলিয়া বাঁশের বাঁশীকে আশ্রয় করিবে। ফলে, প্রায় একই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, সে তাহার জ্ঞাতি-ভগিনী হিন্দী হইতে এই ছন্দ-পথে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে!

ভারতচন্দ্রের পয়ারকেই যদি পুরানো রীতির শেষ পরিণতি বলিয়া ধরা যায়, এবং তাহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ এইরূপ হয়—

লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ।
শুন ওগো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও।
মেনকা নারদবাক্যে শুনা মনোদুখে।
পলাইয়া গোবিন্দের পড়িল সম্মুখে।
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়।

তাহা হইলে কে বলিবে যে, এই ছন্দের আদি রূপের সন্ধান মিলিবে নিম্নের দুই পংক্তিতে?—

কাআ * তরুবর | পঞ্চ বি * ডাল।
চঞ্চল * চীএ | পইঠো * কাল। (চর্য্যাপদ)

দেখা যাইতেছে যে, ভঙ্গ-প্রাকৃত অবস্থায় এই আদি বাংলা ভাষার ছন্দে, বংশানুক্রমিক স্বভাব ধর্ম্মে, সংস্কৃত লঘুগুরু মাত্রার নিয়ম প্রায় সম্পূর্ণ বজায় আছে, এবং সে কারণে ছন্দস্পন্দ বা Rhythm-সৃষ্টিও অতি সহজ হইয়াছে। তথাপি, এখন হইতেই

ভাষার উচ্চারণপদ্ধতি ও ছন্দপদ্ধতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে—শব্দকে ছন্দোবদ্ধ করিবার সময়ে অনেক স্থলেই স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ যথানিয়মে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ঐ একই কবিতার আর একটি পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, সেই আদিকালেই এ ভাষার ছন্দে মাত্রাবৃত্তের নিয়মনিষ্ঠা কিরূপ দুরূহ হইয়াছিল—

ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা

—এ চবণেরও মাত্রাসংখ্যা ১৬, এবং পদভাগও সমান, কিন্তু ইহাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা কষ্টকর, চার মাত্রাব পদচ্ছেদ বজায় রাখিলে পংক্তিটির ছন্দচিত্র এইরূপ দাঁড়ায়—

ভণই। লুই আম্‌হে। সানে। দিঠা

তাহাতে দ্বিতীয় পর্ব্বটির মাত্রা বেশি হইয়া পড়ে—ঐ 'লুই'কে বাদ না দিলে ছন্দ বক্ষা হয় না। অতএব পডিবার সময়ে, নিশ্চয়ই হ্রস্ব-দীর্ঘের নিয়ম রীতিমত ভঙ্গ কবিয়া ভাষার কথ্য-ভঙ্গির হসন্ত, এবং তজ্জনি ঝোঁক প্রভৃতিব সাহায্যে এই গহ্বরটি উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

উপরি-উদ্ধৃত বৌদ্ধ চর্য্যাপদটিই বাংলা ছন্দের আদ্যতম নমুনা কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবাব উপায় না থাকিলেও—ছন্দের প্রকৃতি হইতেই, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিকে ইহার পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে বাঙালী কবির কান যে তাহার ভাষার ধ্বনিচ্ছন্দে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেজন্য রীতিমত মাত্রাবৃত্তে পদ্যরচনা করিতে বসিয়াও তাহার নিজের ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ-প্রবৃত্তি যে তাহাকে বার বার নিয়মভ্রষ্ট করে, তাহার প্রমাণ ইহাতে আছে।—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশঘাণ্ট করহু বিআলী।

পদটি আবম্ভ হইয়াছে এইরূপ বৃত্তগন্ধী মাত্রা-ছন্দে, ইহাতে 'গণ'ভাগের আমেজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাব পরেই—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।

—পড়িলে সন্দেহ থাকে না, কবির রসাবস্থা যেমন একটু ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে —ভাবের ঘোরে কবি যেই একটু বেসামাল হইয়াছেন, অমনই ছন্দে ও ভাষায়

তাঁহার জাতি-কুল ধরা পড়িয়াছে; এ যেন সেই "শভা-অন্ধা"র অবস্থা। এই দ্বিতীয় শ্লোকটির ছন্দ প্রায় সমচতুর্মাত্রিক; আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করিলে, ভাষা বা ছন্দের অল্পই পরিবর্তন হয়, যথা—

জোইনি | তঁই বিমু | খনহি ন | জীবমি।

এবং—

তোমা বিনা | যোগিনী | ক্ষণেক না | বাঁচিব।

জয়দেবের—

চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং

ঠিক এই চাব মাত্রার চাল—কেবল অক্ষরগুলি সমমাত্রার নয়। শেষের পর্ব্বটিকে খণ্ডপর্ব্ব ধরিলে, ভারতচন্দ্রের—

কি বলিলি | মালিনী | ফিরে বল্ | বল্

—যে ছন্দ, ঐ প্রাচীন পংক্তিটির ছন্দ তাহাব ঠিক এক ধাপ পূর্ব্ববর্ত্তী। যথা,—জোইনি | তঁই বিমু = তোমা বিনা | যোগিনী = কি বলিলি | মালিনী।

এই যে পর্ব্বগুলি, শুধু চার মাত্রা নয়—চারিটি অক্ষরে, সমান মাত্রায়, বিস্তারিত হইতেছে, ইহার কারণ অবশ্য মাত্রার হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদেব লোপ, অতএব, ছন্দের উপরে ভাষার নিজস্ব ধ্বনি-প্রকৃতির প্রভাব যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বরের দীর্ঘত্ব ঘুচিলেও প্রত্যেক বর্ণ স্বরান্ত, এজন্য এ ছন্দে মাত্রাধ্বনি অতিশয় স্পষ্ট, এবং ইহার লয় মন্থর নয়, দ্রুত। কিন্তু, আর একটি যে চর্য্যাপদের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে খাঁটি বাংলা পয়ারের ছাঁদটি যেন স্পষ্ট উঁকি দিতেছে—এজন্য এ পদটি যে কালহিসাবে বেশ একটু পরবর্ত্তী, তাহা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যায়।—

নগর বাহিরিরেঁ ডোম্বি | তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসো | বাহ্ম নাড়িয়া।

একটু সামান্য ঘষিয়া লইলেই ইহার চেহারা দাঁড়ায় এইরূপ—

নগর বাহিরে ডোম্বি (ডোম্‌নী)। তোমার কুঁড়িয়া।
ছুঁয়ে ছুয়ে যাও যে গো | ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।

দেখা যাইতেছে, এই পংক্তি দুইটিকে খাঁটি পয়ারের ছাঁদে যেমন সহজেই ফেলা যায়, তেমনই একটু সুর করিয়া পড়িলে, যেখানে যেমন আবশ্যক অক্ষরের মাত্রা হরণ

বা পূরণ করিয়া লওয়া যায়। অতএব খাঁটি বাংলা পয়ারের পূর্ব্বাভাস এইরূপ পংক্তিতে এখনই দেখা দিয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, খাঁটি মাত্রাবৃত্তের চারি মাত্রার পর্ব্বপ্রবাহে যে দ্রুততর গতি থাকে (যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে), এখানে তাহা নাই, তাহার কারণ, এখানে মাঝের যতিটি আরও স্পষ্ট—পয়ারের ৮।৬ পদভাগের মধ্যস্থিত যতির মত; অর্থাৎ ছন্দ ক্রমে পর্ব্বভূমক হইতে পদভূমকে পরিণত হইতেছে।

ইহার পর প্রাচীন পয়ারের আর কয়েকটি উদাহরণ দিব, প্রথমটি 'শূন্যপুরাণ' এবং পরের গুলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে।

'শূন্যপুরাণ'—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল্ল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥

—ইহার প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির সহিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে, ছন্দ এখনও টলিতেছে, আট ও ছয়ের পদভাগ এখনও স্থির হয় নাই, অথচ, ৮।৬-এর পদভাগ অস্পষ্টও নয়। পয়ারের ক্রমপরিণতির একটা বড় চিহ্ন—মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্তের মধ্যে দোল খাইয়া শেষে বর্ণবৃত্তে আসিয়া স্থিতিলাভ করা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এই ষোলমাত্রা যখন চৌদ্দটি সমান মাত্রার অক্ষরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনই বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হইয়াছে। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহার কিছু সংশোধন আবশ্যক। পয়ারের চরণ-শেষে স্বরের টান থাকিলেও তাহা মাত্রালোপের জন্য নয়। যখন এই চরণ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তখন ৮+৮ পদভাগই ছিল; এবং চরণের মাত্রাসংখ্যা কম হইলে অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া তাহা পূরণ করা যাইত; তাহাতে স্বরের টানের সঙ্গে মাত্রার টানও ছিল। পরে যখন ছন্দ মাত্রাবৃত্তের পরিবর্ত্তে একরূপ বর্ণবৃত্তে পরিণত হইল, তখনও স্বর অবশ্য রহিয়া গেল, কিন্তু তখনকার শেষের পদটি সমান মাত্রার ছয়টি অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়; পয়ারের চরণে ঐ চৌদ্দটি বর্ণের অতিরিক্ত আর কিছু নাই। যতদিন তাহাকে ষোল মাত্রা পূরণ করিতে হইয়াছে, ততদিন তাহার জাতিই ছিল ভিন্ন; ততদিন সে খাঁটি বাংলা পয়াররূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ৮+৮ শেষে

৮+৬ হইয়াছে—পয়ারে জন্মের ইতিহাস তাহাই বটে; কিন্তু ঐ ছয় যে আট নয়, ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার জন্যই সে পরে অনেক কাজ করিতে পারিয়াছে।

এই লক্ষণের দিক দিয়াই 'শূন্যপুরাণে'র ওই পংক্তিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। এখানেও সেই আদিম ষোল মাত্রার ঝোঁক বিদ্যমান—প্রথম ও তৃতীয় চরণে চার মাত্রায় চারিটি পর্ব্বভাগ সহজেই হইতে পারে—স্বরমাত্রা দীর্ঘ করিয়া, অথবা এখনও সুরের সাহায্যে, মাত্রাসংখ্যা পূরণ করিয়া লওয়া চলে। তথাপি দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে এরূপ পর্ব্বভাগ করিয়া ১৬ মাত্রা পূবণ করিতে একটু বেগ পাইতে হয়—একটু বেশি টানিতে হয়; কিন্তু, পয়ারের চৌদ্দ, ও ৮+৬ ধরিলে, ছন্দটি অতিশয় সহজ হইয়া উঠে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ভাষার প্রকৃতিবশে সেই প্রাচীন ছন্দেব ১৬ মাত্রার চরণ ক্রমে কি আকার ধারণ করিতেছে, এবং কেনই বা তাহা করিতেছে।

ইহার পর, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' পয়ার যেরূপে দেখা দিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এতদিনে ছন্দটি বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, না হইবে কেন? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ই যে বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতাব জন্ম হইয়াছে। ইহার ভাষাও যেমন সুপরিস্ফুট ভাব-অর্থের ভাষা, ছন্দও তেমনই সেই ভাষারই অনুবর্ত্তী। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কবি শুধুই বাংলার আদি কবি নয়, বড় কবি। তাই তাঁহার হাতে পড়িয়া ভাষা ও ছন্দ দুই-ই আপন রূপটি পাইয়াছে। রূপরসবিহ্বলতার সহিত যে ধ্যান-গভীর ভাবুকতা বাঙালীর কাব্যসাধনা ও ধর্ম্মসাধনাকে এককালে অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বিশিষ্ট প্রতিভার যুগব্যাপী বিকাশধারার এক প্রান্তে যেমন রবীন্দ্রনাথ, তেমনই তাহার অপর প্রান্তে চণ্ডীদাস। অতএব, এই প্রান্ত হইতেই বাংলা কবিতার সঙ্গে বাংলা ছন্দও যাত্রা সুরু করিয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র পয়ারে যে লক্ষণ দুইটি নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই,—প্রথম, অক্ষরের উচ্চারণে দীর্ঘ-স্বরের প্রয়োজন আর নাই বলিলেই হয়; যেখানে যেরূপ আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানে বস্তুতঃ তাহা দীর্ঘস্বর নয়—গানের সুরের অবকাশ মাত্র। দ্বিতীয়, পদভাগের মধ্যে নানা আয়তনের শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে, ভাষারই প্রয়োজন অনুসারে, চার ছাড়াও, দুই ও তিন মাত্রার পদচ্ছেদ আরও

স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—অর্থাৎ ছন্দের উপরে ভাষার প্রভাব দেখা যাইতেছে; ইহারও কারণ, ভাষা এতদিনে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দের নমুনা এইরূপ—

নিতম্ব জঘন ঘন পীন তন ভার।
দেহে তুলি দিল বিধি যৌবন তাহার॥

দধি দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকায়।
এবে গোয়ালার গেল জীবন উপায়॥

সুন্দর কাহ্নাই তোর শুনিয়া যুকতি।
সদয় হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী॥

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পয়ারে ৬+৮ এবং ৭+৭ পদভাগও দেখা দিয়াছে।

কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র এই ছন্দে পয়ারের ছাঁদটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, ইহার পদগুলি গীতিপ্রধান বলিয়া শেষে এই ধারা ভিন্নমুখী হইয়াছে। কৃত্তিবাস হইতে পয়ার একটু ভিন্ন কাজে ভিন্ন ধারায় চলিতে সুরু করিয়াছে; 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ছন্দের গীতিস্বর, তাহার কাব্য-মন্ত্রের মতই, বাংলা পদাবলী-সাহিত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু, তথাপি বাংলা পয়ারে এখন হইতে যে একটি নূতনতর সুরের টান যুক্ত হইল, তাহার প্রভাব সে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ইহার পর, কৃত্তিবাস কাশীদাসের যুগে, পয়ারের আর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই যুগে ভাষার উপরে সংস্কৃতের পালিশ আরম্ভ হইয়াছে; তাহার ফলে, ছন্দের দুইটি দোষ দূর হইয়াছে। প্রথম—'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ছন্দে খাঁটি বাংলা শব্দেরও অন্ত্যবর্ণ স্বরান্ত হওয়ায়, ছন্দ যেমন একটু আড়ষ্ট বোধ হয়, ভাষার শ্রীও তেমনই কতকটা নষ্ট হয়; এখন ভাষার সাধু রীতির জন্য (আমি প্রচলিত পাঠের কথাই বলিতেছি) বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণ আর তেমন শ্রুতিকটু নয়; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তবর্ণের বহুলতর ব্যবহারে, এবং অনুপ্রাসের গুণে, ছন্দে ধ্বনিঝঙ্কার বাড়িয়াছে। আজিও এমন সকল পংক্তি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়—

রতন রঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংসগতি যেন, নূপুরের রব॥

করে শঙ্খ-কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটি মাঝে।
রতন নূপুর তার রুনুঝুনু বাজে॥
পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ চাঁপা॥
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ অঙ্গের উপর।
যে অঙ্গে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর॥

ভাষার এই রীতিসংস্কারের ফলে, সুর কিছু সংযত এবং পয়ারের দ্বৈমাত্রিক লয় আরও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ, পদের শব্দগত অক্ষর-সজ্জা যেমনই হউক, ছন্দের গতিভঙ্গিতে দুই মাত্রার পদক্ষেপ রহিয়াছে। এজন্য ছন্দের গতি যেমন মন্থর, তেমনই পদভাগের যতিও দীর্ঘতর হইয়াছে; এই যতির স্থানে থামিয়া, প্রথম পদের অন্তেও সুরের টান দেওয়া চলে। এইজন্য, পদভাগ যেখানে ৭+৭, যেমন—

করে শঙ্খ কঙ্কণ | কিঙ্কিণী কটিমাঝে

—সেখানে যতি স্থানভ্রষ্ট হওয়ায়, এই সুর বাধা পায়, এবং ছন্দে বেশ একটু দোল লাগে।

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর পয়ার। এই কালে ভাষা আর একটা মোড় ফিরিয়াছে—ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' তাহার প্রমাণ; এতদিনে ভাষার স্টাইলের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, রচনাকার্য্যে শিল্পী-মনোবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে। এখন হইতে কেবল শব্দ-চয়নের সাধুরীতিই নয়, আলঙ্কারিকতার দিকেও বিশেষ মনোযোগ লক্ষিত হয়। আরও এক লক্ষণ এই যে, পদমধ্যে শব্দগুলি কেবল ছন্দের ছাঁচে ঢালাই হইতেছে না, পদচ্ছেদগুলি বাঁধা চার মাত্রার দিকে না ঝুঁকিয়া শব্দের আয়তনের উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতেছে। ইহার একটি কারণ, শব্দের অন্ত্যবর্ণ হসন্ত হইলে, তাহার স্বরান্ত উচ্চারণ আর গ্রাহ্য হইতেছে না। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে এই সকল লক্ষণই আছে—

পরম পুরুষ বটে পিতামহ মোর।
হরিপদ-নখ-বিধু-সুধায় চকোর॥

(দ্বিতীয় চরণ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রচনা বলিয়া মনে হয়)

অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির

* *

শোকে জরা জননী সরণি-মুখ চেয়ে

* *

কিন্তু এই অসির অসীম গুণ আছে।
শঙ্কায় সবল শত্রু কাছে নাহি আসে।

এ ভাষাও মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত সাহিত্যিকের ভাষা। "অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির" এই উচ্চাঙ্গের কবি-ভাষা, এবং "শোকে-জরা জননী সরণি-মুখ চেয়ে"—পংক্তিটির ৭।৭ পদভাগ, ও তাহাতে মিলযুক্ত শব্দের অনুপ্রাস—বাংলা কাব্যকলারও একটি বিশেষ স্তর নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয়, কেবল রচনার এই আলঙ্কারিকতাই নয়, সেই সঙ্গে ঘনরামের ভাষায় খাঁটি বাংলা বুলির প্রাচুর্য্য। তাঁহার ভাষায় দুই স্তরের শব্দই সমান মর্য্যাদা ও প্রয়োগ-সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ, ভাষার রসবোধ থাকায়, তাঁহার রচনা স্টাইলহীন নয়। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে ভারতচন্দ্রের রচনারীতির পূর্ব্বাভাস আছে—

সমাপন রন্ধন যখন হইল মা।
বাবা কন গোঁসাই ভোজনে তোল গা।

ভ্রাতার বচনবাণে বিদরিছে বুক।
খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ।

মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা।

এই পংক্তিগুলিতে পয়ারের শেষ পরিণতির আভাসও পাওয়া যায়। ইহাতে নিয়মিত চার মাত্রার পদচ্ছেদ আর নাই, কারণ পদের মধ্যে শব্দগুলি একটু পৃথক আসন দাবি করিতেছে, যথা—

খেতে, শুতে, বসিতে | উঠিতে, নাই সুখ

তেমনই, ছন্দমধ্যে বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ভাষায় বাংলা শব্দগুলি আর কেবল শব্দমাত্র নয়—সেগুলি খাঁটি বাংলা 'বুলি' হিসাবেই বিশেষ অর্থ ও বিশেষ রসের দ্যোতনা করিবার জন্ম কবিকর্ত্তৃক সজ্ঞানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি যে 'হসন্ত'কে ভয় করেন না, তাহার প্রমাণ, তিনি উপায় থাকিতেও 'কন' এর হসন্তবর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। আসল কথা, বাংলা ভাষা এতদিনে সাবালক হইয়া বাঙালী কবির নিকটে সকল বিষয়ে পুরা অধিকার দাবি করিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা পয়ার ও ভারতচন্দ্র

অষ্টাদশ শতকে বাংলা ভাষা যে একটি প্রৌঢ় সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইতে চলিয়াছে, ঘনরামের কাব্যে তাহার যেমন সূচনা, ভারতচন্দ্রের কবিতায় তেমনিই তাহার পূর্ণ-পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্য-শিল্পী, এবং বৃটিশ-পূর্ব্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সহিত তুলনা করিয়া অনেকে তাঁহার কবিশক্তির ন্যূনতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র যে বাংলা ভাষার কে, এবং ভাষা যে কাব্যের পক্ষে কি, এই জ্ঞান যাহাদের নাই তাঁহারাই প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে ভুল করেন। ভারতচন্দ্রের কবিতার প্রধান রস তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, এবং তাহাও বাংলাভাষারই। তিনি বাংলা ভাষা-তরুর, শুধুই ফুল নয়—পাতাগুলি পর্য্যন্ত লইয়া, সেই তরুরই আশ্রিত গুল্মগুলতার ডোর দিয়া সাহিত্যের যে রূপকর্ম্ম করিয়াছেন, সেকালে বাঙালীর পক্ষে তাহা এক অভাবনীয় বস্তু। ভারতচন্দ্র ভাষাকে যেন একখানি শান্তিপুরী শাড়ি পরাইয়া—পায়ের মল কয়গাছির মাপ ঠিক করিয়া, এবং মাথার চুল একটু ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিয়া—তাহার শ্রী যেরূপ বাড়াইয়াছেন, এবং কেবল তাহারই কারণে সেই সুচতুরা স্বল্পভাষিণী যুবতীর চোখে যে কটাক্ষ, এবং অধরে যে হাসির ভঙ্গিমা ফুটিয়াছে—সে যে কত বড় প্রতিভার কাজ, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? ভারতচন্দ্রের ছন্দ এই ভাষারই একটি অন্তরঙ্গ উপাদান; বাংলা ছন্দের গীতিধ্বনিকে তিনি যে কত রূপে লীলায়িত করিয়াছেন, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু পয়ার ও ত্রিপদীকে তিনি যে ছন্দগৌরব দান করিয়াছেন, তাহাতেই বাংলা কাব্য প্রাণ পাইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, তখন বাংলা গদ্যরীতির সৃষ্টি হয় নাই; তখন ছন্দ কেবল কবিতারই অঙ্গ ছিল না; তদ্দ্বারা বাক্যরচনারীতিও নিয়ন্ত্রিত হইত। পয়ারের ঐ স্বল্প আয়তনেই (স্বল্প হইলেও অন্য ছন্দের তুলনায় উহার চরণের গতি কিছু মুক্ত) বাক্য (sentence) গড়িয়া উঠিবার সামান্য অবকাশ মিলিত;

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ছন্দে বাক্য বেশ স্বচ্ছন্দ নয়, এমন কি, অঙ্গহীন হইতেও দেখা যায়—যেন কোন প্রকারে ছন্দের মধ্যে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। ভারতচন্দ্র এই স্বল্প পরিসরকেই যেন সানন্দে স্বীকার করিয়া ভাষার যে মিতাক্ষর-গাঢ়তা বা বাক্‌সংযমের বাক্‌পটুতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে অতি সরল সহজ ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার রচনায় যেমন বাগ্‌বাহুল্য নাই, তেমনি, একটি শব্দও প্রয়োগ-দোষে-দুষ্ট নয়—এ কথা বাংলার আর কোন কবির সম্বন্ধে খাটে না। ভারতচন্দ্রের রচনার এই বাক্‌সংযম ও বাক্‌শুদ্ধির উদাহরণস্বরূপ আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে যে-কোন একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম।—

তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি,
রহে যেন রীতি নীতি—নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি যেয়ো,
সদা একভাবে চেয়ো এই রাধিকায়॥
তুমি হে প্রেমের বশ, তেঁই কৈনু প্রেমরস,
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়॥
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কার কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে—না ভুলায়ো তায়॥

এখানে প্রায় সর্ব্বত্র আটটি মাত্র অক্ষরে এক একটি বাক্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল তিনটি চরণে কবি পুরা চৌদ্দ অক্ষরই লইয়াছেন। বাক্যের এই ক্ষুদ্র আয়তনের প্রতি কবির যে লোভ, সেজন্য তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সন্ধি-সমাসের শরণাপন্ন হন নাই—বাংলা ভাষাকেই যেন চাঁচিয়া ছুলিয়া সর্ব্ববাহুল্যবর্জ্জিত করিয়াছেন; অর্থাৎ এই স্টাইল সম্ভব হইয়াছে খাঁটি বাংলা বুলির অতিশয় সতর্ক নির্ব্বাচন ও নিপুণ যোজনায়। এখানে অতিশয় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমি এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা-শিল্পীর স্টাইল ও কবিশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া পারিলাম না—ছন্দের কথা পরে হইবে।

প্রথমে 'অন্নদামঙ্গলে'র "হরগৌরীর কোন্দল" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম—তাহাতে ভারতচন্দ্রের হাতে বাংলা কাব্যের ভাষা কি রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং পয়ারকে কবি 'গীতি' হইতে 'কথা'র ছন্দে কেমন রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে।

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জলে অগ্নি ললাট-লোচনে।
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল।
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে প'ড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই—বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা-সিন্ধুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছ হাতে অন্নবস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটুকথা কিসের লাগিয়া॥

পড়িবার সময়ে কোন্দলকারিণী শিবগেহিনীর শুধু মুখঝামটাই নয়, মুখভঙ্গিটি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইবার একটি অতিশয় পরিচিত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব, ইহাতে কেবল ভাষা নয়, ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার প্রায় সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা সেই অপূর্ব্ব "অন্নদা-পাটনী-সংবাদ"। দেবী ছদ্মবেশে পারঘাটায় আসিয়া ঈশ্বরী পাটনীকে পার করিয়া দিতে বলিলেন, তখন—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী—
একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?

কথা কয়টিতে পাটনীর মুখের সন্ত্রস্ত ভাব, দেবীর চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছে।

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরফার।

দেবী যখন "বিশেষণে সবিশেষ" পরিচয় দিলেন, তখন—

পাটনী কহিছে মাগো বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।

দেবীর কথা হইতে ওইটুকু মাত্র বুঝিয়া তাহার সন্দেহ দূর হইয়াছে। কুলীনের সংসারে অমন ঘটিয়া থাকে, বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই অসহ্য হইয়াছে। পাটনী দুঃখী মানুষ, খাটিয়া খায়; বড়লোকের দুঃখে দুঃখ করিবার সময় তাহার নাই,

বরং কুলবধূর এই আচরণে সে যেন খুশি হয় নাই, তাই দেবীকে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—

> শীঘ্র আসি নায়ে চড় কিবা দিবা বল।
> দেবী কন্ দিব, আগে পারে লয়ে চল॥

এমন সহজ ভাষার এত স্বল্পাক্ষরে আর কেহ এমন কাহিনী-রস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? 'কিবা দিবা বল'—ভাষার এই অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চরিত্রও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনায় শব্দার্থের এই যাদুশক্তির কারণ—তিনি যেমন বাক্‌সংক্ষেপের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনই কথ্য-ভাষার জীবন্ত বুলিগুলির মাধুর্য্য তিনি প্রথম পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এমন অল্প কথায় গল্পের সকল রস ফুটাইয়া তোলা এবং অতি সূক্ষ্ম হিউমার (humour) সহযোগে কেবলমাত্র নিপুণ বাক্‌ভঙ্গির দ্বারা, এই যে চিত্রাঙ্কণ—ইহা একজন শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই সম্ভব। তাই এই অতি ক্ষুদ্র কাহিনীটির মধ্যেই একটি সম্পূর্ণ চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষ; বয়স হইলেও প্রাণের সারল্য যায় নাই; গরীব অথচ ধর্ম্মভীরু; অতি অল্পে সন্তুষ্ট; পারের মাঝি হিসাবে তাহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাই একটু বেশি সতর্ক; তাহার উপর, যে বিশেষ হিন্দু-কাল্‌চার সমাজের নিম্নস্তরেও সঞ্চারিত হইয়া এককালে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রকে—যেন একপ্রকার ভক্তির আত্মসমর্পণের ভাবে,—শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ভাবতচন্দ্রেব এই ঈশ্বরী পাটনী তাহারই একটি চমৎকার নিখুত দৃষ্টান্ত।

কবিতায় ভাবোদ্রেকের ব্যাপারেও এ কবির কবি-স্বভাবের সংযম বিস্ময়কর; এ কাহিনীতেও তাহার যে সুযোগ ছিল, তিনি তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছেন; কেবল দুইটি মাত্র পংক্তিতে কবির প্রাণ সহসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতেই তাঁহার সব কথা বলা হইয়াছে।—

> যাঁর নামে পার করে ভব পারাবার।
> ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার॥

তারপর আবার সেই পাটনী—

> বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
> কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
> পাটনী বলিছে, মাগো বৈস ভাল হয়ে।
> পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥

—এ কথা একেবারে খাঁটি পাটনীর কথাই বটে; কিন্তু সেঁউতির উপরে সেই পা দুইখানি রাখিতে দেখিয়া কবিও আর একবার একটু ভাববিহ্বল না হইয়া পারেন নাই; কিন্তু তাহাতেও বাগ্‌বিস্তার নাই; পাটনী কিন্তু এসব কিছুই বুঝিতেছে না—এই না-বুঝিবার ক্ষমতাই তাহার চরিত্রটিকে এমন বাস্তব অথচ রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। শেষে যখন সে দেবীর আসল পরিচয় পাইল, তখনও বর চাহিতে বলিলে, নির্ব্বোধ পাটনী আর কিছু চাহিল না, কেবল—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

সাক্ষাৎ-আবির্ভূত দেবতার কাছে এমন ক্ষুদ্র প্রার্থনা কি আর কেহ করিয়াছে? পাটনীর কল্পনায় ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না—চরিত্রের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি কি চমৎকার! কিন্তু এই পাটনীর জবানিতেই কবি যে একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে অতি নির্ব্বোধ পাটনীকেও আর এক হিসাবে অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়। পাটনীর প্রার্থনায় যে ভক্তজনোচিত নৈরাকাঙ্ক্ষ্য আছে, তাহা ভক্ত খ্রীষ্টানের "Give us this day our daily bread"—এই প্রার্থনারই মত। ভারতচন্দ্রের ছন্দ আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহার ভাষা ও কবিত্বশক্তির এই সামান্য পরিচয়টুকু না দিয়া পারিলাম না। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে বাংলায় গান ছিল, গানের উপযুক্ত ভাষাও ছিল; কিন্তু এমন কাব্যও ছিল না, কাব্যের উপযুক্ত ভাষাও ছিল না। কবিত্ব, ভাষা ও ছন্দ—এই তিনের সমান মিলনে—বা, পরস্পরের নিখুঁত উপযোগিতায়—বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সেই প্রথম একজন বড়দরের কবিশিল্পীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। কেবল ভাবকল্পনার মহার্ঘতা বা কাহিনীকুশলতাই কবিশক্তির নিদর্শন নয়; ভাবকল্পনার উপযোগী ভাষা বা বাণীর প্রকাশসুষমাই যে কাব্যের প্রধান রসহেতু, বাঙালী ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তাহা সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের পর প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যে এমন আর একজন কবিরও আবির্ভাব হয় নাই বলিয়া সে কাব্য এতদিনেও একটু পুরাতন হয় নাই। পুরাতন না হওয়ার আরও কারণ এই যে, এ ভাষা সত্যকার কবিভাষা; কাব্য যেমন উৎকৃষ্ট হয় ভাষার গুণে, তেমনই ভাষার গুণেই কাব্য বাঁচিয়া থাকে। তাই মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যে অমর, ভারতচন্দ্রও তেমনই চিরজীবী হইয়া আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বাঙালী কবিহিসাবে ঈশ্বরগুপ্তের বন্দনা করিয়াছেন; এবং নব্য আদর্শে উজ্জীবিত বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরতিশয় আশান্বিত হইয়া, পুরাতন কবিতার প্রতি মমতা সত্ত্বেও, তিনি তাহার সেই আদর্শের প্রসার কামনা করেন নাই। প্রাচীন কবিতার প্রসঙ্গে তিনি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করেন নাই; তাহার কারণ,

নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় সেই পুরুষ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যখানির অশ্লীলতা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই; এজন্য তাহার নামোচ্চারণ করিতেও বাধিত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা শ্রদ্ধার সহিত বুঝিবার ও বিচার করিবার প্রবৃত্তি যে তাঁহার হয় নাই—সে যেমন তাঁহারও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও তেমনই।

এইবার ভারতচন্দ্রের পয়ারের কথা বলিব। আমরা এতদূর পর্য্যন্ত পয়ার ছন্দের যে বিকাশধারা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের পূর্ণ সাযুজ্য ঘটে নাই, অর্থাৎ কাব্যচ্ছন্দের সঙ্গে ভাষার উচ্চারণপদ্ধতির যে সম্পর্ক না থাকিলে, ছন্দ একটা কৃত্রিম বস্তু হইয়া দাঁড়ায়—সেই সম্পর্ক সহজ হইয়া উঠে নাই। ছন্দ যে একটা বাহির হইতে গড়া যন্ত্রবিশেষ নয়—যাহার ছাঁচে বাক্যকে ফেলিয়া একটা বাজনা বাজাইলেই হইল—ইহা আমরা এখন যেমন বুঝি (ছন্দশাস্ত্রীরা এখনও বুঝেন না), পূর্ব্বে, কাব্যে সেই অলঙ্কারপ্রিয়তার যুগে, কেহ তেমন বুঝিত না। আদি বাংলার সেই প্রাকৃত-গোত্র হইতে যে-ছন্দের উদ্ভব হইয়াছিল—ভাষার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও যে রূপান্তর হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছন্দের প্রয়োজন ভাষার প্রয়োজন অপেক্ষা বড় হইয়া থাকায়, সেই আদি ছন্দের ভূত নূতন ভাষার স্কন্ধ হইতে নামে নাই; ভাষার প্রকৃতি যেমন হউক, স্বাভাবিক উচ্চারণ যেমন হউক —বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল। কারণ, তাহা হইলে, ছন্দের নিয়ম ভালরূপ রক্ষা হয় না। ইহারই জন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অমন চমৎকার দেশী শব্দগুলি ছন্দের চাপে জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবিতাপাঠ যেমন ছন্দের অনুযায়ী হইয়া থাকে, তেমনই ছন্দও পাঠভঙ্গির দ্বারাই স্পন্দিত বা তরঙ্গিত হয়, এবং তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রুতিমাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে। ভাষা ও ছন্দ—দুইই ভাবের যথার্থ প্রকাশে সাহায্য করে; ভাষার প্রত্যেক বর্ণ তাহাদের বিশিষ্ট ধ্বনিসঙ্কেতে ভাবের কণ্ঠস্বরাশ্রিত রূপকে আমাদের শ্রুতিগোচর করে; এবং ছন্দ সেই ধ্বনির প্রবাহকে একটি সুবলয়িত সুষমা দান করে। কিন্তু ছন্দ যদি একটা পৃথক বাদ্যধ্বনি হইয়া, ভাষা, এবং ভাষা যাহার রূপ—সেই ভাবকে—একটা কৃত্রিম সুরযুক্ত করে, শব্দের কণ্ঠস্বরজাত কোন ধ্বনিবৈচিত্র্য তাহাতে ফুটিয়া উঠিতে না পায়, তবে কাব্যও যেমন রসোজ্জ্বল হয় না, ছন্দও তেমনি একটা শৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়। ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের অন্তরঙ্গতা না থাকিলে এমনই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বাংলা পয়ার শেষে সর্ব্ববিধ শিল্পগুণ হারাইয়া একটা রচনা-রীতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভাব যেমন হউক, ভাষা যেমন হউক—বিষয়বস্তু যতই কবিত্ববর্জ্জিত হউক—এই পয়ার হইয়াছিল তাহাকে কোন রকমে লিপিবদ্ধ

করিবার একটা ঠাট মাত্র; বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাক্যের পংক্তিগত মিল বা যতি-তালের দূরতম সম্পর্কও নাই, তথাপি ছন্দের ঐ কাঠামোটার বড় প্রয়োজন,—শব্দগুলাকে একটু সাজাইয়া দিবার উহাই একমাত্র উপায়, একটু সুর করিয়া পড়িবার মত হইলেই হইল।

ভারতচন্দ্রের ভাষার পরিচয় দিয়াছি—এই ভাষা যাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই ভাষার রস যাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে—তাঁহার হাতে ছন্দ এই ভাষার ধ্বনিধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে পারিল না—

> শুনিলি, বিজয়া জয়া, বুড়াটির বোল ?
> আমি যদি কই, তবে, হবে গণ্ডগোল !

কিংবা—

> পরিচয় না দিলে, করিতে নারি, পার !
> ভয় করি, কি জানি, কে দেবে ফেরফার ॥

এখানে পয়ারের বাঁধা-চালের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, ছন্দের তলে তলে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিতেছে। ভারতচন্দ্রের ছন্দে, যথাস্থানে বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ না মানিয়া উপায় নাই; এতদিনে ভাষার চাপে ছন্দ দোরস্ত হইয়া আসিয়াছে। সুর এখনও আছে, কিন্তু তাহা ছন্দকে একটু দোল দেওয়ার মত, যেমন—

> অন্নপূর্ণা উত্তরিলা—আ | গাঙ্গিনীর তীরে—এ

আমি সুরের স্থানে কেবল চিহ্নস্বরূপ—'আ' এবং 'এ' বসাইয়াছি, এই সুর দুইটি যতি-স্থানেই আছে—প্রথমটিতে একটু কম, দ্বিতীয়টিতে একটু বেশি; ভারতচন্দ্রের ভাষায় ইহার অধিক সুরের অবকাশ নাই। এই সুর ঈশ্বরগুপ্তের যুগে শিক্ষিত সমাজের কাব্যরচনায় আর ছিল না। ঈশ্বরগুপ্ত যমক-অনুপ্রাসের সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে এই সুরকে কাব্য-ছাড়া করিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণ—

> বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।
> আহা তায় রোজ রোজ' কত 'রোজ' ফোটে ॥
>
> *　　　　*
>
> আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
> অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ ॥

অতএব, ভারতচন্দ্রের পয়ারকে—কেবল বাংলা বুলির প্রাধান্য নয়, কথ্যভাষার বাচন-ভঙ্গিও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে; প্রত্যেক বাক্যে, ভাব ও অর্থের অন্বয়রীতিকে আশ্রয় করিয়া শব্দগুলি স্ব স্ব মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—ছন্দের মধ্যে কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরভঙ্গিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারের পূর্ব্বাবস্থা।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য—হিন্দীর সহিত তুলনা, পয়ার ছন্দের উদ্বর্ত্তন—সংক্ষেপে মূল সিদ্ধান্তগুলির পুনরুল্লেখ, বাংলা পয়ার ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও বিকাশের এই অতি স্থূল বিবরণ হইতেও যে একটি তত্ত্ব, আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এখানে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। সংস্কৃত হইতেই যে ছন্দ-প্রকৃতি আদি অপরিণত বাংলা ভাষায় সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহার কৌলীন্যও যেমন তেমনই তাহার কলা-কৌশলও অসামান্য। এই ছন্দই প্রাচীন কাব্যরীতিসম্মত; অর্থাৎ, ছন্দ কবিতার একটা বহির্গত অলঙ্কার বা প্রসাধন—বাক্যকে রসাত্মক করিবার একটা অতিরিক্ত উপায় মাত্র। এজন্য, বাক্যকে ছন্দোবদ্ধ করিবার সময়ে ছন্দের পৃথক মূল্যের দিকেই দৃষ্টি থাকিত, বাক্-প্রকৃতির দিকে নয়। এই কৃত্রিমতার বিলাস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের ছন্দপদ্ধতিতে—তাহার সেই নানা ভঙ্গিমার গণ-বৃত্ত ছন্দে। বাংলাভাষা প্রথম হইতেই এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। সে যে তাহার পদ্যের পদচারণায় ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহা করিতে গিয়া এ কূল ও কূল—কোন কূল রক্ষা করিতে পারে নাই—বাংলা পয়ারছন্দের উদ্বর্ত্তনের ইতিহাসে সেই তত্ত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির ফলে তাহার প্রাচীন ছন্দ-সম্পদ কিরূপ দীন ও নানাদোষদুষ্ট ছিল—হিন্দীর সহিত তুলনা করিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শ বা কাল্‌চারকে ধরিয়া থাকার ফলে, মধ্যযুগে হিন্দী কবিতার যে উৎকর্ষ হইয়াছিল, বাংলা তাহার তুলনায় সর্ব্বাংশে গ্রাম্য বলিতে হইবে। কিন্তু বাঙালী, তাহার জাতির মত, ভাষারও স্বাতন্ত্র্যবোধ ত্যাগ করিতে পারে নাই—রাজপ্রাসাদের পায়সান্ন-প্রসাদ অপেক্ষা আপনার পর্ণকুটীরে স্বাধীন শাকান্নের আয়োজনে সে অধিকতর তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে। ভাষায় ও ছন্দে প্রাচীনের সেই অধীনতা-শৃঙ্খল শিথিল করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই সে এত সহজে সাহিত্যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে। হিন্দী ভাষা বা সাহিত্যের জ্ঞান আমার নাই বলিলেও

হয়, তথাপি, তাহার যে প্রাচীন ছন্দরীতিই—ভাষার আধুনিকতা সত্ত্বেও—হিন্দী কবিতার আশ্রয় হইয়া আছে, তাহার পরিচয় পাইয়া, বিস্ময় বোধ করিয়াছি। মনে হয়, সেখানে বহুকাল পর্য্যন্ত ভাষার সঙ্গে ছন্দের সাযুজ্যবিধান হয় নাই, সেই আদি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এখনও সগৌরবে প্রভুত্ব করিতেছে। আমাদের পয়ারের সমস্থানীয় হিন্দি 'চৌপাই' আজিও এই চাল বজায় রাখিয়াছে—

(১) চরণ শরণ কেহি কারণ ত্যাগিহোঁ।
জগ জনমত সোই মারণ ভাগিহোঁ॥

কিংবা—

(২) ভক্তি বিনু যুক্তনর নাহক পধারী।
শক্তি নহি ভক্তি বিনু জ্ঞান নহি ভারী॥

ইহাদের ছন্দপদ্ধতি এইরূপ—

(১) চ র ণ শ র ণ কে হি কারণ ত্যাগিহোঁ

(২) ভক্তি বিনু যু ক্ত ন র না হ ক প ধা রী

-বলা বাহুল্য, ইহার সকল বর্ণই স্বরান্ত; প্রত্যেক চরণে বাংলা পয়ারের মত চৌদ্দটি অক্ষর আছে, এবং দ্বিতীয় শ্লোকটি বাংলার মত করিয়া পড়াও যায়। কিন্তু তাহা চলিবে না। কারণ, ইহার মাত্রা কেবল লঘু-গুরু নয়, তাহাদের স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে—নিয়মিত গণ-ভাগও আছে। এই অক্ষর আমাদের পয়ারের অক্ষর নয়; অক্ষর-সংখ্যা ১৪ হইলেও, ইহার মাত্রাসংখ্যা বেশি। আর একটি ষোল মাত্রার (অক্ষর নয়) হিন্দী চরণ এইরূপ—

বন্দোঁ রাম নাম রঘুবর কো

ইহার প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুইমাত্রা না ধরিয়া, প্রয়োজন মত হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিলে, এই পংক্তিটিতেও খাঁটি চার মাত্রার চাল মিলিবে, যথা—

বন্দোঁ • রাম নাম • রঘুবর কোঁ

এবং তাহাতে পয়ারের পদভাগও থাকিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হিন্দী প্রাচীন বাংলার খুব দূর জ্ঞাতি না হইলেও সে তাহার সেই প্রাচীন ছন্দরীতি এখনও ছাড়ে নাই, বরং তাহাকেই খুব পাকা

করিয়া তুলিয়াছে—সে তাহার ছন্দপদ্ধতিতে এখনও নিজস্ব স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গিকে আমল দেয় নাই। বাংলা যে শীঘ্রই ভিন্ন পথে চলিয়া, শেষে পয়ারের মত একটা স্বকীয় ছন্দ গড়িয়া লইয়াছে, তাহাতে বাংলাভাষার মতই, বাঙালীর জাতিগত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহার পরিচয় আছে।

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমি বাংলা পয়ারের ক্রম-বিবর্ত্তনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এইখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।—

প্রথম স্তর। সংস্কৃতের মত অক্ষরমাত্রিক হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রভাব। চরণের মাত্রা-সংখ্যা ১৬, পদভাগ—৮+৮। লয় দ্রুত—এজন্য মাঝের যতিটি ছন্দভাগের নির্দ্দেশক মাত্র। Rhythm বা ছন্দস্পন্দ প্রচুর।—

কাআ | তরুবর ॥ পঞ্চবি | ডাল (চর্য্যাপদ)

দ্বিতীয় স্তর। ঐ একই চরণের পর্ব্বগুলি প্রায় সমমাত্রার চার অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এজন্য একটি ভিন্নতর গীতিসুরের সৃষ্টি হইয়াছে। ছন্দস্পন্দ অনেকটা আধুনিক দ্বৈমাত্রিক গীতিচ্ছন্দের মত।—

জোইনি । তঁই বিনু ॥ খনহি ন । জীবমি (চর্য্যাপদ)

তৃতীয় স্তর। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও 'শূন্যপুরাণে'র—পয়ারের আদি রূপ। ভাষার স্বতন্ত্র রূপ ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে। পদভাগের যতি আরও সুস্পষ্ট। মাত্রাবৃত্তের সুর কথার সুরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং দ্বিতীয় পদভাগের ৮ মাত্রা ৬ মাত্রার দিকে ঝুঁকিতেছে।—

নগর বাহিরিরে ডোম্বি। তোহোরি কুড়িআ (চর্য্যাপদ)

চতুর্থ স্তর। পয়ারের পূর্ণ প্রকাশ।—

(১) দধি দুধ ঘৃত ঘোল | হাটে না বিকায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
(২) মেরু মন্দার ন ছিল | ন ছিল কৈলাস (শূন্যপুরাণ)

পঞ্চম স্তর। কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ভাষা (প্রচলিত পাঠ) সাধু বা সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে বর্ণগুলি অনায়াসে স্বরান্ত হইবার সুযোগ পাওয়ায় ছন্দধ্বনি আরও শিষ্ট ও স্বাভাবিক হইয়াছে; ছন্দের দ্বৈমাত্রিক লয়ও আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি বাংলার উপরে সংস্কৃতের

পালিশ ছন্দের ধ্বনিকে আর এক প্রকারে সমৃদ্ধ করিয়াছে, যুক্তবর্ণের মূল্য বাড়িয়াছে। কিন্তু ছন্দের আর কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই—

পৃ́ষ্ঠে লোটে * স্প́ষ্ট রূপে | প্র́বালের * ঝাঁপা।

মহা́ ভার * তে́র কথা | অ́মৃ ত স * মান।

ষষ্ঠ স্তর। ভারতচন্দ্রের পয়ার। এতদিনে ছন্দের সঙ্গে সহজ বাগ্‌বিন্যাসের আপোস ঘটিয়াছে—ছন্দ ও ভাষার চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছে। শব্দের বাক্য ও অর্থঘটিত অন্বয় এবং তজ্জন্য শব্দসকলের পৃথক মর্যাদা, এই দুইয়ের প্রভাবে, পদমধ্যে বাক্যের ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বরভঙ্গিও ধরা পড়িতেছে।—

শুনিলি, বিজয়া জয়া, বুড়াটির বোল?
আমি যদি কই—তবে হবে গণ্ডগোল!

ছন্দের পদভাগের যে যতি, তাহাও এখানে বাক্যের স্বাভাবিক পদচ্ছেদের অনুগত হইয়া উঠিয়াছে; এজন্য নিয়োদ্ধৃত চরণের মধ্য-যতি আটের পর না পড়িয়া ছয়ের পরে পড়িলেও ক্ষতি নাই—

দেবী কন, দিব—আগে পারে লয়ে চল।

এই কারণেই পয়ার এক্ষণে যতদূর সম্ভব স্বরমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর চরণের পক্ষে পয়ার যে কেন এমন উপযোগী হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মধুসূদন তাঁহার ছন্দের অমিত্রাক্ষর চরণের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকটে কতখানি ঋণী, তাহা বুঝিবার জন্য বাংলা পয়ারের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির এই ইতিহাসটুকুর প্রয়োজন ছিল। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ নই, ধ্বনি-বিজ্ঞানও আমার পক্ষে একটি বিভীষিকা; তথাপি কেবল সাধারণ ছন্দ-জ্ঞান এবং ছন্দরসপিপাসু কান, এই দুইয়ের দুঃসাহসে, আমি পণ্ডিতগণের এই অতিশয় দৃঢ়রক্ষিত এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, তাহার একমাত্র কৈফিয়ৎ—গরজ বড় বালাই। আমি জানি যে, প্রাচীন কবিদের যে ভাষাকে যতখানি প্রাচীন মনে করিয়া, আমি বাংলা পয়ার-ছন্দের এই কালক্রমিক স্তর ভাগ করিয়াছি, তাহা ঐতিহাসিকের

অনুমোদিত হইবে না; জানি, 'শূন্যপুরাণ'কে আমি যে কালে স্থাপন করিয়াছি, অথবা যে ভাষাকে আমি কৃত্তিবাসের ভাষা বলিয়া, তাহা হইতেই, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী এক স্তরের সন্ধান করিয়াছি, তাহার কোনটাই গ্রাহ্য হইবে না। আসলে, আমি ইতিহাসকে ততটা অনুসরণ করি নাই যতটা ছন্দের বিকাশধারায় তাহার পরিণতির পৌর্ব্বাপর্য্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। প্রচলিত কৃত্তিবাসের ভাষা যদি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক, কিংবা পরবর্ত্তীও হয়, তবু তাহার ছন্দ ভারতচন্দ্রের তুলনায় অপরিণত—সেই স্তরটিকেই আমার প্রয়োজন। সকল প্রতিভাশালী কবিই তাঁহাদের যুগের বহু অগ্রবর্ত্তী; এজন্য এরূপ কবির পরবর্ত্তী কোনও লেখকের রচনা পূর্ব্বতর যুগের জের টানিয়া চলিতে পারে, অতএব তাহাকে সেই যুগের লক্ষণযুক্ত মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। 'শূন্যপুরাণে'র কবিও ঠিক সেই হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কবির পূর্ব্ববর্ত্তী। চণ্ডীদাসের মত কবির সঙ্গে পাল্লা দিবার শক্তি —'শূন্যপুরাণ'-রচয়িতার মত কবির পক্ষে তো কথাই নাই, অন্য কোন কবির পক্ষেও সম্ভব নয়। 'শূন্যপুরাণ' যত পরবর্ত্তী কালেরই হউক, কবি যে ওই ছন্দ এবং ওই ভাষার উপরে উঠিতে পারেন নাই তাহাতে আমার বড় সুবিধা হইয়াছে— আমি বাংলা পয়ারের একটা বিশিষ্ট স্তর খুঁজিয়া পাইয়াছি। খাঁটি ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয় ভাষার বিষয়ে যে কারণে প্রয়োজন এবং ভাষার সেই ইতিহাস ধরিয়া, ছন্দেরও রূপ-বিবর্ত্তন যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়া লইতে হয়, আমার প্রয়োজন তেমন নয়; সে প্রয়োজন ইহাতেই সিদ্ধ হইবে। অতঃপর, মধুসূদনের ছন্দনির্ম্মাণে এই পয়ারের কিরূপ উপযোগিতা ছিল, এবং মধুসূদন ঐ পুরাতন ছন্দটিকে কি উপায়ে এই আধুনিকতম রূপ দিয়াছিলেন, সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমি পয়ারের যে আদি রূপ, এবং তাহা হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পর্য্যন্ত ছন্দের ও ভাষার যে গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছি, মধুসূদনের সময়ে তাহার সংবাদ কেহ রাখিত না; রাখিলেও মধুসূদনের মত পণ্ডিত ও ভাষাজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে তাহা কতটুকু কাজে লাগিত বলা যায় না। কিন্তু সেকালের বাঙালী-সন্তান বলিয়া মধুসূদনের একটা সুবিধা হইয়াছিল—তিনি কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কাব্য বাল্যকালেই পড়িয়াছিলেন, এবং সেজন্য খাঁটি বাংলাও যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার ছন্দেও তাঁহার কান অভ্যস্ত ছিল। ইহার পর,

ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই বাংলা ভাষা ও ছন্দের যতখানি শিল্পোৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহা তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ, তিনি তৎকালপ্রচলিত কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য হইতেই তাঁহার ছন্দের চরণ আহরণ করিয়াছিলেন, এবং ভারতচন্দ্র হইতে তিনি, ছন্দের মধ্যে বাংলা বাক্‌ভঙ্গির স্থান সম্বন্ধে, বিশেষ ইঙ্গিতও পাইয়াছিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের ওই চরণ, এবং ভাষার কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত সাধুরীতি, এবং ছন্দের মধ্যে বাক্‌ভঙ্গির কিছু কিছু ইঙ্গিত—ইহার বেশি কিছু তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের নিকট হইতে পান নাই, এবং ইহাই সম্বল করিয়া তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—'যে খেলিতে জানে সে কানাকড়িতেও খেলে', মধুসূদনকেও প্রায় সেইরূপ খেলিতে হইয়াছিল; তফাৎ এই যে, তিনি এই কানাকড়ির মধ্যেই স্বুবর্ণদ্যুতি দেখিতে পাইয়াছিলেন—যাহা সেকালে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। মধুসূদন নিজে তাঁহার এই ছন্দের নির্ম্মাণকৌশল সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেন নাই—যেখানে যেটুকু উল্লেখ করিয়াছেন, পরে তাহা বলিতেছি। তিনি যে মিল্‌টনের ছন্দের আদর্শেই এই বাংলা ছন্দ গড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? মিল্‌টনের পূর্ব্বে যেমন Marlowe, Shakespeare,—বাঙালী কবির গুরুও তেমনই মিল্‌টন! বাংলা ছন্দের আদর্শ সন্ধান করিতে হইবে ইংরাজী কাব্যে—এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে!

মিল্‌টনের সেই 'five-stress line'-এর মাপে বাংলা পয়ারের মাপ যে অনেকটা মেলে, তাহা বুঝি, কিন্তু তাহার সেই 'five-stress', আর এই একটানা সুরের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ—ইহাদের মধ্যে মিল কোথায়? তবু মধুসূদন তাহাতে হটিলেন না; তিনি নাকি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন—বাংলার পশ্চাতে তাহার জননী (বা মাতামহী) রূপে দাঁড়াইয়া আছে সংস্কৃত; অতএব ফরাসী ভাষার মত ভাষাতেও যাহা সম্ভব হয় নাই, বাংলায় সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনায়াসে সম্ভব হইবে। ইহাতে, না হয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার—সুন্দর ও সুগম্ভীর শব্দরাজি আহরণ করিবার উপায় হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজী 'five-stress line'-এর সেই rhythm কেমন করিয়া আমদানি করা যাইবে?

বাংলা ছন্দের ওই মাপটি বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই মাপটিই তাঁহার সবচেয়ে বড় ভরসার কারণ হইয়াছিল। ইংরেজী blank verse-এর চরণে যে দশটি অক্ষর (syllable) আছে, তাহা বাংলা বর্ণমাত্রিক অক্ষর নয়—তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে যে একটি করিয়া হসন্ত বর্ণ থাকে, তাহার জন্য, কালের হিসাবে সে চরণের মাপ আমাদের পয়ারের মাপ অপেক্ষা বরং একটু বেশিই হইবে। অতএব এই মাপটি বড়ই ভাল পাওয়া গিয়াছিল। আমার মনে হয়, ঠিক ঐ চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ তৈয়ারী না থাকিলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষব ছন্দরচনা সম্ভব হইত না। বাংলায় যে এই ছন্দ সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ—ভাষার প্রকৃতিবশে পয়ার ক্রমে সেই ১৬ মাত্রার সকল উপসর্গ দূর করিয়া খাঁটি চৌদ্দবর্ণের চরণে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। এই চরণকে লইয়াই মধুসূদন তাহার ছন্দকে তরঙ্গিত, এবং সেই তরঙ্গিত ছন্দপ্রবাহকে, কূলপ্লাবী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ওই মাপ একটা বড কথা; চৌদ্দ অক্ষরের তটসীমা লঙ্ঘন করিয়া যে স্রোত প্রবাহিয়া চলিয়াছে, তাহা ওই Rhythm বা তরঙ্গেরই স্রোতোবেগ। ছন্দ সেই তটবন্ধন স্বীকার করিয়াই এমন মুক্ত গতি লাভ করে। ইহাই এ ছন্দের সবচেয়ে বড় রহস্য। ঐ মাপ যদি ঠিক না থাকে তবে, এ ছন্দের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়; তখন তাহা গদ্য, কিংবা অন্য কোন ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়। মধুসূদন এসব কিছুই বলিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, তিনি কেবল মিল্টনের ছন্দ পড়িতে বলিয়াছেন, এবং এ ছন্দও পড়িবার সময়ে সেইমত কেবল যতিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাহা হইলে আর সব ঠিক হইয়া যাইবে। তিনি যদি জানিতেন যে, একদিন তাঁহার এই ছন্দের নামকরণ হইবে "অমিতাক্ষর", তাহা হইলে বোধ হয় শিহরিয়া উঠিতেন। অথবা, তাঁহার ছন্দ লইয়া এতবড় পাণ্ডিত্য যে কেহ করিবে, তাহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই, তাই এ বিষয়ে দেশ-বাসীর মাথা ঘামাইতে চান নাই, কেবল যাহাতে তাহারা একটু তাল-মান রাখিয়া পড়িতে পারে, মাত্র তাহারই জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। মধুসূদনের ছন্দে যতির স্থান নির্দ্দিষ্ট নয় বলিয়া, তাঁহার ছন্দ 'অমিতাক্ষর'! অর্থাৎ তাহার অক্ষরসংখ্যাও ঠিক নাই—সে চরণ মাপহীন! কোন্ ছন্দ যে 'অমিতাক্ষর' হওয়া সত্বেও গদ্য না

হইয়া পদ্য হইতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত মৌলিক বটে! কিন্তু কিছু বলিবার যো নাই, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের বৈদিক শ্রাদ্ধ-হোম করিতে সুরু করিয়াছেন—সেই ঋত্বিকগণেরই একজন এই অমূল্য তত্ত্বটি উদ্ধার করিয়াছেন। মিল্‌টনের ছন্দকে কেহ এখনও 'অমিতাক্ষর' বলিতে সাহস পায় নাই, তাহার কারণ বোধ হয়, সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও মিল্‌টনের কাব্য পাঠ্য হয় নাই। এই নামকরণের পক্ষে, সেই দুর্দ্দান্ত ছন্দপণ্ডিত যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল ইহাই বোধগম্য হয় যে, মধুসূদন তো কেবল ছন্দটাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু ছন্দের যে নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই ছন্দোহীন, অর্থাৎ বেশ মোলায়েম নয়; অতএব ঐ নামটা আর একটু 'তান-প্রধান' করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এ ছন্দে যতির কাজ যে স্বতন্ত্র, তাহার সঙ্গে চরণের অক্ষর-সংখ্যার যে কোন বিরোধ নাই, এবং যে-কোন যতিস্থান পর্য্যন্ত পদচ্ছেদের মাত্রাসংখ্যা যেমনই হোক, মিল্‌টনের Iambic Pentameter বা 'five-stress line'-এর মত, এই ছন্দও যে মূলে পয়ারের ৮+৬ প্রকৃতিসম্পন্ন, এবং ওই চৌদ্দ মাত্রার মাপটিই যে উহার প্রাণ—ইহা যে না বুঝিয়াছে, সে কেন হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত দৌড় দিয়াই ক্ষান্ত হইল না? মধুসূদনের 'অমিতাক্ষর'-ছন্দে যতির কাজ কি তাহা পরে বলিব; কিন্তু যাহার চরণগুলির ওই ৮+৬, এবং ১৪—Law of Gravitation-এর মতই একটা দুর্ল্লঙ্ঘ্য নিয়ম, তাহাকেও 'অমিতাক্ষর' নাম দিতে বাধিল না! ইংরেজী 'blank-verse'-এর 'blank'-এর অর্থ কি? মধুসূদন তাহার যে বাংলা করিয়াছেন, তাহা কি তদপেক্ষা সার্থক হয় নাই? যে ছন্দতত্ত্ব অনুসারে ইহারও ভুল সংশোধন করিতে হয়, তাহাকেই ধিক্!

চতুর্থ অধ্যায়

অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ—গঠন ও উপাদান ; মধুসূদনের প্রথম প্রয়াস।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের চরণ কোনখানেই 'অমিতাক্ষর' নয় ; অমিতাক্ষর হইলে, উহার ওই পয়ারের কাঠামোট্টার কোন প্রয়োজন হইত না। ওই ১৪ অক্ষরের মাপটিই বাংলা অমিত্রাক্ষরকে যেমন সম্ভব করিয়াছে, তেমনই ওই পদভাগও (৮+৬) অনাবশ্যক হইয়া যায় নাই। চরণেব ওই পদক্ষেপ—উহার অবয়বের ওই অঙ্গসন্ধিই—এ ছন্দেব স্বাধীন গতিভঙ্গির একটা বড় সহায় ; কারণ, 'freedom'-এর সঙ্গে ওই 'form' আছে বলিয়াই, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এমন মহিমা লাভ করিয়াছে। নূতনতর যতিবিন্যাস ইহার সঙ্গীতকে যেমন বৃহত্তর সঙ্গতি (larger harmony) দান করিয়াছে, তেমনই ওই ৮+৬-এর যতিদুইটি ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়াছে। চরণমধ্যে বা চরণান্তবে ভাব-অর্থের স্বচ্ছন্দ গতি-বেগ যেখানে আসিয়া যেমনই বিরাম লাভ করুক, ওই যতিদুইটি কখনও মুছিয়া যায় না। ইহাকেই আমি এ ছন্দেব 'Law of Gravitation' বলিয়াছি। ওই মাপ এবং ওই যতি যদি ঠিক না থাকে, তবে ছন্দহিসাবে অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্যই লোপ পায়—গিরিশ ঘোষের মিলহীন doggerel তাহাব দৃষ্টান্ত। এ জ্ঞান যে কাহারও নাই, তাহার প্রমাণ—একালের মহা মহা ছন্দ-ধুরন্ধরগণ, গিরিশ ঘোষের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের ধাবমান (run on) পয়ার, এবং 'বলাকা'র ছন্দ, এই সকলকেই অমিত্রাক্ষরেব সমধর্ম্মী মনে করিয়া, তুলনায় তাহাদের তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ জ্ঞান এখনও হইল না যে, এই অমিত্রাক্ষর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু—ইহার আত্মাই স্বতন্ত্র। আর সকল ছন্দই গীতিচ্ছন্দ ; কেবল ওই একটি ছন্দ তাহা নহে। অমিত্রাক্ষরেরও একটা লিরিক রূপ আছে ; ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিগণের মত আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাহার যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর লিরিক তো নহেই, এমন কি, উহা নাটকগোত্রীয়ও নয়—খাঁটি এপিকের অমিত্রাক্ষর ; অর্থাৎ উহা একেবারে নিকষ-কুলীন, —কিন্তু আমাদের দেশের নেড়া-নেড়ীর দল তাহা কিছুতেই বুঝিবে না!

চৌদ্দ অক্ষরের কম বা বেশি হইলে উহার জাত থাকে না; হয় কোমরে হাত দিয়া নাচিতে থাকে, বা কাঠি বাজায়; নয় তো স্বর-মূর্চ্ছনায় ঢলিয়া পড়ে। এইজন্যই চৌদ্দ অক্ষরের মাপটি এত মূল্যবান। ওই মাপের ওই চরণ, বাংলা কবিতায় দীর্ঘকাল কর্ষণের ফলে, শেষে স্বাভাবিক বাক্‌ছন্দের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই, বাংলা কাব্যে এই ছন্দের সিংহাসন-রচনা আদৌ সম্ভব হইয়াছিল।

চৌদ্দ অক্ষরের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে মিলের কথা বলিব। সকল নামের মত 'অমিত্রাক্ষর' নামটিও এই ছন্দের একটি উপাধিমাত্র—চূড়ান্ত পরিচয় নয়। সেকালে—হেম, নবীন প্রভৃতি কবিগণ, উহার ওই মিলহীনতাকেই আসল লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলা ছন্দের পক্ষে মিলহীন হওয়া যে কত দুরূহ—মিলের ঘুঙুর্ কাড়িয়া লইলে, তাহার পরিবর্ত্তে কোন্ দুর্লভতর ভূষায় ইহাকে ভূষিত করা প্রয়োজন, সে ধারণা তাঁহাদের ছিল না। আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, মিলের অভাবপূরণ নয়—যেন সে ভাবনাই নয়,—মিলকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ অনাবশ্যক করিয়া তোলাই এ ছন্দের গৌরব। এইজন্যই স্বচ্ছন্দ যতি, বা অনিয়মিত পদবিন্যাস সত্ত্বেও, যে-ছন্দে মিলের লেশমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে, সে ছন্দ অমিত্রাক্ষরের হাজার মাইলের মধ্যেও আসিতে পারে না,—তুলনীয় হওয়া তো পরের কথা। ঠিক সেই কারণেই, আজকাল যে সব মিলহীন কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাদের সহিতও অমিত্রাক্ষরের দূরতম সম্পর্ক নাই—যেমন সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার মিলহীন ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়; সে সকল ছন্দও গীতিছন্দ।

অতএব, আমরা এপর্য্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনটি বাহ্য লক্ষণ পাইতেছি;—(১) চরণ হিসাবে উহা সেই পুরাতন পয়ার; (২) উহাতে মিল নাই; এবং (৩) ৮+৬-এর সেই যতি ছাড়াও, ইহার নিজস্ব একপ্রকার যতি আছে। কিন্তু এহ বাহ্য; বাংলা ছন্দহিসাবে (ইংরেজী ছন্দে সে প্রশ্নই উঠে না) ইহার প্রথম বা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য—ইহার Rhythm বা ছন্দস্পন্দ। এই Rhythm-সৃষ্টি মধুসূদন যে উপায়ে করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ আলোচনা পরে করিব; এখন কেবল ইহাই বলিয়া রাখি যে, এই সমস্যা মধুসূদনকে কখনও উদ্বিগ্ন করে নাই; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! প্রথম হইতেই, মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল—ওই নূতন যতি-বিন্যাস বা ছন্দের গতি-স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে। অতএব মনে হয়, Rhythm এবং যতি

—অমিত্রাক্ষরের এই দুই প্রধান উপকরণের একটির সম্বন্ধে তিনি যেমন সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, অপরটির (Rhythm) সম্বন্ধে তাঁহার কানই সজাগ ছিল, তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয় নাই ; একটিকে নানা রকমে সাজাইয়া বার বার পড়িয়া কানের সম্মতিলাভ করিতে হইয়াছে, অপরটিকে, শব্দের ধ্বনিতরঙ্গে—কান আপনিই ঠিক করিয়া লইয়াছে। নতুবা মধুসূদন তাঁহার নূতন ছন্দ সম্বন্ধে পাঠকগণকে (বন্ধুর মারফৎ) কেবল এই কয়টি কথা বলিতেন না—

"So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse, that I have been obliged to think on the subject [ইহার পূর্ব্বে একবারও আবশ্যক হয় নাই।], and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd. 4th, 6th, 7th, 10th, 11th and 12th"

ইহাতেও দেখা যায় যে, তখন পর্য্যন্ত এবিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ বা প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই, এবং এক্ষণে ইহাই হইল তাঁহার বিশেষ চিন্তার ফল! ইহার পূর্ব্বে আর একবার তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন—

"If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find, how the verse in which the Bengali poetaster writes is constructed. Let your friends guide their voices by the pause (as in the English Blank Verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language"

—এই উক্তিটিতেই বরং—যতই অসম্পূর্ণ হউক—মধুসূদন তাঁহার ছন্দ নির্ম্মাণ-কৌশলের একটা বড় সন্ধান দিয়াছেন ; সেই সন্ধান অনুসারেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। মিল্‌টনের ছন্দের যতিবিন্যাস-পদ্ধতির কথাটাই কবি এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেও, আসলে ইহার মধ্যে সব কথাই আছে, তিনি যে, কেবল যতিই নয়, ছন্দস্পন্দের সর্ব্ববিধ কৌশল উহা হইতে আদায় করিয়াছিলেন, পরে আমি তাহাও দেখাইব। কিন্তু কবির সে বিষয়ে কোন সজ্ঞান চিন্তাই নাই—এমন একটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষার ছন্দ-কৌশল বাংলা ভাষার উপযোগী হইল কি করিয়া, তাহার কোনও কৈফিয়ৎই নাই ; এ যেন—"Let there be light, and there was light !" তথাপি উপায় নাই, যেমন করিয়া হউক—এ রহস্যের সমাধান আমাদিগকেই করিতে হইবে।

ইংরেজী ছন্দ পয়ারের মত পদভূমক নয়—পর্ব্বভূমক; তাহার চরণে যতি পড়ে foot বা পর্ব্বের পরে—অক্ষরের পরে নয়। মধুসূদনের ছন্দে পদভাগেরও পদচ্ছেদ আছে, এই পদচ্ছেদের পরেই যতির স্থান হইয়া থাকে; তাই বলিয়াই পদচ্ছেদগুলিই এক একটি 'foot' নয়। এসব বিচার তিনি করেন নাই। কাজ কি ওসব ব্যাকরণ-সমস্যার মধ্যে গিয়া? ছন্দটি কানে বেশ লাগিতেছে তো! ব্যস্, আর কি চাই? বাংলা পয়ারে ওই সকল হাঙ্গামা সত্যই নাই—পদ বা metrical section আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিয়মিত পদচ্ছেদ বা পর্ব্ব নাই। প্রাচীন পয়ার একেবারে নিছক বর্ণবৃত্ত ছন্দই বটে, তাহাতে বর্ণগত কালাংশ (unit), এবং তাহারই মাপে প্রত্যেক শব্দের, তথা পদসমষ্টির কালপরিমাণই ছন্দের ছন্দত্ব বজায় রাখে। ইহাতে যেমন সংস্কৃত গণবৃত্তের মত কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণসজ্জা নাই, তেমনই হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর-পরম্পরার ছন্দস্পন্দনও নাই। মিল্‌টনের ছন্দে পদচ্ছেদের স্থানে foot আছে, এবং প্রধানত, অক্ষরবিশেষের গুরু উচ্চারণে ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়। মধুসূদনের এসব বিচার করিবার প্রবৃত্তিও ছিল না, অবকাশও ছিল না; ছিলনা বলিয়াই, তিনি যাহা অভাবনীয় তাহাকেও সম্ভব করিতে পারিয়াছেন। মধুসূদন মিল্‌টনের ছন্দকে, ইংরেজী ছন্দসূত্রের সাহায্যে, কখনও বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই—তাই, ওই ছন্দের ধ্বনি-সঙ্গীত উপভোগ করিবার কালে, তাঁহার কান কিছুক্ষণের জন্যও ইংরেজী বাক্যরীতি বা বাক্যার্থ, এমন কি, শব্দের অন্বয় পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া, কেবল ধ্বনিটিকে মাত্র গ্রাহ্য করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার অবকাশ পরে ঘটিবে, এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু বলিব; ইংরেজী অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দে ছন্দান্তরিত হইল কোন্ মন্ত্রে, এখানে তাহার একটু আভাস দিব।

বাংলা অমিত্রাক্ষরের ভিত্তি যেমন পয়ার, তেমনই মিল্‌টনের ছন্দের ভিত্তিও —ইংরেজী পয়ার—Heroic Verse বা Iambic Pentameter। মিল্‌টন ইহাকেই অবলম্বন করিয়া, এবং ইহাকে যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়া, তাঁহার অমিত্রাক্ষর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কানে এই ইংরেজী পয়ারের ধ্বনি কি ভাবে ধরা দেওয়া সম্ভব, তাহা দেখাইবার জন্য, আমি, একেবারে মিল্‌টনের ছন্দে না গিয়া, একটি খাঁটি Heroic Verse-এর চরণ লইব, যথা—

The curfew tolls the knell of parting day

এই চরণটির ছন্দ-ব্যাকরণ এইরূপ—

The cúr—few tólls—| the knéll—of pár—ting dáy

মিল্টনের ছন্দ যাহার পড়া অভ্যাস হইয়াছে তাহার কানে, এই পংক্তিটির ছন্দধ্বনি অনায়াসে এইরূপ শুনিতে হইবে—

The ″curfew—tóils | the kn″ell—of p″arting dáy

—অর্থাৎ, পদভাগ ঠিক রহিল, কেবল পর্ব্ব বা foot-এর পরিবর্ত্তে ওই পদভাগের মধ্যে বিভিন্ন আয়তনের পদচ্ছেদ মাত্র দেখা দিল। এখানে মাত্র চারিটি পদচ্ছেদ আছে (অন্যত্র বেশি থাকিতে পারে), এবং চারিটি বড় stress আছে। ইংরেজী ছন্দের এইরূপ শ্রুতি-গুণ নির্ণয় করিয়া, এবং কানে কেবল তাহাই রক্ষা করিয়া, বাংলায় তাহার অনুরূপ ধ্বনি সৃষ্টি করা যে দুরূহ নয়, তাহা আমরা পরে দেখিব। ইহাতে যেমন পর্ব্বের গোলযোগ আর থাকে না, তেমনই ছন্দস্পন্দরীতিরও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। ছন্দস্পন্দ বা Rhythm-এর কথাও পরে বলিব। তৎপূর্ব্বে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-রচনার প্রয়াসের একটু ইতিহাস দিব।

মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটকের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে কতকগুলি পংক্তি রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটকে এই পংক্তিগুলি আছে—

জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মন্থনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর, পরদুঃখে সদা আমি সুখী।

এখানে কবির একমাত্র লক্ষ্য—ভাষায় কথ্যভঙ্গিকে, এবং ছন্দে বাক্যরীতিকে প্রাধান্য দিয়া তদনুযায়ী যতিস্থাপন। কিন্তু এই প্রথম প্রয়াস প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে; মিলের পরিবর্ত্তে ছন্দস্পন্দ নাই—সেজন্য নূতনতর যতিবিন্যাসের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। রচনা প্রায় গদ্য হইয়া উঠিয়াছে—ওই 'জন্মিয়াছিল' ক্রিয়াপদটি সে পক্ষে কম বিপদজনক হয় নাই।

ইহার পর, 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র এই পঙ্ক্তিগুলিতে মধুসূদনের ছন্দ-সাধনা আর এক স্তরে উঠিয়াছে। যথা—

আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি' দুই পাশে তিমির তরঙ্গে
উঠিলা অম্বরপথে, কিংবা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্ররথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।

* * *

এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?
কেমনে, কহ, মা শ্বেতকমলবাসিনী!
কেমনে মানব আমি চাব ওর পানে?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি! কে পারে চাহিতে?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।

—এখানে তেমন ছন্দস্পন্দ, অথবা পদমধ্যস্থ বিরাম-যতির কৌশল না থাকিলেও —মিলের অভাব আর একটা বস্তুর দ্বারা পূরণ হইয়াছে; নিপুণ শব্দযোজনার জন্য পংক্তিগুলির সুরঝঙ্কারে একটি সুললিত কাব্যচ্ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে; অর্থাৎ, ইহাই বাংলা কবিতার প্রথম Lyrical Blank Verse; এখানে speech-rhythim-এর পন্থা ত্যাগ করিয়াই কবি কতকটা সাফল্যলাভ করিয়াছেন। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে ইহাই প্রমাণ হইল যে, মিল ত্যাগ করিয়াও বাংলায় ছন্দসঙ্গীত সম্ভব। কিন্তু এ অমিত্রাক্ষর Epic নয়—Lyric-এর উপযোগী; ইহাতে ভাবের সুরই আছে—প্রাণের সর্ব্ববিধ অনুভূতি ও আকুতির বিচিত্র কণ্ঠস্বর-সঙ্গীত নাই। তথাপি, ইহাই প্রথম খাঁটি মিলহীন বাংলা কাব্যচ্ছন্দ—ইহাতেই কবি-মধুসূদনের জন্ম হইল। আজ এতকাল পরেও, যখন এইরূপ পংক্তিপর্ব্ব পাঠ করি, এবং ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা ছন্দের তুলনা করি, তখন বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারি না। এই Lyric Blank Verse-ই পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে অপূর্ব্ব গীতিঝঙ্কার লাভ করিয়াছে। তথাপি, ইহার ছন্দগতিতে যে যতি-সংযম আছে—ইহার সুপরিমিত পদক্ষেপে যে একটি ধীর মাধুর্য্য আছে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দে তাহা

নাই; তাহার কারণ, দুই কবির প্রকৃতিই স্বতন্ত্র—একজনের প্রকৃতি ক্লাসিক্যাল, অপরের রোমাণ্টিক।

কিন্তু মধুসূদন শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, গীতিসুরপ্রধান অমিত্রাক্ষর তাঁহার কাম্য নহে। 'তিলোত্তমা' তাঁহার প্রথম কাব্য, এখানে তিনি নিছক কাব্যপ্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া, ছন্দের মত, কল্পনারও একটা মুক্তি-সুখ আস্বাদন করিতে ব্যাকুল। ছন্দকে এই পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া তিনি সহসা মহাকাব্য-রচনার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিলেন—দুঃসাহস বাড়িয়া গেল। কিন্তু পুরানো পয়ারের সেই লিরিক প্রবৃত্তিকে এইরূপ প্রশ্রয় দিয়া মহাকাব্যের ছন্দ সৃষ্টি করা যাইবে না—তাই তিনি মিল্‌টনের ছন্দধ্বনি বাংলায় প্রতিধ্বনিত করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে ইংরেজী ছন্দটিকে বাংলায় ধরিবার একটা সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়াছি——একটা স্থূল সাদৃশ্য-বোধ যে সম্ভব, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু আসল সমস্যা ওই ঝোঁকগুলি। সেইরূপ ঝোঁকের আভাস ইতিপূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের পয়ারে দেখা দিলেও—রীতিমত rhythmical accent হিসাবে তাহার পরীক্ষা তখনও হয় নাই। বাংলা উচ্চারণ-রীতিতে, শব্দ বা বাক্যাংশের আদ্য-অক্ষরে যেটুকু ঝোঁক পড়ে, তাহাও এই ছন্দের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ছড়ার ছন্দে, আদ্য-অক্ষরে যে ধরণের স্বরবৃদ্ধি হয়, তাহা দ্বারাও ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য-বিধান অসম্ভব; তাহাতে ছন্দ একরূপ স্পন্দিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সেই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছন্দের সুরকে কথার অনুকূল করে না। ঈশ্বরগুপ্তের সুরহীন পয়ারও একপ্রকার ছড়ার ছন্দের মত শুনিতে হয়—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে

—ইহার চার-চার পদচ্ছেদ লক্ষণীয়, এবং ইহাও পড়িবার সময়ে প্রতি পর্ব্বের আদ্য-অক্ষরে একটু ঝোঁক দিলে ভাল হয়; ইহাও যেন—

এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন এক কন্যা খান

—এইরূপ ছড়ার খুব নিকট-জ্ঞাতি। এইরূপ ছক-কাটা ছন্দ, ও নিয়মিত ঝোঁক 'অমিত্রাক্ষরের পক্ষে যে অচল, তাহার প্রমাণ—মিল্‌টনের ছন্দেও ইংরেজী Iambic foot-এর ঘন ঘন নিয়ম-লঙ্ঘন। মধুসূদনের কান বোধ হয় প্রথম হইতেই এই তত্ত্বটিকে আভাসে বুঝিয়া লইয়াছিল। বাংলা ছন্দে একটু ঝোঁকের

অবকাশ আছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র আন্ত-অক্ষরের ঝোঁক। তথাপি সেই ঝোঁকের বলেই শব্দগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পদচ্ছেদের সৃষ্টি করে। এই পদচ্ছেদ অনুসারেই ঝোঁকগুলির স্থান-সন্নিবেশ হইলে, ছন্দ প্রকৃত অমিত্রাক্ষর-গুণোপেত হইতে পারিবে—ভাব-অর্থের বিচিত্র ধ্বনিময় অভিব্যক্তিকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, এই ধারণা তাঁহার মনে উদয় হইতে বিলম্ব হয় নাই। তথাপি 'তিলোত্তমা'র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'মেঘনাদে'র মেঘনির্ঘোষ ধ্বনিয়া উঠা বিস্ময়কর বটে; ইহাতে প্রমাণ হয়, মধুস্দনের প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব দ্রুত হইয়াছিল; অর্থাৎ যে অসাধারণ শ্রম-শক্তিকে প্রতিভার প্রধান লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, এই অল্প সময়টুকুতে মধুস্দনের ভিতরে সেই শক্তির পূর্ণ ক্রিয়া চলিতেছিল। তিনি যে, এই সময়ে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ভাষা, এবং ভারতচন্দ্রের পয়ার, এই দুইয়ের সহিত কানের ও মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে-ছিলেন, তাহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ছন্দের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষারও আবির্ভাব হয়; তাই, খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি আরও ভাল করিয়া আয়ত্ত করার পর, তিনি সেই পদ্ধতিতেই প্রচুর পরিমাণে সাধু সংস্কৃত শব্দ যোজনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন—মিল্‌টনের কাব্যের ধ্বনিবৈভবও যে কেন খাঁটি Saxon ইংরেজীর দ্বারা সম্ভব হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন। 'তিলোত্তমা'র যে পংক্তিগুলি আমি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা বাংলা কাব্যভাষার উপর মধুস্দনের অসাধারণ অধিকারের সাক্ষ্য দিতেছে। সে ভাষা যেমন খাঁটি বাংলা ভাষা, তেমনই তাহাতে যে নূতন ছন্দধ্বনি যুক্ত হইয়াছে, তাহার রূপটিই নূতন—মূল প্রকৃতি নূতন নয়। ইহার পর, এই ভাষারই বাগ্‌বৈভব—তথা ধ্বনিগৌরব—বৃদ্ধি করিয়া, মধুস্দন যে কাব্যসঙ্গীত সৃষ্টি করিলেন, তাহারও মূলে রহিয়াছে সেই খাঁটি বাংলা বাচন-ভঙ্গি ও বাক্যরীতি; এতবড় কাব্যচ্ছন্দ—এমন সুমহান সঙ্গীত-রব সহজ ও স্বাভাবিক বাক্যচ্ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইল! এইবার আমি মধুস্দনের অমিত্রাক্ষরের ধ্বনিকৌশল যতদূর সম্ভব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

পঞ্চম অধ্যায়

মেঘনাদবধ-কাব্যের অমিত্রাক্ষর, পুরাতন পয়ার-ছন্দের রূপান্তর, মাত্রা, অক্ষর, ও ঝোঁক, মিল্‌টনের নিকটে মধুসূদনের ঋণ।

আমি পূর্ব্বে পয়ার ছন্দের যে ক্রমবিবর্ত্তন দেখাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত চার অক্ষরের পদচ্ছেদ প্রকট বা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—ইহাই ছন্দের সেই আদি প্রবৃত্তির জের ; এইরূপ চারের ছক-কাটা, এবং সুরযুক্ত ছিল বলিয়াই, পয়ারে ভাষার ধ্বনি-রূপটি কখনও আমল পায় নাই। শেষে ভারতচন্দ্রের যুগে আসিয়া বাংলা শব্দগুলির পৃথক ধ্বনিমূর্ত্তি এ ছন্দে কিছু কিছু দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে —পদগুলি চারের ছক-কাটা না হইয়া, শব্দের আয়তন অনুসারে ভিন্নতর ছেদের সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, রচনা গীতিপ্রধান না হইয়া—বর্ণনা, বিবৃতি ও চিত্রপ্রধান হওয়ায়, এবং তজ্জন্য ভাব-অর্থকে মূর্ত্তিমান করা—শব্দ-ভাণ্ডারকে চিত্রকরের বর্ণভাণ্ডে পরিণত করা অত্যাবশ্যক হওয়ায়, ছন্দকেও 'গীতি' হইতে 'কথা'র অভিমুখী হইতে হইয়াছিল ; কবিগণকে—শুধু ছন্দ নয়, শব্দকৌশলের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। এজন্য এখন হইতে ছন্দের মধ্যে ২, ৩, ৫, ৬-অক্ষরের পদচ্ছেদ দেখা দিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কবিতায় ছন্দের উপরে ভাষার কথ্যভঙ্গির প্রভাব আরও বাড়িয়াছে, এবং আবশ্যকমত, একই কবিতায়, পাশাপাশি 'গীতি' ও 'কথা'র সুর স্থান পাইয়াছে, যেমন—

> বসিলা নায়েব বাড়ে নামাইয়া পদ।
> কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
> পাটনি বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
> পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥

ইহার প্রথম দুই পংক্তির গীতিসুর যেমন স্পষ্ট, তেমনই শেষের চরণ দুইটিতে কথার ছন্দই প্রবল। আমার বিশ্বাস, মধুসূদন এ সকলই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অথবা অজ্ঞানে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল শব্দ-অনুযায়ী পদচ্ছেদের ভঙ্গিই নয়, মধুসূদনের প্রয়োজন আরও বেশি। নূতন বাংলা-গদ্য হইতেই

মধুসূদন তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির পক্ষে আরও সুস্পষ্ট সঙ্কেত পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেই গদ্যের ভাষাও তাঁহার পরিকল্পিত মহাকাব্যের বাগ্‌বন্ধের প্রায় সমধর্ম্মী।' সেই গদ্যের 'বাক্যবিন্যাসে যে একটা ছন্দের আভাস ছিল, তাহা বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। ইহার সেই বাক্যচ্ছন্দ নির্ভর করে প্রধানত দুইটি বস্তুর উপরে—(১) বাক্যের অঙ্গসন্ধির ছেদগুলি; (২) শব্দবিশেষের উপরে বাক্যরীতি-গত (syntactical) ঝোঁক। মধুসূদন ভারতচন্দ্রের কবিতাও যেমন পড়িয়াছিলেন, তেমনই বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গদ্যরচনাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সামান্য সঙ্কেতগুলি হইতেই তাঁহাকে তাঁহার ছন্দের প্রাথমিক উপকরণ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। 'তিলোত্তমা' হইতে 'মেঘনাদে' পৌঁছিয়া তিনি এই ভাব-অর্থের বাক্যচ্ছন্দকেই পয়ারের কাব্যচ্ছন্দের সহিত মিলাইয়া, অমিত্রাক্ষরের সেই আদি রূপটির একটি বড পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন, তখন—

এ সুন্দর প্রভাকর-পবিধি মাঝারে
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?

—এই গীতিচ্ছন্দের অমিত্রাক্ষর রূপান্তরিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইয়াছে,—

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল, ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা, কিন্তু কোথা পাব,
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

[মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই, একই কারণে, রচনায় কমা সেমিকোলন কিছু বেশি ব্যবহার করিতেন]

উপরের পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে, কেবল ভাব ও অর্থের অনুযায়ী বাক্যচ্ছেদ করিলেই, এ ছন্দ যেন আপনিই চলিতে থাকিবে; অথচ, প্রত্যেক চরণের ছন্দ-যতিও (৮+৬) ক্ষুণ্ণ হইবে না। কিন্তু পড়িবাব সময়ে, নূতন যতিগুলি ছাড়া, আর কি ঘটিতেছে,—পদভাগের মধ্যে ভিন্নতর বিরাম-স্থানই শুধু নয়, পদচ্ছেদ-গুলি কি করিয়া হইতেছে, তাহা আমরা সব সময়ে লক্ষ্য করি না; কিন্তু কবির সেদিকে বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি ছিল। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে যে

একটি কৌতুককর সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা সত্যই মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার কাব্য পাঠ করিবার সময়ে, ধীরে ধীরে প্রত্যেক শব্দটির পৃথক উচ্চারণ করিতেন—তাই, তাঁহার পাঠভঙ্গি বড়ই অদ্ভুত বোধ হইত। আমার মনে হয়, ইহা মধুসূদনের কাব্যপাঠ নয়—ছন্দপাঠের বর্ণনা; কবি তখন নূতন ছন্দটিকেই তাঁহার শ্রোতৃবর্গের কানে ভাল করিয়া ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন—মিলহীন চরণগুলিকে স্পন্দিত করিবার রীতিটি বুঝাইবার জন্যই ওইরূপ করিয়া পড়িতেন। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে, আমরাও —ততটা না হইলেও—কতকটা সেইরূপ করিয়াই পড়ি; অথচ পড়িবার সময়ে তাহা লক্ষ্য করি না; যথা—

গাঁথিব—নূতন মালা,—তুলি—সযতনে
তব—কাব্যোদ্যানে—ফুল,—ইচ্ছা—সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে—ভাষা,—কিন্তু—কোথা পাব,
দীন আমি!—রত্নরাজী?—তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর?—কৃপা—প্রভু—কর—অকিঞ্চনে।

উপরে যে ছেদগুলি দেখাইয়াছি, তাহা পদচ্ছেদ মাত্র; কারণ, ওই ছেদগুলি, প্রত্যেক শব্দের আদ্য-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে, তাহারই অনুযায়ী; শব্দও সর্ব্বত্র একক নহে, সমাস বা অন্বয়ের ফলে তাহা যুক্ত হইতেও পারে। তথাপি, এইরূপ পদচ্ছেদ হইতেই বাংলায় ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে—সেখানে ঝোঁকগুলি আরও প্রবল বলিয়া ছেদগুলিও অন্যরূপ হইয়া থাকে, যথা—

গাঁথিব—নূতন মালা তুলি—সযতনে
তব—কাব্যোদ্যানে—ফুল, ইচ্ছা—সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে—ভাষা; কিন্তু—কোথা পাব,
(দীন আমি!)—রত্নরাজী,—তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর?—কৃপা, প্রভু, কর—অকিঞ্চনে।

উপরে উচ্চারণগত ছোট ঝোঁকগুলি বাদ দিয়া—বাক্যরীতিগত (syntactical) বড় ঝোঁকগুলিই দেখাইয়াছি। এইরূপ ঝোঁকের ঠিক আগেই একটি করিয়া ছেদ পড়িতেছে—পদচ্ছেদও সেই ভাবে হইতেছে। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলিব।

মধুসূদনের ছন্দের rhythm বা ছন্দস্পন্দের প্রাথমিক পরিচয় এই পর্য্যন্ত। এক্ষণে আমাকে বাংলা পয়ারের প্রকৃতি, ও তাহাতে এই ঝোঁকের স্থান এবং মূল্য সম্বন্ধে, পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

'মাত্রা' (Quantity), 'অক্ষর' (Syllable) এবং ঝোঁক বা 'স্বরবৃদ্ধি' (Stress, Accent)—ইহাদের কোন-একটা, ছন্দের unit বা পরিমাপক হিসাবে, ক্ষুদ্রতম অংশের কাজ করিয়া থাকে। আমাদের বাংলা ছন্দে 'অক্ষর' যে সেই কাজ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজীতে যাহাকে syllable বলে, আমাদের অক্ষর তাহাই; যদিও গুণ ও ক্রিয়াহিসাবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এই অক্ষরের নাম—'বর্ণ'। অক্ষর যে-ছন্দের unit বা মাত্রা (এখানে 'মাত্রা' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি), তাহাতে অক্ষরসংখ্যা কম-বেশি হইবার জো নাই। সংস্কৃত ছন্দও মূলে অক্ষর-মাত্রিক; Rhythm বা ছন্দ-তরঙ্গের জন্য অক্ষরের গুরু-লঘু গুণভেদ, এবং ছন্দে তাহার স্থান যেমনই হউক,—ওই অক্ষরের সংখ্যা সর্ব্বদা ঠিক থাকা চাই। কিন্তু পরে, এই অক্ষর-মাত্রা—যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব-বর্ণ এবং দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণের প্রভাব স্বীকার করিয়া—আর এক প্রকার ছন্দের উদ্ভব করিয়াছে; সংস্কৃতে ইহাকে 'জাতি ছন্দ' বলে। প্রথমে প্রাকৃত বা ভগ্ন-সংস্কৃত ভাষার কাব্যেই সম্ভবত এইরূপ মাত্রাবৃদ্ধিও ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং শেষে সংস্কৃতেও সেই ছন্দ চলিত হইয়াছিল—সে ইতিহাস আমার জানা নাই; কেবল ইহাই দেখিতেছি যে, বৈদিক ভাষার ছন্দ যেমনই হউক, খাঁটি সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত ছিল; এইরূপ Quantity তাহার পরিমাপক ছিল না। বাংলার প্রাকৃত গোত্র-বংশে আদিতে তাহার ছন্দও ওইরূপ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি—পরে মাত্রার প্রভাবমুক্ত হইয়া আমাদের ছন্দ খাঁটি বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরসংখ্যামূলক হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সংস্কৃত বা অন্য ছন্দের মত তাহাতে ছন্দস্পন্দের কোন উপকরণ রহিল না—

অক্ষরগুলি যেমন সম-মাত্রার, তেমনই তাহারা মাত্রাগুণবর্জ্জিত। এরূপ ছন্দ, গানে ভিন্ন কবিতায় চলে না। প্রত্যেক অক্ষরকে স্বরান্ত করিয়া একটা কাল-পরিমিত, যতিযুক্ত চরণ, এবং তাহার বিশিষ্ট ছাঁদটির পুনরাবর্ত্তন—ইহাই এই ছন্দের প্রকৃতি। মাত্রা যেমন ইহার উপাদান নয়, তেমনই Stress বা স্বরবৃদ্ধি এ ছন্দের কোনরূপ সহায় নয়। ইংরেজী ছন্দে অক্ষর বা Syllable-এর একটা হিসাব থাকিলেও, তাহা Stress-প্রধান; সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত হইলেও, তাহাতে অক্ষরের মাত্রা-গুণ ছন্দের একটা বড় সহায় হইয়া আছে। আমাদের প্রাচীন বাংলা ছন্দে ওই বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু আমি পূর্ব্বে পদভূমক ছন্দকে —অর্থাৎ, এই জাতীয় বনিয়াদী বাংলা ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, আধুনিক পয়ার-জাতীয় ছন্দ যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বর্ণেরও একরূপ মাত্রা গুণ স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা ছন্দেরই প্রয়োজনে—ছন্দস্পন্দের নয়। আমরা এখন হসন্তবর্ণকে স্বরান্ত করিয়া পড়ি না, অথচ তাহাকেও একটা পূরা unit হিসাবে গণ্য করি; এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে—পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বৃদ্ধি করিয়া। যেমন—

সম্মুখ সময়ে পড়ি বীর-চূড়ামণি

ইহার 'সম্‌মুখ' যেমন চার অক্ষর নয়—তিন অক্ষর, তেমনই 'বীর'ও এক অক্ষর না হইয়া দুই অক্ষর। যুক্ত-অক্ষরটির কথা ছাড়িয়া দিলাম; হসন্ত বর্ণটিকেও একটি পূরা unit ধরিতে হয়, এবং সেজন্য পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বা মাত্রা একটু বাড়াইয়া লওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আধুনিক পয়ার-জাতীয় ছন্দে, বর্ণসংখ্যার উপরে আর একটা বস্তুর যোগ হইয়াছে; ইহাকেই আমি একরূপ 'Quantity' বা মাত্রা-স্থানীয় করিয়া এ ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, রহস্য এমনই যে, উহাও ঠিক মাত্রাবৃদ্ধি নয়, অর্থাৎ, ঐ পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বৃদ্ধির দ্বারাই ছন্দরক্ষা হইতেছে না—হসন্তবর্ণটিকেও ঠিক ওই স্থানে চাই; এই মাত্রাবৃদ্ধির দ্বারা তাহারই মাত্রার অপূর্ণতাটুকু কোনরূপে পূরণ করা হইতেছে; প্রমাণ—

কাশীরাম্ দাস্ কহে—

এই পদটির হসন্তবর্ণ দুইটি উঠাইয়া দিয়া, কেবল তাহার পূর্ব্ব-বর্ণ 'রা' ও 'দা'-এর মাত্রা বৃদ্ধি করিলে—একটু টানিয়া পড়িলে—ছন্দই নষ্ট হইয়া যাইবে; ওইরূপ

দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা ছন্দের স্বভাববিরুদ্ধ! ওই 'দা' ও 'রা'র পরে হসন্তবর্ণের স্থানটি লোপ পাইলে চলিবে না। বাংলার এই ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিবার আরও কারণ এই যে, পদভূমক ছন্দে মাত্রার বিশেষ লক্ষণ না থাকিলেও সাধুভাষার ওই বনিয়াদী ছন্দেই তাহার প্রাচীন মাত্রাধর্ম্ম যে এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ, ওই ভাষার ধ্বনি হইতেই আধুনিক পর্ব্বভূমক ছন্দের জন্ম হইয়াছে; এবং তাহাতে মাত্রাবৃত্তের স্পষ্ট আমেজ রহিয়াছে।

এইবার এই খাঁটি বর্ণবৃত্তের বর্ণবিন্যাসে rhythm কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাই বলিব। আমাদের উচ্চারণে, শব্দ বা বাক্যাংশের (phrase) আত্ত-অক্ষরে একটু ঝোঁক পড়ে, সে কথা বলিয়াছি। আবার হসন্তবর্ণের জন্য পূর্ব্ব-অক্ষরে যে একটু মাত্রাবৃদ্ধি হয়, তাহাও দেখিয়াছি। এই দুইটির সাহায্যে, বাংলা ছন্দে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করার উপায় পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তথাপি, এপর্য্যন্ত বাংলা কবিতার ছন্দে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরভঙ্গি প্রশ্রয় পায় নাই—যেন প্রাণের ভাষা কাব্য-ছন্দে ছন্দিত হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙালীর প্রাণ যে মুক্তিকামনার আবেগে স্পন্দিত হইয়াছিল—ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে সে অধীর হইয়াছিল—সেই Romantic ভাবোৎসারের ফলে, আর সকল আন্দোলনের মত, কাব্যের আদর্শ-সন্ধানে যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল—মধুসূদন তাহারই প্রথম ও প্রধান নেতা; তিনিই, ভাষার পরেই যে বস্তুর সহিত কবিতার ভাবগত যোগ অতিশয় গভীর, সেই ছন্দকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাক্যরীতি ও উচ্চারণরীতির সহিত যুক্ত করিলেন; তাহাতে সেই পুরাতন অক্ষর, বা স্বরান্ত বর্ণ, তাহার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই, নূতন গুণ-সমৃদ্ধি লাভ করিল—বাংলা বর্ণবৃত্ত সত্যকার ছন্দ-গৌরবের অধিকারী হইল; অক্ষরগুলি পূর্ব্বের মতই পায়ে পায়ে ঠিক চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মাথা শস্যশীর্ষের মত দুলিতে আরম্ভ করিল—আমাদের বর্ণবৃত্তেও অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ছন্দকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল। এখনও বর্ণ ই ছন্দের পরিমাপক unit হইয়া আছে, কিন্তু অতঃপর Syllable-এর সহিত স্বরবৃদ্ধিও যুক্ত হইল; দীর্ঘস্বর-জনিত মাত্রার (Quantity) কথা পরে বলিব।

কিন্তু ইংরেজী ছন্দের মত আমাদের ছন্দে এই স্বরবৃদ্ধি (accent) প্রাধান্য লাভ করে নাই—তাহার দ্বারা বর্ণের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বাংলায় ওই স্বর-

বৃদ্ধির এমন শক্তি নাই, যাহাতে অক্ষর-পরিমাণকে গৌণ করিয়া, ওই স্বর-বৃদ্ধির নিয়মিত বিন্যাসই ছন্দকে ধারণ করিতে পারে। বর্ণের এই প্রাধান্য হেতু আমাদের ছন্দে—ধীর, দ্রুত, মন্থর—কত প্রকার লয় যে সম্ভব হইয়াছে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ভাল করিয়া পড়িতে জানিলে, তাহা লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। নিয়মিত গুরু-লঘু বর্ণপরম্পরার উপরে নির্ভর করে না বলিয়া এ ছন্দে কণ্ঠস্বরাশ্রিত ভাবের এমন লীলা সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত গণ-মুক্ত অক্ষরবৃত্তেও এই কারণে কাব্যের ভাবরূপ এমন সজীবতা লাভ করে। বর্ণ বা অক্ষর, এবং এই স্বরবৃদ্ধি—এই দুইয়েরই সংযোগে মধুসূদনের ছন্দ এইরূপ সজীব ও শক্তিশালী হইয়াছে। অতএব মিল্‌টন যে উপাদান ও উপকরণ হইতে এমন অপূর্ব্ব ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন—'Syllable', 'Accent' এবং 'Quantity'—এ সকলকেই ছন্দ-রাসায়নিক যাদুকরের মত তিনি যেরূপ মিলাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে মধুসূদনের কেবল ওই Syllable-এর সুবিধাই ছিল, অপর সুবিধাগুলি নিজেই করিয়া লইতে হইয়াছিল, মিল্‌টনের কেবল Stress-এর সুবিধাই ছিল, অপরগুলিও তিনি নিজের শক্তিবলে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। মধুসূদনের ওই Stress, Accent বা Quantity-র সুযোগ ছিল না—বাংলার পক্ষে সে সুযোগ করিয়া লওয়া একরূপ দৈবশক্তি-সাপেক্ষই বটে। কোথায় সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের সেই স্বরতরঙ্গলীলা—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অথবা—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি। বিশন্তি যদ যতয়ো বীতরাগা,

[সংস্কৃত ছন্দেও স্বরবৃদ্ধি একজাতীয় নয় বলিয়া দুই রকমের চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি।]

—আর কোথায় বা সেই বর্ণমাত্রসম্বল নিস্তরঙ্গ পুরানো পয়ার—

রতনরঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস গতি যেন নূপুরের রব।

মধুসূদনের কানে অবশ্য সংস্কৃত অনুষ্টুভের বাজনা বাজে নাই—তাঁহার কানে বাজিতেছিল—

Hail—holy light / offspring—of Heaven—firstborn !

* * *

কিংবা—

Then feed on thoughts that voluntary move

Harmonious numbers, as the wakeful bird

Sings darkling, and in shadiest covert hid

Tunes her nocturnal song.

অথবা—

Bright effluence of bright essence increate

[চিহ্নগুলি ছন্দ-ব্যাকরণের চিহ্ন নয়। প্রত্যেক চরণে যে প্রবল স্বরবৃদ্ধি (stress) আছে তাহার স্থানে (") চিহ্ন, এবং যেখানে ওই স্বরবৃদ্ধিতে দীর্ঘ স্বরমাত্রার বেগ আছে, সেখানে অক্ষরের নিম্নে (—) এই চিহ্ন দিয়াছি।]

সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় সম্ভব নয়, কিন্তু কতকটা এই ধরণের তরঙ্গ বাংলায় যে সম্ভব তাহার কারণ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; এবং ইংরেজী ছন্দের সহিত এই ধ্বনিসাদৃশ্যের সম্ভাব্যতাও পূর্ব্বে উদাহরণসহ উল্লেখ করিয়াছি। উপরে উদ্ধৃত দুই ভাষার কবিতার—একটি বর্ণবৃত্ত, অপরটি একরূপ Accent-বৃত্ত, ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতির জন্য ছন্দই ভিন্নজাতীয়। আসলে, ওই Accent, Syllable এবং Quantity নামগুলির একটা সাধারণ অর্থ থাকিলেও, ভাষাবিশেষে উহাদের প্রত্যেকটির গুণ স্বতন্ত্র। সংস্কৃত syllable এবং ইংরেজী syllable যেমন ব্যাকরণ অনুসারে এক হইলেও, কার্য্যত বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনিরূপ ধারণ করে, তেমনই ইংরেজীর Stress ও সংস্কৃতের স্বরবৃদ্ধি এক নয়—বাংলায়ও নহে। Quantity নামে ছন্দের যে সাধারণ উপাদান বুঝায়—দুই বিভিন্ন ভাষায় সেই Quantity-মূলক ছন্দ একই-রূপ ধ্বনির সৃষ্টি করে না। উপরি-উদ্ধৃত সংস্কৃত ছন্দে যে Syllable এবং যে Stress বা স্বরবৃদ্ধি আছে, ইংরেজীতেও সেই দুই নামের দুই বস্তুই আছে, এমন কি দীর্ঘ-স্বরও যেমন আছে, তেমনই, যে স্বরবৃদ্ধি বা Stress আছে, তাহাও

সংস্কৃতের যুক্তাক্ষর পূর্ব্ব বর্ণের প্রায় সমজাতীয়। তথাপি উভয়ের ছন্দধ্বনিতে আদৌ সাদৃশ্য নাই। বাংলা 'অক্ষর' ও সংস্কৃত 'অক্ষর' এক হইলেও, বাংলা পয়ারে যুক্ত বা অযুক্ত হসন্তের ব্যবহার একটু বিচিত্র বলিয়া, অক্ষরের ধ্বনিধর্ম্ম সম্পূর্ণ এক নহে। আবার ইংরেজীর সহিত বাংলা অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উহাদের ওজনে কত পার্থক্য রহিয়াছে। ইংরেজী Syllable এর শোষণ শক্তি বাংলা অক্ষরের নাই, বাংলা 'সম্মুখ'-এর 'সম্' যদি এক অক্ষরও হয়, তথাপি তাহা ইংরেজী এক অক্ষর Heaven (Heav'n) এর সমান নয়, বাংলা 'কবি'র দুই অক্ষর ইংরেজী 'holy'র দুই অক্ষরের সমান হইলেও, 'offspring'-এর সমান নয়। তথাপি মধুসূদন যে বাংলা অমিত্রাক্ষর রচনায় মুখ্যত ইংরাজীর সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার কারণ, মিল্‌টনের ছন্দ ইংরেজী ছন্দ হইলেও, তাহার মধ্যেই মহাকবি যে সঙ্গীত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার সেই উদারতর নীতি যেন ভাষার নিজস্ব ধ্বনিকে 'অবলম্বন করিয়াও, অতিক্রম করিয়াছে, তাই, অপর একটি ভাষাতেও সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল, সে যেন ছন্দেরই প্রতিচ্ছন্দ নয়—সেই সঙ্গীতেরই একটা প্রতিরূপ। মিল্‌টনের ছন্দ মধুসূদনের কানে কিরূপ বাজিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, ইংরেজী Iambic Pentameter-এর বাঁধা foot, এবং নিয়মিত ছোট-বড় ঝোঁক (accent)-এর দিকে দৃষ্টি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা না হইলে, মধুসূদন ইংরেজী ছন্দের বন্ধন হইতে ওই সঙ্গীতধ্বনিকে পৃথক করিয়া, বাংলায় প্রতিধ্বনিত করিতে পারিতেন না। ইংরেজী অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

"The lack of fixed syllabic quantities is just what I emphasise This lack makes definite beat impossible, or at least it makes it absurd to scan English verse by feet

এবং—

"If the student has a good ear he reads the verses as it was meant to be read, as a succession of musical bars (with pitch of course), in which the accent marks the rhythm, and pauses and rests often take the place of missing syllables"

মধুসূদনের বাংলা ছন্দের পক্ষে, ওই 'definite beat impossible' কথাটি বড়ই কাজে লাগিয়াছিল, 'succession of musical bars with pitch of course' তাঁহার কানকে তৈয়ারি করিয়াছিল, এবং বাংলা পয়ারের (৮+৬) পদভাগের succession তাহারই কতকটা উপযোগী হইয়াছিল। কেবল 'missing syllable'-এর স্থান পূরণ আর কিছু দ্বারা সম্ভব ছিল না—বাংলা বর্ণবৃত্ত তাহা সহ্য করিতে পারে না; তাই মধুসূদনের ছন্দের লয় আরও সংযত ও ধীর-মন্থর—সে ততটা মুক্তপক্ষ নয়। এইবার আমি মধুসূদনের পংক্তিগুলির ধ্বনিনির্মাণ-কৌশলের বিশেষ পরিচয় দিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অমিত্রাক্ষরের Rhythm বা ছন্দস্পন্দ

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের stress-গুলিকে আমি স্বরবৃদ্ধি বলিব, যদিও সাধারণ অর্থে আমি 'ঝোঁক' শব্দটিই ব্যবহার করিতেছি। আমাদের উচ্চারণে সর্ব্বদা আদ্য-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে তাহা এমন নয় যে, তাহার দ্বারা ছন্দস্পন্দনের কাজ চলিতে পারে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পর্ব্বভূমক ছন্দে এই ঝোঁকের উপরেই একটু জোর দিয়া তাহাকে rhythmical accent করিয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু, আমি যাহাকে স্বর-বিস্ফোরণ বলিয়াছি ('বাংলা ছন্দ'-বিষয়ক পূর্ব্ব প্রবন্ধে)—এ ঝোঁক সেই ছড়ার ছন্দের ঝোঁকগুলির মত প্রবল নয়; সেরূপ ধাক্কা দিয়া পড়িলে, ছন্দ সাধুভাষার ধ্বনি-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া যেন ব্যঙ্গ করিতে থাকিবে। এই ঝোঁকগুলি মধুসূদনের ছন্দের কেবল এইটুকু উপকার করিয়াছে যে, সেই ঈষৎ-স্পৃষ্ট বর্ণগুলি চরণের ধ্বনি-প্রবাহকে একেবারে সমতল হইতে দেয় নাই। এগুলিকে স্ফুটতর করিবার জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তিনি শব্দগুলিতে যে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ভাষা ও শব্দের উপরে তাঁহার কবিজনোচিত অধিকার ও আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির উপরেই নির্ভর করিয়া, আর কেহ এমন ছন্দসৃষ্টির কৌশল করেন নাই। এই ঝোঁকগুলির মর্ম্ম—তাহাদের বৃদ্ধির তারতম্য, সংখ্যা, ও সজ্জা-কৌশল—তিনি মিল্টনের ছন্দ হইতেই উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। মধুসূদনের ছন্দে আমরা এই ঝোঁকগুলির যে নিয়ম লক্ষ্য করিব, মিল্টনের ছন্দেও ঠিক সেইরূপ; সে সম্বন্ধে একজন ছন্দোবিদ্ যাহা বলিয়াছেন, এ প্রসঙ্গের ভূমিকা-স্বরূপ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

"Nor should it be forgotten that the 'sense' of words, their meaning weight, their rhetorical value in certain phrases, constantly affects the theoretical number of stresses belonging to a given line; in blank verse, for instance, the theoretical five stresses are often but three or four in actual practice, lighter stresses taking their place in order to avoid a pounding monotony."

আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর চরণের যে পরিচয় এক্ষণে দিব, তাহার মূলতত্ত্ব এই কথাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। এইবার আমি, এই ঝোঁকগুলির পরিচয় গোড়া হইতেই দিব।—

(১) মাত্র পদচ্ছেদ—ও তজ্জনিত ঝোঁক; চরণ মধ্যে তাহাদের ন্যূনতম ও অধিকতম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

জন্মভূমি রক্ষাহেতু | কে ডরে মরিতে?

যে ডরে ভীরু সে মূঢ় | শত ধিক তারে!

নতুবা এসেছি মিছে | সাগর বাঁধিয়া

এ কনক-লঙ্কাপুরে | কহিনু তোমারে।

দানব মানব দেব | কার সাধ্য হেন,

ত্রাণিবে সৌমিত্রি তোরে | রাবণ রুষিলে?

[৮+৬-ভাগের চৌদ্দ অক্ষরে ন্যূনতম পদচ্ছেদের সংখ্যা—চার, অধিকতম সংখ্যা, ছয়। এইরূপ পদচ্ছেদ যে পর্ব্ব বা foot নয়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শব্দের আয়তন ও স্বাভাবিক উচ্চারণরীতির ফলে যেখানে যে কয়টি ঝোঁক পড়িতে পারে—ইহা কেবল তাহারই একটা হিসাব। প্রবল ঝোঁক বা 'beat'-এর সাহায্যে, আমাদের ভাষায় 'bar' বা অমিত্রাক্ষর 'foot' যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন পুঁথির লিপিদোষ, অথবা কবিদেরই অক্ষমতা, কিংবা ছন্দে সুর-সংযোগের ফলে, যে সকল অনিয়ম প্রাচীন বাংলা ছন্দে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ছন্দপদ্ধতির লক্ষণ নয়। মাথার ঐ চিহ্নগুলি ঝোঁক-চিহ্ন নয়—ছেদ-চিহ্ন।]

(২) ঝোঁকগুলি প্রধান ও অপ্রধান-ভেদে ছন্দকে কিরূপ স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই দ্রষ্টব্য।

হে রাঘবকুল—চূড়া! তব কুলবধূ

রাখে বাঁধি—পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে

হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব

এ শয়ন ?—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু—

* * *

তোমর, তোমর, শূল, মুষল মুদ্গার,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !

নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি—মহাবল রহিলা ভূতলে !

* * *

নীরব—রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী

[প্রধান ঝোঁকের সংখ্যা সাধারণতঃ দুই বা তিনটি, তৎসহ একাধিক অপ্রধান ঝোঁক—ছন্দ-স্পন্দের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু চরণের মধ্যে শব্দের উপরে পৃথক ঝোঁকের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে ছন্দের ধ্বনিগৌরব বৃদ্ধি হয় এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটে।]

(৩) ঝোঁকগুলি প্রায় সমান, বিশেষ বড় ঝোঁক নাই—চরণমধ্যে সমাস-বদ্ধ দীর্ঘ পদের জন্যই এরূপ ঘটে ; অথবা, কেবল পদচ্ছেদের ঝোঁকগুলির দ্বারাই ছন্দ স্পন্দিত হইয়া থাকে,—ইহাতে ছন্দে লিরিক সুরের সঞ্চার হয়, যথা—

পিকবর-রব—নব—পল্লব-মাঝারে

—কুসুমবন-জনিত—পরিমল-সখা
সমীর, জুড়ায় কাণ শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব—জনরব-সহ—

—যথা জলতলে

কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতে ছিলা—

(৪) বাংলা উচ্চারণরীতির সাহায্যে চরণমধ্যে কয়েকটি ঝোঁক আমদানি করা সম্ভব হইলেও, তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব কত অসমান, তাহাও লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ, পদচ্ছেদের আয়তন দুই হইতে পাঁচ অক্ষর তো হয়ই; তাহার উপর, যদি সমাসের উপদ্রব থাকে, তবে ছয় অক্ষর পর্য্যন্ত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে, অন্তত চরণের সেই অংশে, বর্ণবৃত্তের বর্ণধ্বনিই ছন্দের লয়কে দ্রুততর করিয়া সুরের বৈচিত্র্যবিধান করে, যথা—

নয়ন-রঞ্জন—কাঞ্চী | কৃশ—কটিদেশে
*   *   *

বননিবাসিনী—দাসী | নমে—রাজপদে
*   ।   *

দৈত্যকুলদল—ইন্দ্রে | দমিনু সংগ্রামে
*   *   *

মুছ—অশ্রুবারিধারা | দাশরথি রথি

[এরূপ স্থলে, syllable ও accent দুইয়ে মিলিয়া ছন্দ-সঙ্গীত বৃদ্ধি করিতেছে।]

(৫) বড় ঝোঁকগুলির অবস্থানগুণে চরণমধ্যে ছন্দতরঙ্গের উত্থান-পতন নানা রকমের হইয়া থাকে। মিল্‌টনের ছন্দে এই তরঙ্গ ক্রম-উর্দ্ধমুখী হইবার যে সুযোগ আছে—বাংলায় তাহা নাই; কারণ আমাদের ছন্দের বর্ণগুলি বড় ঠাসা, এবং পর্ব্বের আভাসমাত্র নাই বলিয়া, ঝোঁকগুলি কোথাও তেমন ধারাক্রমিক হইতে পায় না। এজন্য, মিল্‌টনের চরণের মত—"O Prince, O chief of many-throned powers"—ছন্দতরঙ্গের এই ক্রমিক উচ্চতা (rising rhythm) আমাদের ছন্দে সম্ভব নয়। তথাপি তরঙ্গের নানাবিধ উঠা-নামা মধুসূদনের

ছন্দেও দেখা যায়। কোথাও মধ্যস্থলে উঠিয়া শেষের দিকে নামিয়া গিয়াছে; কোথাও শেষ পর্য্যন্ত উচ্চতা রক্ষা করিয়াছে; কোথাও বা দুই পদভাগেরই আদিতে সমান উচ্চ হওয়ায়, ছন্দটি আর এক ভাবে দুলিয়াছে।—

অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি
* * *
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে
* * *
সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে
* * *
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে।
* * *
মজালে রাক্ষসকুলে মজিলে আপনি!

এ পর্য্যন্ত, আমি ছোট ও বড় 'ঝোঁক' এবং তদ্দ্বারা ছন্দস্পন্দ-(rhythm)-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এইবার সামান্য ঝোঁকগুলিকে জোরালো করিবার উপায় এবং সেগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার যে কৃতিত্ব, সে সম্বন্ধে সবিস্তারে কিছু বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে প্রত্যেক পৃথক শব্দের বা বাক্যাংশের আদ্য-অক্ষরে যে একটু ঝোঁক পড়ে, মধুসূদন তাহা দ্বারাই তাঁহার চরণগুলির rhythm-এর গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু এই ঝোঁকগুলি একটু বৃদ্ধি করিতে না পারিলে ছন্দ রীতিমত তরঙ্গিত হইতে পারে না,—যদিও গীতিস্বরের ছন্দে তাহার দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। অতএব, মিল্টন যেমন ইংরেজী শব্দের মৌলিক (Etymological) accent-কেই সাধারণভাবে কাজে লাগাইয়া, তাঁহার অমিত্রাক্ষরের ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করিবার জন্য অন্য উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তেমনই, মধুসূদনও প্রায় সেই কৌশলে ভাষার সেই সামান্য ঝোঁকগুলিকে বাংলা অমিত্রাক্ষরের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রধানত, বাক্যরীতি এবং শব্দের ভাব-অর্থ-ঘটিত গুরুত্ব ('meaning weight', 'rhetorical value')

এই দুইয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্যের ভাষা গদ্যের ভাষা নয় বলিয়া, যে সকল শব্দালঙ্কার সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, তাহাও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছে। আমি এই উপায়গুলির একটি তালিকা দিলাম।

(১) বাক্যরীতির (Syntactical বা Logical) কারণে শব্দবিশেষে স্বরবৃদ্ধি; অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলি প্রধান—তাহারই উপরে স্বাভাবিক ঝোঁক পড়িয়াছে,—

> ″যা কহিলে—″সত্য,—ওহে ″অমাত্য-প্রধান—
>
> ″সারণ!—″জানি হে আমি—″এ ভবমণ্ডল
>
> ″মায়াময়,—″বৃথা এব—″দুঃখ-সুখ যত!
>
> * * *
>
> ″নিশায়—পাইলে ″রক্ষা, ′মারিব—″প্রভাতে।
>
> * * *
>
> এ—″বৃথা গঞ্জনা,—″প্রিয়ে,—″কেন দেহ—′মোরে?
>
> ″গ্রহদোষে—″দোষী-জনে—″কে নিন্দে—″সুন্দরী?

[এই বাক্যরীতিঘটিত উপায়টিই স্বরবৃদ্ধির প্রধান উপায়—এবং সর্ব্বত্র তাহাই দেখা যাইবে। কিন্তু মধুসূদন ইহার মর্ম্ম যেমন বুঝিয়াছিলেন—যে ভাবে Logical accent ও Rhythmical accent-কে তাঁহার ছন্দে এক করিয়া লইয়াছিলেন—তেমনটি তাঁহার পরবর্ত্তী কবিদের কাহারও সাধ্যায়ত্ত হয় নাই, তাহার কারণ, তাঁহারা 'অমিত্রাক্ষর'-ছন্দের কেবল ওই নামটাই বুঝিয়াছিলেন —এ ছন্দের জ্ঞানই তাঁহাদের ছিল না।]

(২) উপরে প্রদর্শিত ওই জাতীয় ঝোঁক ছাড়াও আর একপ্রকার ঝোঁক—যাহাকে বক্তার নিজের ভাব-অনুরূপ কণ্ঠস্বরের জোর (Rhetorical বা Emphatic) বলা হইয়া থাকে, তাহাও এই ছন্দে বড় কাজে লাগিয়াছে। এই ধরণের ঝোঁকই সবচেয়ে বড় ঝোঁক—

> নিশার ″স্বপনসম তোর এ বারতা
>
> রে দূত! ″অমরবৃন্দ ″যার ভুজবলে

কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী

বধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া

কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে!

* * *

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে!

শতপুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি!

* * *

হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে

আনিলে এ কথা তাত, কহ তা' দাসেরে।

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে,

পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি

ধূলায়।

[উপরে আমি কেবল Rhetorical accent-গুলিই চিহ্নিত করিয়াছি—অন্যবিধ ঝোঁকও যথাস্থানে আছে।]

এইবার, কাব্যকলাকৌশল বা শব্দালঙ্কার-ঘটিত ঝোঁকের নমুনা দিব।

(ক) অনুপ্রাস। [অনুপ্রাসের দ্বারা কাব্যভাষার সৌন্দর্য্য এবং ছন্দের যে মাধুরী বৃদ্ধি হয়, সে কথা যথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। কিন্তু মিল্‌টনের ছন্দের মত মধুসূদনের ছন্দকেও এই অনুপ্রাস কতখানি ধারণ করিয়া আছে, তাহাও লক্ষণীয়,—যেখানে শব্দহিসাবে অতি সামান্য ঝোঁক মাত্র পড়ে, সেখানে এই অনুপ্রাস সেই শব্দকে বাজাইয়া ঝোঁকের কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি সাধন করে। 'মেঘনাদে'র ভাষায় প্রায় আগাগোড়া অনুপ্রাসের এমন ছড়াছড়ি যে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মধুসূদন প্রায় প্রত্যেক চরণকে অল্পবিস্তর অনুপ্রাস-শিঞ্জনে শিঞ্জিত করিয়াছেন—

সর্ব্বত্র কেবল ঝোঁকবৃদ্ধির জন্যই নয়। আমি এখানে তাহার কয়েকটি মাত্র, ছন্দস্পন্দের কৌশল-হিসাবে, উদ্ধৃত করিতেছি। এখানেও অন্যবিধ ঝোঁক চিহ্নিত করিব না; যেখানে অনুপ্রাস ছাড়া ঝোঁকের অন্য কারণ আছে, সেখানেও ঝোঁক চিহ্ন দিলাম না।]

সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।

ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে!

*　　*　　*

রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে,

*　　*　　*

মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী

আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন।

*　　*　　*

দ্বিবদরদনিৰ্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া

কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে।

এ বর বরণ মম—

উপরে আমি কেবল অনুপ্রাস দ্বারা ঝোঁকবৃদ্ধির উদাহরণ দিলাম; ইহাতে কেবল ঝোঁকের সংখ্যাবৃদ্ধিই হয় না—যেখানে ঝোঁক স্বভাবতই অল্প, সেখানেও তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

(খ) যমক। একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ, চরণের মধ্যে শব্দের মিল-জনিত অনুপ্রাস—প্রভৃতির দ্বারা ছন্দকে স্পন্দিত করিবার উপায়। এইগুলিতে কোথাও আমি ঝোঁক চিহ্ন দিলাম না; চিহ্ন না দেখিয়া, কেবল, একটু মনোযোগ

সহকারে আবৃত্তি করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—কোথায় ঝোঁকটি কি কারণে স্পষ্টতর হইয়াছে।—

হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী

*　　*　　*

চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে।

*　　*　　*

অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা গদাধর যথা।

*　　*　　*

রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি ঢুলায় চামরী।

*　　*　　*

গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর ভালে।

*　　*　　*

খুল্লতাত বিভীষণ বিভীষণ রণে।

*　　*　　*

মুছিয়া নয়ন-জল রতন আঁচলে।

এতক্ষণ আমি, মধুসূদনের ছন্দে, আদ্য অক্ষরে স্বরবৃদ্ধির দ্বারা ছন্দ স্পন্দিত করিবার নানা উপায় বিশেষ করিয়া দেখাইলাম। এইবার এই স্বরবৃদ্ধির একটি অন্য উপায়, ও তাহার বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করিব। 'মাত্রা' বা 'quantity' বলিতে যে ধরণের স্বরবৃদ্ধি বুঝায়—মধুসূদনের ছন্দে তাহারও অবকাশ রহিয়াছে, দেখা যায়। যদিও দীর্ঘস্বরের গুরুত্ব বাংলা ভাষার স্বভাবসিদ্ধ নয়—বাংলা ছন্দেরও প্রকৃতিগত নয়, তথাপি, ওই-জাতীয় স্বরধ্বনিও ইহার ছন্দস্পন্দকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কোনরূপ হিসাবের মধ্যে ইহাকে পাওয়া না গেলেও, এবং এ ছন্দের Rhythm মুখ্যত ওই ঝোঁকগুলির দ্বারাই সম্পন্ন হইলেও, পাঠক পড়িবার সময়ে কানকে একটু সজাগ রাখিলেই বুঝিতে পারিবেন—কোন্ কোন্ স্থানে অক্ষরের দীর্ঘস্বর সত্যই একটু দীর্ঘত্ব কামনা করে; তাহাতে ছন্দস্পন্দের যেমন বৈচিত্র্য ঘটে, তেমনই তাহার সঙ্গীত-গুণও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে, ছন্দের সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ আদায় করিবার মত ছন্দরসপিপাসাও পাঠকের থাকা চাই। মাত্রাজাতীয়

স্বরবৃদ্ধি হয় দুই কারণে ; প্রথম, যুক্তবর্ণের অবস্থান ঃ দ্বিতীয়, দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণ। আমি এ পর্য্যন্ত স্বরবৃদ্ধির প্রসঙ্গে যুক্তবর্ণের উল্লেখ করি নাই ; তাহার কারণ, যুক্তাক্ষরের জন্য পূর্ব্ব-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে তাহা একটু ভিন্ন রকমের—উহা কতকটা সংস্কৃত গুরুবর্ণের মত। 'সম্মুখ সমরে'—এখানে 'সম্মুখে'র 'সম্', 'কশ্চিৎ কান্তা'র 'কশ্', অথবা 'পঙ্ক্তি'র 'প'এর মত গুরু অক্ষর। যদিও এই গুরুত্ব ঠিক দীর্ঘস্বরযুক্ত অক্ষরের সমতুল্য নয়, তথাপি এই স্বরবৃদ্ধি ঠিক stress-এর মতও নয়—উচ্চারণে একটু দীর্ঘতার আভাস আছে। প্রসঙ্গক্রমে, এইখানে, একটা অপণ্ডিতসুলভ কথা বলিব, প্রাচীন বা আধুনিক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রীরা এ পর্য্যন্ত তাহা বলিয়াছেন কিনা জানি না। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণও যেমন গুরু, দীর্ঘস্বর-মাত্রাও তেমনই গুরু—দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা গণনার মধ্যে আসে না। 'কশ্চিৎ কান্তা'র আদ্য-অক্ষর ওই 'ক', এবং মধ্যের ওই 'কা'—এই দুইয়ের স্বরবৃদ্ধি নিশ্চয় একরূপ নহে। অতএব, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, সংস্কৃত ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গের যে বৈচিত্র্য এমন শ্রুতিসুখকর হয়, তাহার মূলে আছে, এই বিভিন্ন মাত্রাধ্বনির সমাবেশ—চরণ-মধ্যে ওই দুইজাতীয় অক্ষরের গণনা একই হিসাবে করিলে চরণগুলির ধ্বনিবৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয়। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। মধুসূদনের ছন্দেও স্বরবৃদ্ধির যে মাত্রা-গুণ আছে, তাহার একটি ওই-জাতীয়, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরঘটিত। বাংলা সাধুভাষায় পর্ব্বভূয়ক ছন্দে যে Rhythmical accent অধুনা আমরা পাইয়াছি, তাহা কথ্য বাংলার ছড়ার ছন্দের মত ধাক্কাযুক্ত নয়, ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির বশে তাহা ঈষৎস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, যুক্তাক্ষর সহযোগে এই ঝোঁক স্ফুটতর হয়। মধুসূদনের ছন্দে এইজন্য ইহার মূল্য সমধিক হইয়াছে। তথাপি ইহাকে আমি খাঁটি stress বা আঘাত-মূলক স্বরবৃদ্ধি না বলিয়া একরূপ মাত্রাগন্ধী 'গুরু'-ঝোঁক হিসাবে ইহার প্রাথমিক আলোচনা করিব। প্রথমে আমি ইহারই কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি, লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহা সর্ব্বত্র আদ্য-অক্ষরের ঝোঁক নয়।—

দুরন্ত কৃতান্ত দূত সম পরাক্রমে

* * *

মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী

হে কর্ব্বুর কুলগর্ব্ব ! মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী ?

* * *

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে

[ইহার সহিত, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দুইটিতে যুক্তাক্ষর-পূর্ব্ব বর্ণের ঝোঁক অতুলনীয়—

তোম্‌রা বিপ্র হয়ে ভৃত্যকার্য্য করে' বাড়ি ফিরে'
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—

—মধুসূদন যে ধরনের ঝোঁক তাঁহার ছন্দে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্বরধ্বনি-প্রধান ভাষারই উপযোগী। এ বিষয়ে তাঁহার কান এত সজাগ ছিল যে, তিনি কোথাও প্রাচীন কবিদের মত কোন কারণে 'হৈল' 'কৈল'—প্রভৃতিরও শরণাপন্ন হন নাই।]

যুক্তবর্ণঘটিত স্বরবৃদ্ধির—এবং তদ্দ্বারা ছন্দস্পন্দ-সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে ইহাব অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এইবার দীর্ঘস্বরঘটিত মাত্রাবৃদ্ধি ও সেই কারণে ছন্দের গৌরববৃদ্ধির নমুনা দিব—

(১) যুক্তাক্ষরেব পূর্ব্ববর্ণে দীর্ঘস্বর থাকায় তাহাব মাত্রাবৃদ্ধি।

রত্নাকর-রত্নোত্তম ইন্দিরা সুন্দরী।

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে।

যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।

(২) দীর্ঘস্বরের জন্যই অক্ষবেব মাত্রাবৃদ্ধি।

ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,

আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমাব।

* * *

দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে

* * *

সুবর্ণদীপ-মালিনী রাজেন্দ্রাণী যথা

রত্নহারা।

* * *

এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ডটঙ্কারে।

* * *

ওই ভীম বামকরে

কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্তধামে

পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল।

* * *

উড়িছে কৌশিক ধ্বজ…

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে…

[মধুসূদন বোধ হয় এইজন্যই, ঐ-কার ঔ কারের ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নাই।]

উপরে দীর্ঘস্বরজনিত স্বরবৃদ্ধির যে উদাহরণগুলি দিলাম, তাহাদের ঠিক ওই গুণ ওই স্থলে আছে কি না—পাঠকের নিজের ছন্দরসবোধ ও আবৃত্তি-কৌশল তাহার মীমাংসা করিবে। আমি কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মধুসূদনের নিজের যে এই দিকে দৃষ্টি ছিল, তাহা, তাঁহার ছন্দ ভাল করিয়া পাঠ করিলে অনুমান করা যায়। তাহা ছাড়া, তাঁহার নিজেরই কথায় একটু প্রমাণ হয় যে, তিনি স্থানবিশেষে বাংলা অক্ষরের দীর্ঘমাত্রা মানিতেন, যথা (একখানি পত্রে)—

Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long .....In that description of evening you have these lines—

আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি
শর্ব্বরী,

—How, if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা, you improve the music of the line, because the double syllable স্তু mars the strength of লা। Read—

আইলা সুচারুতারা, শশীসহ হাসি
শর্ব্বরী ;

—ইহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদনের কানে, স্থানবিশেষে, এবং শব্দবিশেষে, দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতার প্রয়োজন-বোধ ছিল। ইহার পরে, মধুসূদনের ছন্দ সম্বন্ধে, বোধ হয় এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে—

"As we listened, it was easy to believe that 'stress' and 'quantity' and 'syllable' all playing together like a chime of bells, are concordant and not quarrelsome elements in the harmony of Modern Bengali Verse."

সপ্তম অধ্যায়

অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'যতি'-স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র্য

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-চরণে বাংলা ছন্দের একটা প্রাথমিক অভাব দূর করিয়া কি উপায়ে বৃহত্তর ও জটিলতর ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যতদূর সাধ্য সবিস্তারে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই ছন্দের অপর প্রধান উপাদান —ইহার নূতন যতি-বিন্যাস, বা যতি-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। মধুসূদন যেমন এই ঝোঁকগুলি দ্বারাই Rhythm সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেন, তেমনই, ছন্দের ছাঁদ (৮+৬), এবং ছন্দের তরঙ্গটি রক্ষা করিয়া, যে কোন বাক্য বা বাক্যাংশের ছোট বড় বিরাম-স্থল করিয়া লইতে, তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি, পয়ারের দুই পদভাগের শেষে যে দুইটি যতি আছে, তাহা এখানেও লুপ্ত হয় না; কেবল, চরণান্তিক যতিটি এক্ষণে আর সর্ব্বত্র pause বা বিরাম-যতি হইতে পারিতেছে না; কিন্তু উভয় যতিই, সর্ব্বত্র ছন্দ-যতির যাহা কাজ—সেই কাজ করিতেছে, অর্থাৎ, চরণের পদভাগ ঠিক রাখিয়া তাহার গতিকে পূর্ব্ববৎ ছন্দিত করিতেছে। আমি অতঃপর এই দুই প্রকার যতির দুই পৃথক নাম দিব—ছন্দভাগের যতিকে (Caesura, Harmonic pause) 'ছন্দ-যতি', এবং বাক্যাংশ বা বাক্যশেষের যতিকে 'বিরাম-যতি' বলিব। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে এই দুই প্রকার যতির পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে—

> বহিছে পরিখারূপে | বৈতরণী নদী |
> বজ্রনাদে ,+ রহি রহি | উথলিছে বেগে |
> তরঙ্গ,+ উথলে যথা | তপ্তপাত্রে পয়ঃ |
> উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ,+ | ত্রস্ত অগ্নিতেজে ! ||
> নাহি শোভে দিনমণি | সে আকাশ দেশে ,+ |
> কিম্বা চন্দ্র,+ কিম্বা তারা ,+ | ঘন ঘনাবলী, |
> উগরি পাবকরাশি, | ভ্রমে শূন্যপথে |
> বাতগর্ভ,+ গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি |
> পিনাকী + পিনাকে ইষু | বসাইয়া রোষে। ||

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা— কারণ, (১) এই পংক্তিগুলিতে ছন্দ-যতি সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিতেছে;

(২) বিরাম-যতির স্থান একরূপ নহে—৮ অক্ষরের মত, ৩ ও ৪ অক্ষরেও বিরাম ঘটিয়াছে (এ বিষয়ে আরও বৈচিত্র্য দেখা যাইবে) ; (৩) বিরাম-কালের স্বল্প-দীর্ঘ ভেদ রহিয়াছে। পংক্তিগুলির মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ আছে দুইটি ; তৎসত্ত্বেও, সব পংক্তিগুলি মিলিয়া একটি পূর্ণ ছন্দ-মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে অমিত্রাক্ষরের 'Verse Paragraph' বা পংক্তিপর্ব্ব—বলে। এ সম্বন্ধে পরে বলিব। এক্ষণে উপরের verse paragraph-টির মধ্যে দুই প্রকার যতি-স্থান লক্ষ্য করিতে বলি ; এবং আরও লক্ষ্য করিতে বলি—ওই বিরাম-যতিগুলি সত্ত্বেও সর্ব্বত্র সেই (৮+৬) -এর ছন্দ-যতি বজায় রহিয়াছে। ছন্দ-যতির চিহ্ন (|) এইরূপ, বিরাম যতির চিহ্ন (+) এইরূপ, এবং পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন (৷৷) এইরূপ দিয়াছি।

মধুসূদনের ছন্দে, কোন কোন স্থানে বিরাম-যতি ও ছন্দ-যতির এইরূপ নির্ব্বিরোধ অবস্থান দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে ছন্দ-হানিও হয় নাই। তথাপি এই ছন্দের স্বাভাবিক (normal) গতি যে ওই নিয়মকেই মানিয়া চলে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, মধুসূদনের ছন্দ মহাকাব্যের ছন্দ, এজন্য এ ছন্দে সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যবিধান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই মধুসূদন নিজেও সর্ব্বত্র ছন্দের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাও নিশ্চিত। আমি এইবার কয়েকটি এমন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যাহাতে দেখা যাইবে, এই যতি-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(১) পশিল কাননে দাস ,+আইল গর্জ্জিয়া |
সিংহ ,+বিমুখিমু তাহে , | ভৈরব হুঙ্কারে |
বহিল তুমুল ঝড় ,+কালাগ্নি সদৃশ |
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ;+ | পুড়িল চৌদিকে |
বনরাজি ,+কতক্ষণে | নিবিলা আপনি
বায়ুসখা,+বায়ুদেব | গেলা চলি দূরে। ৷৷

(২) দীপিছে ললাটে |
* শশিকলা,+মহোরগ-ললাটে যেমতি |
মণি !+জটাজুট শিরে+ | তাহার মাঝারে |
জাহ্নবীর ফেনলেখা+ | শারদ নিশাতে |
কৌমুদীর রজোরেখা | মেঘমুখে যেন ! ৷৷

(৩) গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া | কোষা-কোষী + ভরা |
হে জাহ্নবী, তব জলে + | কলুষনাশিনী |
তুমি! + পাশে হেম-ঘণ্টা, | উপহার নানা |
হেমপাত্রে ; + রুদ্ধদ্বার ; + | বসেছে একাকী |
রথীন্দ্র, + নিমগ্ন তপে | চন্দ্রচূড় যেন |
যোগীন্দ্র, + কৈলাসগিরি,—তব উচ্চচূড়ে ।।

উপরে আর সব পংক্তির যতি-স্থান ঠিক আছে, কেবল (*) চিহ্নিত পংক্তিটির যতি-বিন্যাসে যেন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এখানে আট-ছয়ের মধ্যবর্ত্তী ছন্দ-যতিটি লোপ পাইয়াছে। এইরূপ আরও একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

ভেবে দেখ মনে, শূর, + | কালসর্প-তেজে |
* তবাগ্রজ, + | বিষদন্ত তার | মহাবলী |
ইন্দ্রজিৎ।

—ইহার প্রথমটিতে যতিভঙ্গ-দোষ হইয়াছে ;—'মহোরগ-ললাটে', এই শব্দ দুইটির মধ্যে যতি রক্ষা করিতে গেলে অন্বয় রক্ষা হয় না; অতএব এখানে ছন্দেরই দোষ ঘটিয়াছে। এইরূপ যতিভঙ্গ-দোষ মেঘনাদের ছন্দে অনেক স্থলে আছে ; বিশেষত এক ধরণের যতি-ভঙ্গকে, কবি যেন, ভাবের বাক্য-স্রোতে ভাসিয়া, গ্রাহ্য করা আবশ্যক মনে করেন নাই ; যথা—

অলঙ্ঘ্য-সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!

*　　*　　*

নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন!

এইরূপ আরও আছে। ইহার কোন কৈফিয়ৎ নাই। কিন্তু উপরে (*) চিহ্নিত দ্বিতীয় পংক্তিটির কথা স্বতন্ত্র। এখানে ছন্দ-যতির স্থান রীতিমত হটিয়াছে —যেন আট অক্ষরের প্রথম পদভাগকে দুই ভাগ করিয়া (৪ + ৪), তাহার ফাঁকে দ্বিতীয় পদভাগটিতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে (৪ – ৬ – ৪); ফলে, চরণের মধ্যে দুইটি ছন্দ-যতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রথমটিতে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতি— দুই যতিই আছে ; দ্বিতীয়টিতে কেবল ছন্দ-যতিই আছে। এইরূপ যতি-বিপর্য্যয় 'মেঘনাদে'র ছন্দে খুব বেশি না থাকিলেও, ইহাকে ছন্দ-দোষ বলা যাইবে কি না

সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয় নহি। মধুসূদন, তাঁহার ছন্দে সর্ব্ববিধ বিরাম-যতির ব্যবস্থা করিয়াও কোথাও ছন্দ-যতিকে স্থানচ্যুত করেন নাই; এমন কি, ছন্দের এই অবারিত গতিমুখে, তিনি (৮+৬)-এর পরিবর্ত্তে (৬+৮)-এর ছন্দভাগও পছন্দ করেন নাই; কারণ, উহাতে এ ছন্দের প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য আমার মনে হয়, যেহেতু এখানেও কানে ছন্দ ঠিক আছে, অতএব—এমন একটা কিছু এখানে ঘটিয়াছে, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত (৮+৬)-এর যতি কোন না কোন প্রকারে বজায় আছে, কান ওই (৮+৬) এর ছাঁদকে হারাইয়া ফেলে না। আমি ইহাতেও সেই (৮+৬)-এর ভাগ দেখিতেছি; কেবল, আটের ভাগটি খণ্ডিত (split) হইয়া ছয়ের ভাগকে মাঝে বসাইয়াছে। আরও একটি যতি-ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক—

যোগাতেন আনি
* নিত্য ফলমূল | বীর সৌমিত্রি, | + মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু,

এখানেও দ্বিতীয় পংক্তিটিতে বিরাম-যতি পড়িয়াছে 'সৌমিত্রি'র পরে; তাহাতে মাঝের ছন্দ-যতিটি যেন লোপ পাইয়াছে; এবং, ওই মাঝের পদটিতে ছয় অক্ষরও নাই। তথাপি, এখানে ছন্দ-যতি লোপ পাইতেছে অন্য কারণে। বিরাম-যতিটি ১১ অক্ষরের পরে থাকা সত্ত্বেও ছন্দ ক্ষুণ্ণ হয় না, তাহার প্রমাণ—

অদূরে শোভিল বনে।—দেউল + উজলি
সুদেশ।

—এখানে যথাস্থানে স্বাভাবিক ঝোঁক পড়ার ফলে, আট অক্ষরের ছন্দ-যতিটি অক্ষুণ্ণ আছে। 'দেউল' শব্দটির উপরে Logical Accent একটু প্রবল হওয়ায়, উহার আগে ও পরে, যে সামান্য যতির প্রয়োজন তাহাতেই, সুকৌশলে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতির বিরোধ মিটিয়াছে। এখানে ছন্দ-যতিটি বিরাম-যতির সহযোগিতা করিতেছে। আবার 'উজলি'র উপরেও বাক্যরীতিঘটিত একটু বিশেষ ঝোঁক পড়ে, এজন্য তাহার একটু পৃথক উচ্চারণের ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে। প্রথম নমুনাটিতে এইরূপ যথাস্থানে আবশ্যকমত ঝোঁক পড়ে না বলিয়াই, ছন্দ-যতিটিকে কষ্টে উদ্ধার

করিতে হয়। এখানে 'বীর' ও 'সৌমিত্রি' দুইয়েরই ঝোঁক সমান, এবং শব্দ দুইটি অন্বয়-বদ্ধ, যথা—

নিত্য ফলমূল—বীর-সৌমিত্রি, মৃগয়া—

তাই মাঝের ছন্দ-যতিটি রক্ষা করা দুরূহ। পড়িবার সময়ে 'সৌমিত্রি'র উপরে একটু বেশি ঝোঁক দিলে, যতিস্থান বজায় থাকিবে, এবং ছন্দটিও নির্দোষ হইবে, যথা—

নিত্য ফলমূল বীর—সৌমিত্রি, মৃগয়া—

এই বিরাম-যতির সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মধুসূদন তাঁহার ছন্দে, শব্দের মধ্যে বা শেষে, হসন্ত-বর্ণ-ধ্বনি সম্বন্ধে বেশ একটু সজাগ ও সতর্ক ছিলেন—ছন্দের স্বর-বৈচিত্র্য, ও যথাস্থানে গীতিকলধ্বনির প্রয়োজনে, তিনি হসন্তের ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু যতিস্থানের অক্ষরগুলিকে যতদূর সম্ভব স্বরান্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'মেঘনাদে'র যে-কোন একটা অংশ পড়িলে দেখা যাইবে—মধুসূদনেব ছন্দের যতিস্থানে স্বরান্ত অক্ষরই সংখ্যায় অধিক। উপরের উদ্ধৃত পত্রাংশেও, অন্তত ওই অষ্টম অক্ষরের যতিস্থানে, তাঁহার এ বিষয়ে সতর্কতার প্রমাণ রহিয়াছে। ইংরেজী ছন্দেও masculine ও feminine pause নামে যতির যে একটা প্রকারভেদ করা হয়, বাংলায় সেইরূপ এই স্বরান্ত যতিগুলিকে masculine pause বা 'ধীর যতি', এবং ওই হসন্ত-শেষ যতিগুলিকে feminine বা 'ললিত যতি' নাম দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে মধুসূদনের ছন্দে এই দ্বিবিধ যতির কিছু নমুনা দিব।—

দণ্ডক ভাণ্ডার যার | ভাবি দেখ মনে
কিসের অভাব তার ? | যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীব | সৌমিত্রি , মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু , | কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরতি সখি, | রাঘবেন্দ্র বলী—
দয়ার সাগর নাথ, | বিদিত জগতে ;

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে দেখা যাইবে অধিকাংশ হসন্ত-বর্ণ পদশেষে (যতির স্থানে) না থাকিয়া পদমধ্যে রহিয়াছে। তথাপি এখানে কয়েকটি feminine

pause বার বার আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার সহিত অপর যে কোন স্থানের কয়েক পংক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে, মধুসূদন সাধারণত 'ললিত যতি' অপেক্ষা 'ধীর যতির'ই অধিকতর পক্ষপাতী; আমার মনে হয়, এই জন্যই তিনি বাংলা কর্ম্ম-কারকে 'এ'-বিভক্তি, এবং বাংলা শব্দের শেষে সংস্কৃতের মত বিসর্গ ব্যবহার করিয়াছেন।—

বননিবাসিনী দাসী | নমে রাজপদে
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি | ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু | পারে কি অভাগী?
হায়, আশামদে মত্ত | আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, | হে নাথ, আকাশে,
পবন-স্বনন যদি, | শুনি দূর বনে,
অমনি চমকি ভাবি | -মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে,—পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজিবাজি, | সুরথ সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ। | আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা, অনসূয়া, | ডাকি সখীদ্বয়ে,

যতিস্থানের অক্ষরগুলি চিহ্নিত করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে, উপরের পংক্তিগুলিতে একটিও 'ললিত যতি' (feminine pause) নাই।

অষ্টম অধ্যায়

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান গৌরব—Verse-Paragraph বা 'পংক্তিপর্ব্ব'; উপসংহার।

এইবার মধুসূদনের ছন্দের যাহা প্রথম ও শেষ, অর্থাৎ প্রধানতম লক্ষণ, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই ছন্দ-পরিচয় শেষ করিব। মধুসূদনের এই মিল্‌টন-অনুগামী ("তব অনুগামী দাস") অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার Verse-Paragraph বা 'পংক্তিপর্ব্ব'। এই পংক্তিপর্ব্ব রচনাতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর প্রকৃত ছন্দ-গৌরব লাভ করিয়াছে। কেবল ছন্দ-যতিকে গৌণ করিয়া বিরাম-যতিকে মুখ্য করিয়া তোলাই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, এই Verse-Paragraph-এর জন্যই মধুসূদনের ছন্দ মিল্‌টনের ছন্দের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে—এবং ইহারই গুণে ওই এক ছন্দে একখানি বৃহৎ কাব্য বিচিত্র সঙ্গীতস্রোতে প্রবাহিত হইয়া ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের আবর্ত্তন রক্ষা করিতে পারিয়াছে; নতুবা, কেবল চরণমধ্যে যতি-স্বাচ্ছন্দ্যের গুণেই ওই এক ছন্দে মহাকাব্য রচনা করা যাইত না। এই Verse-Paragraph-এর আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে, কিন্তু ইহা তিনটি বা চারিটি পংক্তির ব্যাপার নয়। স্বল্প ও দীর্ঘ বিরামযুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার বা সঙ্গীত-সঙ্গতির সহায়ে, একটি ভাব, একটি চিত্র, বা ব্যাখ্যান যে পূর্ণ ছন্দ-রূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের পংক্তিপর্ব্ব। এ যেন ছন্দের এক একটি সৌরমণ্ডল—প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গতি যেমন আছে, তেমনই, সকলে একটি এক-কেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমি মূল প্রবন্ধের একটি প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু এখানেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিবার উপায় নাই—কারণ, এ বিষয়ে কোন মাপযন্ত্রের আস্ফালন চলিবে না; এখানে কেবল কাব্যের সুরে নিজের কান মিলাইতে হয়, এই 'পংক্তিপর্ব্ব'গুলি বার বার পড়িতে হয়। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক কিছু বলিবার নাই, তাহার মতে—

"These combinations or paragraphs are informed by a perfect internal consent and rhythm—held together by a chain of harmony. With a writer

less sensitive to sound this free method of versifying would result in mere chaos. But Milton's ear is so delicate that he steers unfaltering through these long involved passages, distributing the pauses and rests, and alliterative balance with a cunning which knits the paragraph into a coherent regulated whole."

—এ সম্বন্ধে ইহার বেশি কেহ বলিতে বা বুঝাইতে পারে না। মিল্টনের একটি Verse-Paragraph, ও তাহার পরেই মধুসূদনের একটি, নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি; পাঠকের যদি একটু ছন্দরস-বোধ থাকে (এবং সেই অনুপাতে ছন্দের ব্যাকরণ-বিদ্যা কম হয়), তাহা হইলে যে বস্তুটি এত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, তিনি তাহা কানের দ্বারাই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।—

Now came still Evening on, and Twilight gray
Had in her sober livery all things clad;
Silence accompanied; for beast and bird,
They to their grassy couch, these to their nests,
Were slunk, and all but the wakeful nightingale;
She all night long her amorous descant sung.
Silence was pleased Now glowed the firmament
With living sapphires; Hesperus, that led
The starry host, rode brightest, till the Moon,
Rising in clouded majesty, at length
Apparent queen, unveiled her peerless light,
And o'er the dark her silver mantle threw.

এবং—

হাসি দেখা দিল উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে
দুঃখতমোবিনাশিনী। কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী, মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে, উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা শততারাতেজে।
ফুটিল কুন্তলে ফুল নব-তারাবলী।

এই সঙ্গে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' হইতে একটি পংক্তিপর্ব্ব উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে দেখা যাইবে, বিভিন্ন আয়তনের ছোট-বড় পদ, এবং নানাবিধ ঝোঁকের

'rhythm'—held together by a chain of harmony'—কি সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ ছন্দমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে।—

যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তব চন্দ্রমুখ—অতুল জগতে!
যে দিন প্রথম তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।
এ পোড়া বদন মুহু হেরিনু দর্পণে,
বিনাইনু যত্নে বেণী, তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পরিধান মম বাকল, ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু কাঁদি বন-দেবী পদে,
দুকুল, কাঁচলি, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে।
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে।
হায়রে, অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!

* * *

মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার অবকাশ উপস্থিত নাই—বোধ হয়, প্রয়োজনও নাই; অনেক সূক্ষ্ম বিচার যে বাদ পড়িল তাহাও স্মরণ আছে। কিন্তু আজ বাংলা কবিতা ও বাংলা ছন্দের যে দিন আসিয়াছে, তাহাতে সহস্র বিচারেও কিছু হইবে বলিয়া আশা করি না। কেবল, যাঁহারা আধুনিক বাংলা ছন্দের পরিচয় লইবেন, তাঁহারা যাহাতে এই একটি কথা বুঝিতে পারেন যে, মধুস্থদনের ছন্দ শুধুই একটা নূতন ছন্দ মাত্র নয়, উহা একাই বাংলাছন্দের একটা সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য; আর যাবতীয় বাংলা ছন্দ—গীতিচ্ছন্দ, কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা ওই একটি অপর ছন্দ লাভ করিয়াছি—যাহার দ্বারা কাব্যচ্ছন্দকেই, সাগরকল্লোল হইতে তটিনীর কলধ্বনি পর্য্যন্ত, সকল সুরে ঝঙ্কৃত করা যায়; বিশেষ করিয়া, জীবন ও জগতের যাবতীয় প্রত্যক্ষ

রূপরসের অনুভূতিকে মানবকণ্ঠেরই বিচিত্র স্বরব্যঞ্জনায়, ভাষার ছন্দে প্রকাশ করা যায়। মধুসূদনের ছন্দে সাধু বা সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার থাকিলেও, তাহা খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি ও উচ্চারণরীতির ছন্দ; ইহার চরণও পয়ারের চরণ; অতএব, Blank Verse-কে যেমন ইংরেজী 'National Verse' বলা হইয়া থাকে—এই অমিত্রাক্ষরকেও তেমনই আধুনিক বাংলার সেইরূপ বিশিষ্ট ছন্দ বলা যাইতে পারে। ভাষার সেই রূপ, ও সেই ধ্বনির চর্চ্চা এখন আর নাই বলিলেই হয়; তাই, কেবল, এই ছন্দের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝিতে পারিলেই ইহার বিচিত্র ও সূক্ষ্ম শ্রুতিমাধুর্য্যের ধারণা করা যাইবে না; এইরূপ লিখিত আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। ভাষা ও ছন্দের সে সংস্কার পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে রীতিমত পাঠ-চক্রের ব্যবস্থা করিতে হয়।

সর্ব্বশেষে আমি এই বলিয়া বিদায় লইব যে, মধুসূদন যেমন এই ছন্দ-সৃষ্টিব জন্য কোনরূপ ছন্দ-বিজ্ঞান বা ছন্দ-সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই—সে বিষয়ে তাঁহার কানই একমাত্র গুরুর কাজ করিয়াছিল, আমিও তেমনই, মধুসূদনের সেই কানের সুরটিকে আমার কানে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং তাহারই সাহায্যে এই ছন্দ-পরিচয় লিখিয়াছি; কেবল, আমার সেই কানের সাক্ষ্যকে যাচাই করিবার জন্যই ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ সাক্ষ্যও সংগ্রহ করিয়াছি—ছন্দের ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মাণ করিবার স্পর্দ্ধা বা দুঃসাহস আমার নাই। ইতিপূর্ব্বে, বাংলা ছন্দের পরিচয়, যে প্রয়োজনে আমারই জ্ঞান ও বুদ্ধিমত লিখিয়াছি, এবারকার প্রয়োজন তদপেক্ষাও গুরুতর। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ—তাঁহার কাব্যের মতই, গত ৪০ বৎসর বাংলা কবিতার বহির্ভূত হইয়া আছে—সে ছন্দ এখন আর কেহ পড়ে না, পড়িতে পারেও না। তাহাও বরং ভাল ছিল; ইহার উপরে, আধুনিক ছন্দ-পণ্ডিতগণের অত্যধিক পাণ্ডিত্যের দাপটে অমিত্রাক্ষরের পিতৃনাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এ ছন্দের ধর্ম্ম ও মর্ম্মের সন্ধান এ পর্য্যন্ত কেহ করিল না, তাহাব উপর, বাংলা সাহিত্যের ছাত্রগণকে ইহার একটি দুষ্ট নাম ('অমিতাক্ষর') শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে!" আমি আমার সাধ্যমত, বাংলার এই অদ্বিতীয় ছন্দের যে পরিচয় দিলাম, আশা করি, তদ্দ্বারা, আর কিছু না হউক—বাঙালী কাব্যরসিক বিদ্বজ্জন, ইহার অপূর্ব্ব ধ্বনি-কৌশল ও ইহার মহিমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট

বাংলা কবিতার Stanza বা 'পদবন্ধ'

(১)

ইংরেজীতে যাহাকে Stanza বলে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন প্রতিশব্দ নাই; ইহার কারণ দুইটি—প্রথম, বাংলা কবিতায় ঠিক ঐরূপ বস্তু পূর্ব্বে ছিল না; দ্বিতীয়ত, আধুনিক বাংলা কাব্যে ইহার প্রচলন ক্রমশ বিস্তৃত হইলেও এবং ইহার বহু বৈচিত্র্য বাংলাছন্দের সমৃদ্ধি সাধন করিলেও, Stanza যে ঠিক কি বস্তু সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কাহারও কৌতূহল পর্য্যন্ত উদ্রিক্ত হয় নাই, কেবল একটা স্থূল ধারণা মাত্র আছে; এবং তাহার ফলে, ইহার বাংলা নামকরণ হইয়াছে—'স্তবক', তাহাতেই কোনরূপে কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু stanza কেবল মাত্র কতকগুলি পদ্যপংক্তির স্তবক বা গুচ্ছ নয়, অথবা দীর্ঘ কবিতাকে সুবিধামত খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিলেই তাহা stanza হয় না—তাহার বাহিরেও যেমন, ভিতরেও তেমনই, ভাব-অর্থ এবং ছন্দঘটিত একটা বন্ধন আছে; সেই বন্ধন বা গ্রন্থনের নিয়মটি না জানিলে stanza-র ছন্দরূপ ধরিতে ও বুঝিতে পারা যাইবে না। আমি আগে সেই রূপটির কথা বলিব, তারপর ইহার একটা পারিভাষিক নাম নির্ণয় করিব।

একই ছন্দের কতকগুলি সমান বা হ্রস্ব-দীর্ঘ পংক্তি ও বিবিধ মিল-বিন্যাস (rhyme scheme) দ্বারা কবিতার যে পংক্তি-পর্ব্ব নির্ম্মাণ হয়, তাহাই stanza; কবিতায় যেমন পংক্তিগত ছন্দভাগ থাকে, ইহাও তেমনই যেন পদসমষ্টিগত এক একটি বৃহত্তর ছন্দভাগ, ইহাও পদের মত কবিতায় পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেখিলেই মনে হয়, গদ্যরচনায় যেমন প্যারাগ্রাফ, পদ্যরচনাতেও সেইরূপ—stanza। কিন্তু ইহা শুধুই বাহিরের একটা অঙ্গ-ভাগ মাত্র নয়; গদ্যের প্যারাগ্রাফের মত, ইহা দ্বারা কবিতার ভাবানুক্রম চিহ্নিত হইলেও, ছন্দ-ঘটিত একটা বড় নিয়ম ইহাকে মানিতে হয়। প্রাচীন বাংলা কবিতায় ঠিক stanza না থাকিলেও, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-ছন্দের কবিতার প্রতি চরণ তিন বা চারিটি ভাগে ভাগ হইতে দেখা যায়—এইরূপ ছন্দকে ত্রিপদী বা চৌপদী নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু

তাহাও ওই ভাগের নাম নয়—ছন্দের নাম ; অর্থাৎ, কবিতারই পৃথক অঙ্গহিসাবে কোন ভাগ সত্যই ছিল না—stanza বলিতে যাহা বুঝায়, কবিতার ভাবানুযায়ী তেমন গঠন কৌশল কবিদের অজ্ঞাত ছিল। ত্রিপদী বা চৌপদী যে stanza-র নাম নয়—তার প্রমাণ, একটির পুরা হিসাবে ছয়, এবং অপরটিতে আট সংখ্যক পদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে হিসাবের আবশ্যকতাও ছিল না, কারণ, ঐ ছয় বা আট অবিচ্ছেদে বহিয়া চলে—পয়ারের মতই একটানা, কোথাও কোন ছেদ বা ভাগ নাই। নব্য বাংলা কবিতায় যখন stanza দেখা দিল, তখনও ঐ ত্রিপদী ও চৌপদীর একটানা ভঙ্গিটি আমাদের কবিগণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, কেবল পংক্তিগুলি ভাগ করিয়া সাজাইয়া দিতেন ; তার কারণ, তাঁহারা তখনও stanza-র অন্তর্নিহিত ছন্দ-রূপ, এবং কবিতার ভাব-রূপের সহিত তাহার সাযুজ্য অনুমান করিতে পারেন নাই ; এবং অনেকে stanza-রচনায় পুরাতন ত্রিপদী ও চৌপদীর সংস্কারই পালন করিয়াছিলেন !

কিন্তু সেইরূপ ত্রিপদী বা চৌপদীর পদ-বন্ধনকেও stanza নাম দেওয়া যাইবে—যদি তাহাতে stanza-র লক্ষণ থাকে। সে লক্ষণ দুইটি—প্রথম, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পদ-সমষ্টি হওয়া চাই ; দ্বিতীয়, তাহাদের গঠনে ছন্দ ও মিলের একটি বিশেষ গ্রন্থি-বন্ধন চাই—কেবল ছন্দ বজায় থাকিলেই চলিবে না, পংক্তিবিন্যাসের কৌশলে, সমগ্রভাবে একটি ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি হওয়া চাই। কবিতার মধ্যেই এই যে পৃথক ছন্দভাগ ইহাতে কবিতার অখণ্ডতা নষ্ট হয় না, —একটি মূল ভাবকে ডোর করিয়া তাহাতে যে এক একটি বিশেষ প্যাটার্ণের ছন্দ-গ্রন্থি দিয়া মালা গাঁথা হয়, সেই ছন্দগ্রন্থিই stanza। প্রাচীন বাংলা পদ্যে এইরূপ গ্রন্থি ছিল না, সে যেন এক এক ছন্দের সমান-গাঁথা এক এক গাছি মালা—তাহাতে ছন্দের একটা নিরবচ্ছিন্ন স্রোতই আছে। অতএব এই stanza আমাদের কবিতায় সম্পূর্ণ নূতন ; ইহার নাম এমন হওয়া চাই যাহাতে উহার ঐ গ্রন্থিবন্ধনের অর্থটি প্রকাশ পায়। কেবল 'স্তবক' বা ঐরূপ একটা নাম দিলে তাহা নিতান্তই সাধারণ অর্থবাচক হইয়া পড়ে, পারিভাষিক অর্থগৌরব একেবারেই থাকে না ; এজন্য, আমি stanza-র বাংলা নাম দিয়াছি—'**পদবন্ধ**' ; আমার মনে হয়, ইহাতে কোন পণ্ডিতের আপত্তি হইবে না।

আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম যুগেই এইরূপ পদবন্ধ দেখা দিয়াছিল,—যদিও তাহাতে পংক্তিপর্ব্বের বৈচিত্র্য ও বৈভব বাঙালী কবির দৃষ্টি বা চিত্ত আকর্ষণ করে নাই। এ যুগের আদিতে, বা পুরাতন যুগের শেষে, কবি ঈশ্বরগুপ্তই বোধ হয় প্রথম একটি পদবন্ধযুক্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কবিতাটি ইংরাজীর অনুবাদ; বোধ হয় অনুবাদ করিতে গিয়া ঐরূপ পদবন্ধ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, ইহা Pope-এর Universal Pray-এর বঙ্গানুবাদ, নাম—"সর্ব্ববাদীসম্মত স্তোত্র"। ইহারও পূর্ব্বে কেহ এইরূপ পদবন্ধ রচনা করিয়া থাকিলেও তাহা নিতান্তই প্রত্নতত্ত্বের বিষয়, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই; পরে, নব্য কবিগণের প্রায় সকলেই পদবন্ধের আকারে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদন, বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারকেই কাল হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে, এবং ইঁহাদের মধ্যেও এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথকেই কৃতিত্বের অধিকার দিতে হইবে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'র পদবন্ধে যেমন ছন্দগৌরব নাই, তেমনই অন্যত্রও তিনি ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কেবল পদ্য-প্যারাগ্রাফ রচনা করিয়াছেন, পংক্তিসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া কবিতাগুলিকে ভাগ করিয়াছেন মাত্র। তাহার পরেও, অধিকাংশ কবি ইহার অধিক কিছু করেন নাই; বিহারীলালের ঐরূপ কবিতায় পংক্তির গঠন-বৈচিত্র্যে বা মিল-বিন্যাসে কোন কারিগরি নাই—ত্রিপদী বা চৌপদীর মতই, একটানা ছন্দের সেই পদবন্ধের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। কেবল, সুরেন্দ্রনাথের কবিতায় পদবন্ধের আয়তনে ও গাঁথনিতে একটু বিশেষ যত্ন ও বৈচিত্র্যবিধানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে হেমচন্দ্র এইরূপ 'একটানা' পদবন্ধ-ছন্দে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন বিশিষ্ট গঠন বা ছন্দোবৈচিত্র্য নাই—ত্রিপদী বা চৌপদী ছন্দের পংক্তিপর্ব্বই আছে। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে' বৃহত্তর আয়তনের পদবন্ধ ঐ কাব্যের কল্পনা ও ভাববস্তুর বড় উপযোগী হইয়াছে বটে—কিন্তু সেখানেও, মিলবিন্যাসে অতিরিক্ত শৈথিল্যের জন্য, পদবন্ধগুলির তেমন গৌরব রক্ষা হয় নাই।

পদবন্ধ সম্বন্ধে এই কালের অধিকাংশ কবির ধারণা যে খুব স্পষ্ট ছিল না, তাহার প্রমাণ, তাঁহারা কেবল পংক্তিব্যূহকেই পদবন্ধ বলিয়া মনে করিতেন—

পংক্তিগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার হইলেই হইল, কিন্তু সেই স্তবকের মধ্যে পদসজ্জায় বা মিলবিন্যাসে কোন কৌশলের প্রয়োজন ছিল না। তথাপি এইরূপ রচনার একটা কারণ যে ছিল না তাহা নয়, অনেক স্থলেই তদ্দ্বারা ভাব-অর্থের ক্রমান্তর-সূচনা আছে; কিন্তু কেবল তাহাতেই পদবন্ধ সার্থক হয় না। এক একটি পদবন্ধ আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ—ভাবে ও ছন্দসঙ্গীতে এক একটি পৃথক ব্যূহ বা মণ্ডল হওয়া চাই। সমগ্র কবিতার মূল ভাবসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকিবে বটে, মালার ডোর যেমন থাকে,—কিন্তু সেই মালার অক্ষরাজির মত প্রত্যেক পদবন্ধ একটি পৃথক ও সুবলয়িত গোলক হওয়া চাই; তাহা যেন সেই মূল ভাব-সূত্রের এক একটি পৃথক গ্রন্থি—ভাবেও যেমন, ছন্দেও তেমনই। এইরূপ ছন্দ-নির্ম্মাণে কতকগুলি ছোট-বড় চরণকে নানা ভঙ্গিতে যোজনা করিয়া একটা কেন্দ্রগত সৌষম্য দান করা হয়; এই সৌষম্যকেই বলে—Stanzaic Law। পংক্তির আয়তন এবং মিলের সংস্থান যতই বিচিত্র হয়, ততই এই সঙ্গতি-সুষমা গভীরতর হইয়া উঠে। একদিকে যেমন এইরূপ বিচ্ছিন্ন পদবন্ধের দ্বারা একটি ভাব-পরম্পরার সৃষ্টি হয়, তেমনই কবিতার ছন্দঃস্রোত একটানা না হইয়া একটা বৃহত্তর যতি-তালে তরঙ্গিত হইতে থাকে। ইহাই পদবন্ধ-রচনার মূল ছন্দ-তত্ত্ব।

(২)

'পদবন্ধ' কথাটিতে 'পদ' বলিতে চরণ বুঝিতে হইবে, যেমন—'চতুর্দ্দশপদী' কবিতা। কয়েকটি চরণ লইয়া যে ছন্দ-গ্রন্থি রচনা হয় তাহারই নাম 'পদবন্ধ'—তাহার সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ কি, তাহা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি। এক্ষণে বিভিন্ন গঠন ও আয়তনের পদবন্ধ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। বলা বাহুল্য, অন্ততঃ তিনটি চরণ না হইলে পদবন্ধ-রচনা হয় না; বাংলায় সাধারণতঃ দশটি চরণ পর্য্যন্ত পদবন্ধের আয়তন সহজেই বৃদ্ধি করা যায়। দুই চরণের মিলযুক্ত যে পদবন্ধ তাহাকে আমরা 'শ্লোক' বলিতে পারি—পদবন্ধ বলিবার প্রয়োজন নাই; দুই-এর অধিক হইলেই তাহা যথার্থ পদবন্ধের কোঠায় আসিয়া পড়ে। কিন্তু তিন চরণের পদবন্ধও বাংলায় অধিক নাই—তেমন ভালও হয় না। এইরূপ পদবন্ধকে বাংলায় 'বিশেষক' নাম দিলে ক্ষতি নাই,—শুনিতে একটু রুক্ষ হইল বটে, কিন্তু বিদেশী ভাষার 'tercet' বা 'terzetto' ইহা অপেক্ষা

মোলায়েম নয়। 'ত্রিপদিকা' নামটি আমার পছন্দ নয়—নূতন নূতন সাহিত্যিক নামকরণে -'ইকা'-প্রত্যয়ের বাহুল্য যেমন কুৎসিত তেমনই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া, ঐরূপ নামের সঙ্গে অপরাপর নামগুলির মিল থাকিবে না, কারণ, আমি ইহার পরেও দশপংক্তির পদবন্ধ পর্য্যন্ত এইরূপ নাম রাখিতে চাই, যথা, চার পংক্তি—চতুষ্ক; পাঁচ পংক্তি—পঞ্চক; ছয় পংক্তি ষট্‌ক; সাত পংক্তি—সপ্তক; আট পংক্তি—অষ্টক; নয় পংক্তি—নবক; দশ পংক্তি—দশক। অবশ্য ইহাদের সকলগুলিই আবশ্যক হইবে না, তবু নামগুলি তৈয়ার রাখা ভাল।

বাংলা 'বিশেষকে'র একটি মাত্র নমুনা উদ্ধৃত করিলাম—বিদেশী 'torza rima'-ছন্দের অনুকরণে এই পদবন্ধ রচিত হইয়াছে।

আত্মার নিশীথ-রাতে প্রেম বুঝি স্বপ্ন-সঞ্চরণ?—
বাঁশীখানি বেজে ওঠে অচৈতন্য প্রাণের অতলে!
প্রেম কি 'নিশির ডাক'—গাঢ় ঘুমে গূঢ় জাগরণ?

বিস্ফারিত অন্ধ আঁখি—তবু পথ চিনিয়া সে চলে,
বাহিরের ডাক শুনি' স্বপনে সে হয়েছে বাহির—
পথের পথিক-বালা নিজ মালা দেয় তার গলে!

কারো লগ্ন ভ্রষ্ট হয়—স্বপ্ন-ভঙ্গে ব্যথায় অধীর,
কারো স্বপ্ন ভাঙে না যে, সেই নর চির-ভাগ্যবান্—
স্বপ্নশেষে আসে তার মহানিদ্রা, মরণ-তিমির।

('শেষশিক্ষা'—স্মরগরল)

এই ছন্দের মিল-বিন্যাসের রীতি অতিশয় লক্ষণীয়।

চারি-চরণের পদবন্ধ এতই সাধারণ যে, তাহার নমুনা দিবার আবশ্যকতা নাই; ইংরাজীতে ইহাকে Quatrain বলে, বাংলায় 'চতুষ্ক' নাম দিয়াছি। এইরূপ পদবন্ধেই সর্ব্বপ্রথম একটু পংক্তি-বৈচিত্র্য বা মিল-বিন্যাসে কারিগরির অবকাশ মেলে। সাধারণতঃ ক-খ ক-খ—এইরূপ একান্তর মিলই দেখা যায়; আর এক রকমের মিল-বিন্যাসও কবিতার ভাববস্তুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী, যথা—ক খ খ ক; ইহাতে ভাবের গাম্ভীর্য্য রক্ষা হয়। কিন্তু বাংলা চতুষ্কগুলিতে প্রায়ই মাত্র দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে মিল থাকে, যথা—কখ গখ। ফার্সী

কবিতার 'রুবাই' নামক চতুষ্কের অনুকরণে বাংলায় একটি নূতন ধরণের পদবন্ধ কবিদের বড় কাজে লাগিয়াছে, যথা,—

কর্ব্বুরিত নীলাকাশ প্রশান্ত সুন্দর,
মৃদুমন্দ গন্ধবহ, সুবাস মন্থর।
দেখ, দেখ আঁখি মেলি, আলোক-পুলকে
ঝলসিছে ধবলার সুবর্ণ-শিখর।

*   *   *

নদীকূলে তরুতলে দূর্ব্বাদলে বসি'
তুমি বাজাইবে বীণা সুধীরে, রূপসী!
আমি শুধু চেয়ে রব মদির-আলসে—
সেই স্বর্গ, ওঠে যাহে দেবত্ব বিকশি'।

('পান্থ'—অক্ষয়কুমার বড়াল)

কিংবা

সুরায় আমার আয়ু যে ফুরাই—দুষিও মোরে তাই,
করিও না ঘৃণা—পেয়ালা ও প্রেম এক যে করিতে চাই!
শাদা চোখে বসি যাদের সমাজে তারা যে সবাই পর,
নেশায় বেহুঁশ হয়ে যাই যবে—বন্ধুরে মোর পাই!

('ফার্সি ফরাস'—হেমন্ত-গোধূলি)

ইহার মিলবিন্যাস এইরূপ—ককখক।

চতুষ্কের পর, পদবন্ধের আয়তন যত বৃদ্ধি পায়, ততই তাহার ছন্দ-সঙ্গীত জটিলতর ও গভীরতর হইয়া উঠে, আমি পরে এইরূপ পদবন্ধের সবিশেষ আলোচনা করিব। এক্ষণে, আমাদের বাংলাকাব্যে পদবন্ধের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি—তাহার কিছু কিছু নমুনা মন্তব্যসহ উদ্ধৃত করিব। বাংলা কবিতায় পদবন্ধের আদিরূপ এবং তাহার ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিলেই এই বিশিষ্ট ছন্দ-প্রতিমার শ্রী ও সৌষ্ঠব আপনিই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ঈশ্বরগুপ্ত—

দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন।
ভবে আর রবে কত   কাল যত হয় গত,
নিকট হতেছে তত মরণের দিন।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন।

—এখানে পুরাতন পয়ার ও ত্রিপদী মিলাইয়া একটি পংক্তিপর্ব্বের সৃষ্টি হইয়াছে,—ছন্দের সুরে কোন নূতনত্ব নাই, কেবল আকারেই পদবন্ধ। কবিতার পরবর্ত্তী পদবন্ধেও ওই এক ভাব ও এক সুর একটানা বহিয়া চলিয়াছে—পদবন্ধগুলির মধ্যে ভাবের কোন ছেদ নাই, অর্থাৎ কোন গ্রন্থি-চিহ্ন নাই।

মধুসূদন—

(১) নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ!
চল সখি, ত্বরা করি, হেরি গে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি স্বজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরয ধরি থাকি লো এখন,
যাক মান, যাক কুল মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেমনীরে ভেবে ও চরণ।
(ব্রজাঙ্গনা)

কিম্বা—

(২) মৃদু কলরবে তুমি ওহে, শৈবলিনী,
কি কহিছ ভাল ক'রে কহ না আমারে।
সাগর বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জানো না, ধনি, সেও বিরহিনী?
(ঐ)

প্রথমটিতে সেই মামুলী ছন্দরীতিই লক্ষ্য করা যায়—পদবন্ধটি একটি পংক্তিপর্ব্ব, বা কবিতার অঙ্গভাগ মাত্র। কিন্তু—দ্বিতীয়টিতে, একটি মাত্র কৌশলে পদবন্ধের ছন্দসঙ্গীত উঁকি দিয়াছে, সে কৌশল—ওই প্রথম পংক্তির সহিত একেবারে শেষ পংক্তির মিল, তাহাতেই সমগ্র পদবন্ধটি একটি কেন্দ্রগত সৌষম্য লাভ করিয়াছে। আর একটি কবিতায় মধুসূদন পদবন্ধ-রচনায় বেশ একটু কারিগরি করিয়াছেন, যথা—

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?

জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?
('আত্ম-বিলাপ')

এই পদবন্ধ—আকারে একটি ষট্‌ক; ইহাতে হ্রস্ব-দীর্ঘ পংক্তিযোজনা আছে; প্রথম চারিটি পংক্তিতে একান্তর মিলের একটি চতুষ্ক রহিয়াছে; পঞ্চম পংক্তিতে পদ-মধ্য মিল (sectional rhyme); এবং, সবচেয়ে গৌরবকর যাহা—শেষের, অর্থাৎ ষষ্ঠ পংক্তিতে, প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির মিল ফিরিয়া আসিয়াছে। এজন্য এই কবিতাকেই বাংলা পদবন্ধের সর্ব্বপ্রথম পরিস্ফুট রূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু মধুসূদনের পদবন্ধ-কবিতাগুলি সাধারণতঃ এরূপ নয়—অধিকাংশই কলা-কৌশলহীন।

বিহারীলাল—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর-নদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল-নলিনীদলে।
বিকশিত নীল কমল-আনন
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো ক'রে নীল-কমল-বরণ
পূরেছে ভুবন কমল-বাসে।
(বঙ্গসুন্দরী)

—এগুলি চতুষ্ক-জাতীয় পদবন্ধ; মিল—ক খ ক খ; পদবন্ধগুলির কোন পৃথক পরিচ্ছিন্ন সত্তা নাই—একটানা বহিয়া চলিয়াছে। পংক্তিগুলি ছোট বলিয়া যতিও যেমন ঘন ঘন পড়িতেছে, তেমনই পংক্তির সংখ্যা অল্প বলিয়া, এরূপ ক্ষুদ্র পদবন্ধ ছন্দ-সঙ্গীতে সমৃদ্ধ হইতে পারে না। বিহারীলালের কবিতায় (যেমন, 'সারদা-মঙ্গলে') বড় আকারের পদবন্ধও আছে, কিন্তু সেখানেও পয়ার-ত্রিপদীর প্রভাবই অধিক, এবং তাহাতে গীতিসুরের প্রাবল্য থাকায়, সেগুলি যেন গানেরই এক একটি কলি; তাহাতে পদবন্ধের বিশিষ্ট মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—

পুজিবার তরে ফুল ঝরে' পড়ে যায়,
    হৃদিফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিনী মুগ্ধমুখে চায়,
    ধায় অলি অধরে বসিতে।
    স্পর্শে পদরাগ-ভরা
    অশোক লভিল ধরা,
এলোকেশে কে এল রূপসী—
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী!
(মহিলা কাব্য)

এই পদবন্ধটি একটি অষ্টক, অর্থাৎ আয়তনে বেশ বড়; ইহাতে লক্ষণীয় দুইটি,—হ্রস্ব ও দীর্ঘ অসমান পংক্তির দ্বারা ব্যূহ-রচনা; এবং মিলবিন্যাসের স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র্য। প্রথম চারিটি পংক্তির দ্বারা একটি একান্তর-মিলের চতুষ্ক সৃষ্টি হইয়াছে; মধ্যে দুইটি অতি হ্রস্ব স-মিল পংক্তি; শেষের দীর্ঘতর পয়ার-পংক্তি দুইটিতে ক্ষণ-রুদ্ধ সঙ্গীতস্রোত মুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ ঝংকারে নিঃশেষ হইয়াছে। আমি বলিয়াছি, এবং পরে দেখাইব যে, আয়তনে বড় না হইলে পদবন্ধের ছন্দ-সৌন্দর্য্য বা সঙ্গীত-সুষমার মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। এ যুগের অপর দুই মহাকবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দ্বারা পদবন্ধ-ছন্দের বিশেষ উন্নতি হয় নাই, তাহাতে ঐ যুগের লক্ষণগুলিই আছে। হেমচন্দ্রের কবিতায় প্রত্যেক পদবন্ধের শেষে, গানের ধূয়ার মত পূর্ব্ববর্ত্তী কোন একটি পদের পুনরাবৃত্তি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে ছন্দও যেমন বাজিয়া উঠে, তেমনই পংক্তি-প্রবাহে একটা স্পষ্ট ছেদ পড়ে; কিন্তু তাহাতে আর কোন কারিগরি নাই। নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'র একটি সাধারণ লক্ষণযুক্ত পদবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম—

এই কি পলাশিক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেইখানে,—কি বলিব?—বলিব কেমনে!
অদৃষ্টের সেই ক্রীড়া, মহা আবর্ত্তন,
মানবের এক ক্ষুদ্র করপরশনে!
যেইখানে মোগলের মুকুট-রতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে?
যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে?

দুর্ব্বল বাঙ্গালি আজি, মানস নয়নে
দেখিবে সে রণক্ষেত্র। তবে হে কল্পনে!—
('পলাশির যুদ্ধ'—তৃতীয় সর্গ)

ইহাকে প্রায় বৃহত্তম পদবন্ধ বলা যাইতে পারে—এ গুলি দশ পংক্তির এক একটি দশক। অতএব, ইহাতে পদবন্ধের সর্ব্ববিধ কারিগরির অবকাশ আছে। কিন্তু কবি সে দিকে দৃষ্টি দেন নাই; বর্ণনা ও আখ্যানমূলক দীর্ঘচ্ছন্দ কাব্যে তিনি কলাকৌশলের দিকে কিছু মাত্র অবহিত হন নাই, তাহার ফলে, এই পদবন্ধগুলিতে মিলেরও যেমন কোন নিয়ম নাই, তেমনই পংক্তিগুলি, ঢালাও পয়ারের মত, সর্ব্বত্র সমান পদযোজনায়, পরস্পরের অনুধাবন করিতেছে; শুধু তাহাই নয়, এতবড় পদবন্ধও শেষ হইতেছে না, পরবর্ত্তীর উপরে গড়াইয়া পড়িতেছে! অতএব, আকারে যেমন হোক, গঠনে এই পদবন্ধ অতিশয় শিথিল, এবং ইহার স্রোতও প্রায় একটানা। তথাপি অনেক স্থলে, মিলের সতর্কতায় এবং ভাবের সম্পূর্ণতায়, "পলাশির যুদ্ধ" পদবন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে, এবং কাব্যবিশেষের পক্ষে বাংলা পদবন্ধও যে কিরূপ উপযোগী হইতে পারে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। রবীন্দ্র-পূর্ব্ব যুগের কবিতায় বাংলা পদবন্ধ-রচনা ইহার অধিক অগ্রসর হয় নাই।

(৩)

রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা ছন্দের অশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তেমনই বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিরূপে, পদবন্ধ-রচনাতেও ছন্দ ও মিলের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখাইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, উৎকৃষ্ট পদবন্ধের লক্ষণ এই যে, তাহাতে নানাবিধ পংক্তি ও মিলের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ ছন্দ-মণ্ডল সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং প্রত্যেক পদবন্ধ এক একটি ভাবকে যেন সম্পূর্ণ করিয়া শেষ পংক্তিতে বিরাম লাভ করে—যদিও সেই ভাবগুলি মূল কবিতারই অঙ্গ; অতএব, পদবন্ধগুলি যেন ঐ কবিতা-সৌধের এক একটি খিলান। প্রত্যেক খিলানটি মজবুত ও সুদৃশ্য হইলে সমগ্র কবিতা-সৌধটিও সুন্দর হইবে। এ জন্য কবি-মিস্ত্রীকেও অতিশয় কৌশল ও যত্ন সহকারে পদবন্ধগুলি রচনা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা পদবন্ধের প্রথম সজ্ঞান ও নিপুণ শিল্পী; বিভিন্ন ছন্দের বিভিন্ন সুর-সন্নিবেশে—পদ, পর্ব্ব ও যতির সর্ব্ববিধ কৌশলে, তিনি এই পদবন্ধকে

গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ বাহন করিয়া তুলিয়াছেন। অতঃপর, আমি তাঁহার সেই অপূর্ব্ব গীতি-কৌশলপূর্ণ পদবন্ধ-রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব; প্রথমে গীতিচ্ছন্দ বা পর্ব্বভূমক ছন্দের কারিগরি দেখাইব।—

(১) নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া, পাতাগুলি গতিহারা,
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে।
শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকণে,
এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে।
('দিনশেষে'—চিত্রা)

এই পদবন্ধে এক ছন্দ ছাড়া আর কোন নূতনত্ব নাই—পূর্ব্বযুগের পদবন্ধের মতই ত্রিপদীর স্পষ্ট প্রভাব ইহাতেও আছে; কেবল, ছন্দটি নূতন—চারমাত্রার (দৈমাত্রিক) পর্ব্বভূমক এবং মিলবিন্যাসে সঙ্গীত-কুশলতা আছে।

(২) যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল-কুঞ্জ-তিমিরে,
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে, সখি, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।
(বর্ষামঙ্গল—কল্পনা)

তিন মাত্রার (ত্রৈমাত্রিক) পর্ব্বভূমক। পদবন্ধটির গঠনে যেন দুই সমান ভাগ আছে—প্রথম চারিটি পংক্তি একটি ক্ষুদ্র চতুষ্ক-আকারের পদবন্ধ, দ্বিতীয়টিও তাহাই; এই দুইটিকে একটি গোল ডিবার গোলার্দ্ধের মত কানায় কানায় মিলাইয়া এক দেহে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার জন্য মিল-বিন্যাসের চাতুরী লক্ষণীয়; গঠনটি এইরূপ—ক ক খ র্খ। গ গ র্খ খ খ র্খ—র্খ খ—ইহাতেই দুইটি ভাগ ডিবার ঢাকনির মত মিলিয়াছে; খণ্ড-চরণ দুইটির এই মিল-বিন্যাস-কৌশলে পদবন্ধটি আরও সঙ্গীতময় হইয়া উঠিয়াছে।

(৩) বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা,
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা॥

('অভিসার'—কথা)

অথবা—

এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ,
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন,
পঞ্চ নদীর ঘেরি দশ তীর
এসেছে সে একদিন॥

('বন্দী বীর—কথা)

এই সকল পদবন্ধ দ্রুততর গীতিচ্ছন্দে রচিত—এই জন্য গীতি-কথা (Ballad)-জাতীয় কবিতার বড়ই উপযোগী। রবীন্দ্রনাথই এইরূপ পদবন্ধের সাহায্যে বাংলা ছন্দে উৎকৃষ্ট গীতিকথা রচনার পথ ক করিয়াছেন—ইহাও বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁহার একটি অমূল্য দান।

(৪) নদী-কূলে-কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীব রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগন-কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ-সোণায় সোণায়,
নির্জ্জন ক্ষণে কখন অন্য-মনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে॥

('লীলা-সঙ্গিনী'—পূরবী)

—খাঁটি রবীন্দ্রীয় পদবন্ধের একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে রবীন্দ্র-গীতিচ্ছন্দের সকল লক্ষণ আছে। ছন্দ—ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বভূমক; পংক্তিগুলি আরম্ভ হইয়াছে—১২ ও ৮ মাত্রায়, গঠনে, আয়তনে ও পংক্তিসজ্জায়, পূর্ব্বেকার সাধারণ ছাঁদই

বজায় আছে, কিন্তু দুই কৌশলে ইহার ছন্দসঙ্গীত চরমে উঠিয়াছে—ঘন ঘন মধ্য-মিল, এবং মাঝের তিন পংক্তির মাত্রা-বৃদ্ধি, যেন ভাবাবেশে কণ্ঠ আর বাধা মানিতেছে না! আর একটি কারণও আছে—পদ-শেষের মিলগুলি প্রায় ডবল-মিলের মত, তাহাতে ভাবের উদ্দীপনা ও অধীরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই গীতিরসপ্রধান পদগুলিতে প্রায়ই শেষে একটি পূর্ব্ব-পদের পুনরাবৃত্তি থাকে, তাহাও পদবন্ধ-রচনার একটি সাধারণ কৌশলরূপে গণ্য; এইরূপ পুনরাবৃত্তি বাংলা গীতিকবিতার স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও হয়—পুরাতন কবিরাও ইহাতে রীতিমত অভ্যস্ত ছিলেন। আধুনিক যুগে হেমচন্দ্রপ্রমুখ কবিগণ ইহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথই ইহাকে সত্যকার কাব্যচ্ছন্দের মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। এইরূপ পুনরাবৃত্তির একটা সুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা সহজেই পদবন্ধগুলিকে 'বন্ধ' করা যায়, অর্থাৎ উহার ভাবস্রোতকে পৃথক করিয়া একটা সমাপ্তি-চিহ্ন দেওয়া যায়।

(৫) ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হ'ল
কালিন্দীরি কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর 'পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে॥

('জন্মান্তর'—ক্ষণিকা)

—Hypermetric-যুক্ত ছড়ার ছন্দে উজ্জ্বল গীতিরসপূর্ণ লঘুললিত একটি পদবন্ধ—যেন খঞ্জনীর সঙ্গে নূপুরও বাজিতেছে! ইহার প্রথম চারিটি পংক্তি আসলে দুইটি দীর্ঘ পংক্তি; শেষের চারিটি পংক্তিও তাই—সর্ব্বসমেত ছয়টি পংক্তি আছে; মিল আছে দুইটি; অতএব ইহার ছন্দমণ্ডল যেমন ক্ষুদ্র, যতি ও মিল-বিন্যাসে তেমনই কোন জটিলতা নাই; এই জন্য ইহার গীতি-সুর এমন তরল ও তরঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'য় এইরূপ ছড়ার ছন্দে রচিত নানা ছাঁদের লঘু-ললিত পদবন্ধের অন্ত নাই।

এইবার, পয়ার বা পদভূমক ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদবন্ধ-কবিতার নমুনা উদ্ধৃত করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে পদবন্ধ-কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমার নিজের কয়েকটি কথা বলিব। আমি নিজে যে ধরণের পদবন্ধকে উচ্চতর বা গভীরতর ছন্দ-সঙ্গীতের বাহন বলিয়া মনে করি, তাহা ঠিক এইরূপ গীতোচ্ছল, লঘুললিত, দ্রুতচ্ছন্দের পদবন্ধ নয়—আমার কান উদাত্ত-মধুর দীর্ঘচ্ছন্দের অনুরাগী; ইংরাজ কবিদের পদবন্ধ-রচনায় আমি সেই সুরের বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমার মনে হয়, গীতিকবিতার পদবন্ধেও সেইরূপ স্নিগ্ধ-মধুর অথচ গভীর-গম্ভীর—শুধুই সম্ভব নয়—উপাদেয়ও বটে। কারণ, রোমাণ্টিক গীতি-বিহ্বলতার মধ্যেই ক্লাসিক্যাল সংযম ও দার্ঢ্য থাকিলে, রস যেমন গভীর—তাহার আবেগও তেমনই স্থায়ী হইয়া থাকে; জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অপেক্ষা কালিদাসের 'মেঘদূতে'র কাব্যরস, ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে যে গাঢ়তর—তাহা কে অস্বীকার করিবে? বাংলা কাব্য-সরস্বতীর ছন্দ-বীণার সেই উদাত্ত-মধুর গভীর গীত-ধ্বনি পয়ারের স্বর্ণতন্ত্রীতেই সম্ভব, তাই রবীন্দ্রনাথও এই পয়ারছন্দে যে কয়টি পদবন্ধ-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের গঠনও যেমন, ছন্দধ্বনিও তেমনই—বাংলা কাব্যে অশ্রুতপূর্ব্ব বলিলেই হয়। আমি এখনই এইরূপ কয়েকটি পদবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি—মন্তব্যও সঙ্গে সঙ্গে করিব।—

(১) যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত-গান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।

('হৃদয়-যমুনা'—সোনার তরী)

পয়ার ছন্দের পদবন্ধ—ত্রিপদী-চৌপদীরও ছাপ স্পষ্ট আছে; তথাপি, দীর্ঘচ্ছন্দের পদ, প্রথম ও শেষের দুইটি খণ্ড-চরণ, এবং আগাগোড়া একটি প্রধান মিল—এই তিন কারণে, ভাবের অনুরূপ ছন্দ-দেহ গড়িয়া উঠিয়াছে; তা ছাড়া এ সকল

কবিতার শব্দ-যোজনায় যে ধ্বনিসঙ্গীত (phrasal music) আছে, তাহা কোন ছন্দশাস্ত্রের অধীন নয়—ভাবের সহিত ভাষা, এবং ভাষার সহিত ছন্দের এমন সঙ্গতি সত্যকার কবিপ্রেরণা-সাপেক্ষ; তাই, এই পদবন্ধটিকে কেবল গণিয়া বা মাপিয়া দেখিলেই হইবে না—পাঠকের প্রাণ, কান ও কণ্ঠ এই তিনেরই সমান সাহায্য চাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, এবং বিশেষ করিয়া এইরূপ পদবন্ধ-কবিতায়, আমরা কাব্যের যে পরম রস-রূপের সাক্ষাৎ পাই, একজন ইংরেজ লেখক তাহাকে এইরূপ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"sound married to sense in one harmonious rhythmic whole"। অনেক পদবন্ধই "one harmonious rhythmic whole" হইতে পারে, না হইলে রচনাহিসাবেও তাহা সার্থক নহে; কিন্তু—"sound married to sense," অথবা, ভাবের সহিত ছন্দধ্বনির যে একাত্মতা-সাধন, তাহা কবিতা নয়, কবির পক্ষেই সম্ভব।

(২) যুগযুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী—
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।
('উর্ব্বশী'—চিত্রা)

পদভূমক ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত কবিতার পদবন্ধ যে এক একটি পৃথক ও সম্পূর্ণ ছন্দমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মূলে আছে হ্রস্ব ও দীর্ঘ পংক্তি যোজনা ও মিলবিন্যাসের কৌশল। পদবন্ধটি একটি নয় পংক্তির 'নবক', চরণের পূর্ণ বর্ণ-সংখ্যা ১৮, ক্ষুদ্রতম পদের বর্ণ-সংখ্যা ৬; মধ্যে দুইটি ১০ ও ১৪ অক্ষরের চরণও আছে। অতএব এই পদবন্ধের গঠনে বেশ একটু জটিলতা আছে, ইহার আয়তনও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; খণ্ড চরণগুলি ইহার ছন্দস্রোতকে কিরূপ তরঙ্গিত করিতেছে তাহা যেমন লক্ষণীয়, তেমনই শুধু মিলবিন্যাস নয়—মিলগুলির নির্ব্বাচনেও সূক্ষ্ম কারিগরি রহিয়াছে; এইরূপ যতি ও মিলের বিবিধ

আবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই এই উৎকৃষ্ট পদবন্ধের ছন্দসঙ্গীতে একটি আত্মসংকারী সৌষম্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(৩) তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জ্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতুহল-কোলাহল আনি
মোর গান হানি'।
('তপোভঙ্গ'—পূরবী)

ইহারও প্রধান পংক্তিগুলি ১৮ অক্ষরের পয়ার; কেবল মধ্যে একটি মধ্যমিল-পংক্তি আছে, তাহাতে এই গুরুগম্ভীর পদবন্ধের ছন্দগ্রন্থি একটু শিথিল হইয়াছে—ভাবের দিক দিয়া হয়ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কবিতার ছন্দশরীরে অনাবশ্যক দোলা লাগিয়াছে, বলিয়া মনে হয়। তথাপি, এ ধরণের পদবন্ধ রবীন্দ্রনাথ বেশি রচনা করেন নাই—'উর্ব্বশী'র পর ইহাই বোধ হয় প্রথম ও শেষ, অন্ততঃ এমন সুসম্বদ্ধ দীর্ঘ পংক্তিযুক্ত সম্পূর্ণ ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গির পদবন্ধ তিনি আর রচনা করেন নাই; ইহার ভাষায় বা সুরে না হইলেও, গঠনে 'উর্ব্বশীর' সহিত সাদৃশ্য আছে তাই সে সম্বন্ধে আর কিছু লিখিলাম না।

এই ছন্দ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেও, তাঁহার কবি-স্বভাব, ছন্দে ও মিলে, এতটা সংযমের পক্ষপাতী নয়—সে বিষয়ে তিনি খাঁটি রোমান্টিক, তাহার নিদর্শন স্বরূপ আর একটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।—

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্য্যোগে খড়্গ হানি'
ফেলো, ফেলো টুটি'।
হে সূর্য্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনক-পদ্মখানি
দেখা দিক্ ফুটি'।
বহ্নি-বীণা বক্ষে ল'য়ে, দীপ্ত কেশে উদ্বোধিনী বাণী
সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি
মোর জন্মকালে

প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি'
আমার কপালে।
("সাবিত্রী"—পূরবী)

এই পদবন্ধের ছন্দ প্রায় একটানা বহিয়াছে; দীর্ঘ পংক্তিগুলিতে ছন্দের যে পক্ষবিস্তার আছে তাহা যেন তখনই পরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পদগুলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। পংক্তিগুলির ক্রম প্রায় এক, এবং দীর্ঘ যতিগুলির স্থানে সর্ব্বত্র সম-মিল শব্দ থাকায় পদবন্ধটি মুক্তচ্ছন্দ লিরিক গীতখণ্ডের মত হইয়া উঠিয়াছে। মিলগুলিও সবল নয়; তার উপর, শেষের দুইটি ছাড়া, আর সবগুলি সম-স্বরান্ত (ই-কার) হওয়ায়, ছন্দমণ্ডলের ধ্বনি একঘেয়ে হইয়াছে। এরূপ শৈথিল্য অবশ্য এইখানেই ঘটিয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এইরূপ মুক্তচ্ছন্দ গীতিসুরপ্রধান পদবন্ধই যে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্মের অনুকূল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উপরে রবীন্দ্রীয় পদবন্ধের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ পয়ার-ছন্দে উৎকৃষ্ট পদবন্ধ রচনা করিয়া থাকিলেও, সেই ছন্দে জটিলতর ও বৃহত্তর পদবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন নাই—আমি যে ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শের কথা বলিয়াছি, সেই আদর্শে তিনি দুই একটি উৎকৃষ্ট পদবন্ধ-কবিতা রচনা করিলেও, তাঁহার অক্লান্ত ও অফুরন্ত ভাব-কল্পনার পক্ষে এইরূপ নিয়ম-সংযম রুচিকর হয় নাই। রবীন্দ্রোত্তর কবিগণও এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই, তাঁহারা রবীন্দ্র-রীতির অনুসরণে বহুতর তরলোচ্ছল গীতিসুরের পদবন্ধ রচনা করিয়াছেন—কিন্তু সেই সুরকেই গাঢ়তর ও গভীরতর করিবার যে উপায় বাংলা পয়ার-ছন্দে রহিয়াছে, এবং বাংলায় সেইরূপ পদবন্ধ অভিনব কাব্যরস-সৃষ্টির পক্ষে কত প্রয়োজন, তাহা অনুধাবন করেন নাই।

কিন্তু, পদবন্ধের যে ক্ল্যাসিক্যাল রূপ—তাহার গঠন-পরিপাট্য, যতি ও মিল-বিন্যাসের সংযত সুষমা, এবং গীতিসুরের 'তরলতার পরিবর্ত্তে যে গাঢ়তার কথা বলিয়াছি—আমি নিজে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া, বাংলা ছন্দে তাহার সেই আকৃতি ও প্রকৃতির বিকাশ-সাধনে যে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলাম, অতঃপর তাহারই কিছু পরিচয় দিব—কবিতাহিসাবে নয়, পদবন্ধেরই পরিচয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য। সনেট-নামক বৃহত্তম পদবন্ধ রচনায় আমি কিঞ্চিৎ সাফল্যলাভ করিয়াছি—এমন কথা অনেক কাব্যরসিক বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমার পদবন্ধগুলি বোধ হয়

কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, এখানে দায়ে পড়িয়া আমাকেই তাহা করিতে হইতেছে।

বলা বাহুল্য, আমি এই পদবন্ধগুলি ইংরেজীর আদর্শেই গড়িয়াছিলাম—তৎপূর্ব্বে, কবিগুরুর কাব্যে, বাংলা ছন্দের অসীম বৈচিত্র্য আমার কানকে প্রস্তুত করিয়াছিল, ইহাও সত্য। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল—যতি, ও বিশেষ করিয়া মিলবিন্যাসের কৌশলে, নূতনতর 'ছন্দমণ্ডল' রচনা করা। মিল-বিন্যাসে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা এই যে, মিল যত দূরান্তরিত হয়—কেবল মাঝে মাঝে যুগ্ম বা একান্তর মিলও থাকে—ততই পদবন্ধের ছন্দসঙ্গীতে একটি অপূর্ব্ব সৌষম্য ঘটে; আরও লক্ষণীয় এই যে, শেষ পংক্তিটির মিল যদি পূর্ব্বের একটা দূরবর্ত্তী পংক্তির মিলের প্রতিধ্বনি হয়, তাহা হইলে সমগ্র পদবন্ধটির সঙ্গীত একটি সুন্দর সমাপ্তি লাভ করে। বলা বাহুল্য, এরূপ পদবন্ধের আয়তন কিছু বড় হওয়া চাই। আমি পর পর তিনটি উদাহরণ দিব।—

(১) অন্ধ আমি—জাগি তাই সারারাত পরশ-পিয়াসে,
শয়ন শিয়রে মোর জ্বলে না প্রদীপ,
হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাঁধি বাহুপাশে—
অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া ফোটে লক্ষ নীপ।
মিলন-রজনী মোর আঁধার-শ্রাবণ,
দুই দেহ তটে সে কি দুরন্ত প্লাবন।
অন্ধ হয় অন্ধকার! অন্ধ-আঁখি বিদ্যুৎ বিকাশে!
সে মুহূর্ত্তে আমি যে গো মরণ-অধিপ।
('স্পর্শ-রসিক'—বিস্মরণী)

(২) শরতের সন্ধ্যা-মেঘে যত রঙ ছিল
ফুলে ফুলে আঁকা তাই আজি বনে বনে;
কবিকণ্ঠে যত গান যেথায় ধ্বনিল,
স্বনিছে মধুরতর আজি মনে মনে।
স্মৃতির সুরভি-ঘ্রাণে প্রাণ ভরপুর,
(অন্ধকারে নেবুফুলে গুঞ্জরিছে অলি!)
ভালবেসেছিনু সেই কিশোর-বয়সে
যত জনে—যৌবনের ব্যথা সুমধুর
ভুঞ্জিনু যাদের সাথে, সম কুতূহলী—
তাদেরি মেলায় মিলি স্বপন-রভসে।
('শ্রীপঞ্চমী'—হেমন্ত-গোধূলি)

(৩) যে-সুরে সাধিল গীত একদা সে অজয়ের কূলে—
আঙিনায় একা বসি' হেরি মেঘে-মেদুর অম্বর,
যে-রস অমৃত-বিষে মুরছিয়া মরমের মূলে
দ্বিজ-কবি করেছিল এ জাতিরে গানে জাতিস্মর,—
সেই রসে, সেই সুরে, এতকাল পরে তুমি, কবি,
যুক্তবেণী মুক্ত করি' বহাইলে হৃদয়-জাহ্নবী
বাঙ্গালায় ; এই জল এই মাটি, এই ছায়ালোক
গুঞ্জরিল সুন্দরের স্বপ্নময় স্নেহের কাহিনী !
এ জীবনে এত শোভা !—নহে শুধু শ্মশানবাহিনী—
এ নদীর উভ-কূলে বারাণসী—ভূলোকে দ্যুলোক !
('কবিবরণ'—স্মরগরল)

প্রথম ও তৃতীয় পদবন্ধের পংক্তি-সংখ্যা যথাক্রমে ৮ ও ১০; প্রথমটিতে পংক্তিগুলি সমান নয়, এবং মিলবিন্যাস এইরূপ—ক খ ক খ গ গ ক খ : অর্থাৎ প্রথমে একটি একান্তর মিলের চতুষ্ক (quatrain), মাঝে দুইটি মিলযুক্ত পয়ার-পংক্তি, এবং শেষের দুই পংক্তির মিল অসম্পূর্ণ থাকিয়া দূরবর্তী প্রথম পংক্তিগুলির সহিত মিল রক্ষা করিতেছে। এইরূপ মিল-বিন্যাসের দ্বারাই এই পদবন্ধ এমন গাঢ়বন্ধ ও ছন্দোময় হইয়া উঠিয়াছে, এবং ঐ দূরান্তরিত মিলের মধ্যস্থলে দুইটি মিলযুক্ত পংক্তি থাকায় ইহার সঙ্গীত-গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় পদবন্ধের প্রথম চারিপংক্তিও একটি একান্তর-মিলের চতুষ্ক, শেষের চার পংক্তিও তাই—কিন্তু মিলবিন্যাস একরূপ নয়, ইংরেজীতে যাহাকে enclosing rhyme বলে সেইরূপ,—ঘ ঙ ঙ ঘ ; মধ্যে এক জোড়া মিলযুক্ত পংক্তি ; ইহার পংক্তিগুলিও সমান দীর্ঘ—১৮ অক্ষরের পয়ার। ইহাতেও মিলবিন্যাসের গুণে ছন্দের প্রবাহ একটানা হইতে পারে নাই, এবং শেষের পংক্তিটিতে মিলের দূরত্ব ঘটিয়াছে বলিয়া, ইহার ছন্দসঙ্গীত সুস্পষ্ট 'সম্'-এ আসিয়া পৌছিয়াছে—প্রথমটিতে এই সম্ আরও স্পষ্ট, এবং সমাপ্তিটি আরও মৃদু-মন্থর হইয়াছে।

তৃতীয়টির মত দ্বিতীয়টিও একটি দশক—কিন্তু পংক্তিগুলি ছোট বলিয়া ইহার সুরও স্বতন্ত্র। এখানেও প্রথমেই একটি একান্তর-মিলের (cross-rhyme বা alternate rhyme) চতুষ্ক, বাকি অংশটি দূর-মিলের ষট্‌ক (sestet), তাহার মিল-বিন্যাস এইরূপ—ক খ গ ক খ গ। এখানে মিলের দূরত্বই লক্ষণীয় ; তাহার ফলে, পদবন্ধের প্রথম দিকে ছন্দ-প্রবাহ একটু দ্রুত হইয়া, শেষের দিকে ধাপে

ধাপে মন্থর হইয়া সমে পৌঁছিয়াছে। ইহার এই গঠন, ও তাহার ফলে ছন্দের যে শ্রী ও সংবৃত সুষমা লাভ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে, আমি ক্ল্যাসিক্যাল পদবন্ধ বলিতে কি বুঝি, তাহা পাঠকেরও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উপরে ওই দ্বিতীয় পদবন্ধের ষট্‌ক লইয়াই একটি পৃথক পদবন্ধ রচনা করা যায়,—তাহার পংক্তিগুলি একটু দীর্ঘতর হইলে, এইরূপ দূর-মিল ভাববিশেষের বড় উপযোগী হয়; যথা—

বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রে একদিন নিরঞ্জনা তীরে
প্রহরে প্রহরে শুনি' তব কণ্ঠে গম্ভীর 'উদান'—
সেই যে পড়িল খসি' 'মার'-হস্তে বাসনার বাঁশী,
সে আর তেমন সুরে সাধিল না ধরা-বধূটিরে!
আর সে কামনালক্ষ্মী উদিল না পূর্ণ করি প্রাণ,
তন্ত্রে মন্ত্রে শিহরিয়া হাসিল সে উদাসীন হাসি।

('বুদ্ধ'—স্মরগরল)

—এখানে মিলের দূরত্ব যেন চোরা-মিলেব কাজ করিতেছে, অর্থাৎ, পংক্তিগুলিতে যে মিল আছে তাহা সহসা ধরা পড়ে না, অথচ কানে মিলের একটি রেশ অনুভূত হয়—তাহাই ইহার ছন্দসঙ্গীতকে গম্ভীর করিয়া তোলে।

এইবার, আরও কয়েকটি গঠন-কৌশল দেখাইব—এগুলির পংক্তিসজ্জা ও মিলবিন্যাস আরও লক্ষণীয়—বিশেষ করিয়া, মধ্যে বা শেষে ভঙ্গ-পংক্তিগুলির ক্রিয়া;—

(১) ঊর্দ্ধ্বমুখে ধেয়াইয়া রজোহীন রজনীর মল্লিকা মাধবী,
নেহারি নীহারিকা-ছবি,
কল্পনার দ্রাক্ষাবনে মধু চুবি' নিরক্ত অধরে,
উপহাসি' দুগ্ধধারা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে,—
বুভুক্ষু মানব লাগি' রচি' ইন্দ্রজাল,
আপনা বঞ্চিত করি' চির ইহকাল,
কতদিন ভুলাইবে মর্ত্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব,
হে কবি-বাসব?

('মোহমুদ্গর'—বিস্মরণী)

(২) সেই কথা জাগে মনে, তবু হায় পারি না ভুলিতে—
প্রেম সে চপল বটে, এ জীবন আরও যে চপল!
যৌবন-বসন্ত শেষে ফাগুনের সে ফুল তুলিতে
হেরি, সবই রঙ-ছুট,—প্রেমেরও যে মিনতি বিফল!
তবু জানি, মধুমাসে এই দেহ মাধবী-বল্লরী—
মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে;
শেষে রচি ঝরা-ফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ!
বৃন্দাবন চির পরিহরি'
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদ-পরশে,
কালিন্দীর কূল ছাড়ি রাধিকার চলে না চরণ!
('প্রেম ও জীবন'—স্মরগরল)

(৩) সারাটি গগন ঘুরি', পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম-অচলে
পঁহুছিলে হে রবীন্দ্র! পলাতকা সে উষা-প্রেয়সী
এবার ফিরাবে মুখ—চিরতরে উঠিবে বিকশি'
ক্ষণিকের দেখা সেই আভা তার কপোল-যুগলে!
তারি লাগি' নিশান্তের তারাময় তিমির-তোরণ
খুলিয়া বাহিরি' এলে, তব নেত্রে নিমেষ-হরণ
করেছিল সে উর্ব্বশী—আলোকের প্রথম প্রতিমা!
তোমার উদয়-ছন্দে জাগিল সে রূপের হিল্লোল,
মেঘে মেঘে মুহুর্মুহু কি বিচিত্র বরণ হিল্লোল!
ধরণী ফিরিয়া পে'ল অসিত নিচোলে তার হরিত-নীলিমা,
অম্বুনিধি আরম্ভিল মৃদু কলরোল!
('রবীন্দ্র-জয়ন্তী'—হেমন্ত-গোধূলি)

প্রবন্ধ পদবন্ধটির সম্বন্ধে, আশা করি, কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নাই—হ্রস্ব-দীর্ঘ পংক্তি-সজ্জাই ইহার ছন্দ-সঙ্গীতের প্রধান সহায় হইয়াছে—মিল-বিন্যাসে কোন জটিলতা বা কারিগরি নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদবন্ধের কাঠামো আমি যথাক্রমে Keats ও Swinburne হইতে লইয়াছি, তাহাতে প্রমাণ হয়, ছন্দের পার্থক্য থাকিলেও, গঠন-নৈপুণ্যই পদবন্ধ-কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য—ছন্দ যেমনই হোক—তাহাতেই যে বহুবিধ সঙ্গীত-সৌষম্যের সৃষ্টি হয়, তাহাই পদবন্ধের প্রাণ; সেই "one harmonious rhythmic whole" এইরূপ বৃহত্তর আয়তনের পদবন্ধে যেমন সম্ভব তেমন আর কোথাও নয়; অমিত্রাক্ষরের verse paragraph-ও ইহার উপযোগী বটে, কিন্তু সে ছন্দে সাধারণ কাব্য রচনা হয় না, সে ছন্দও

দুরূহ। আমি প্রথমে ইংরাজী পদবন্ধ দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি; উপরি-উদ্ধৃত দ্বিতীয় পদবন্ধের আদর্শ—কবি কীট্স্‌এর এই stanza—

Thou wast not born for death, immortal Bird!
No hungry generations tread thee down;
The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown:
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when sick for home,
She stood in tears amid the alien corn;
The same that oft-times hath
Charm'd magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.

(*Ode to a Nightingale*)

তৃতীয়টির আদর্শ নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজী পদবন্ধ—

Now all strange hours and all strange loves are over,
Dreams and desires and sombre songs and sweet,
Hast thou found place at the great knees and feet
Of some pale Titan-woman like a lover,
Such as the vision here solicited
Under the shadow of her fair vast head,
The deep division of prodigious breasts,
The solemn slope of mighty limbs asleep,
The weight of awful tresses that still keep
The savour and shade of old-world pine-forests
Where the hill-winds weep?

(Swinburne: '*Ave Atque Vale.*')

বাংলা ও ইংরাজী ছন্দের পার্থক্য ছাড়িয়া দিলেও (কারণ, বাংলা পয়ারে নিয়মিত ছন্দস্পন্দ নাই), ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দুইটি পাঠ করিলে—আর কিছু না হোক, মিল-বিন্যাস ও পংক্তিসজ্জার গুণে যে সাদৃশ্য অনুভব করা যাইবে, তাহাতেই বাংলাছন্দেও এইরূপ পদবন্ধের গৌরব কাহারও দৃষ্টি এড়াইবে না। প্রথমটিতে, শেষের পাঁচ পংক্তির দূরান্তরিত মিলগুলিই প্রথম চার পংক্তির একান্তর মিলকে আশ্রয় করিয়া একটি সঙ্গীতময় ছন্দমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ পদবন্ধ-সঙ্গীতকে এক একটি পৃথক রাগিণী বলিলেও হয়—ভাবের সহিত পূর্ণ পরিণয় না হইলে, এরূপ ছন্দরচনা নিষ্ফল হইবারই সম্ভাবনা। ওই প্রথম

পদবন্ধটিতে কীট্‌সের বিখ্যাত কবিতার ভাব-রূপ পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে—একটি অতিমধুর বিষাদ-গম্ভীর ভাব-রস; বাংলা কবিতাটিতেও তাহা আছে কিনা, পাঠকগণ দেখিবেন। দ্বিতীয়টিতে একটি বিরাট মহিমার স্তুতিগান গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। এখানে পংক্তিসজ্জার মত মিল-বিন্যাসের কারিগরি আরও অধিক; দূরান্তরিত মিলের মধ্যে মধ্যে এক এক জোড়া মিলযুক্ত পংক্তি থাকায়, এবং সর্ব্বশেষের চরণটির আয়তনে, ও মিলের অপূর্ব্ব কৌশলে—এই পদবন্ধ কাব্যচ্ছন্দের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কলকব্জা খুলিয়া দেখিলে, আদৌ 'জটিল বলিয়া মনে হইবে না, শেষের ওই যাদুমন্ত্রময় খণ্ড' পংক্তিটি বাদ দিলে, দুইটি চতুষ্ক এবং তাহাদের মধ্যে একজোড়া স-মিল পংক্তি—ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই; তখন কেবল মিল-বিন্যাসের চাতুরীই চোখে পড়িবে—ওই দুই চতুষ্কের মধ্যেও দূর-মিল ও জোড়া-মিল আছে (কখখক), সর্ব্বশেষের ঐ খণ্ড-চরণটিকে যাদুমন্ত্রময় বলিয়াছি এই জন্য যে, ঐটিতে আসিয়া সমগ্র ছন্দ-সঙ্গীত একটি অপূর্ব্ব সমাপ্তি লাভ করিয়াছে—সে যেন "like a wind gathering in volume and dying away again immediately on attaining a culminating force."। ছন্দ ও মিলের এমন সূক্ষ্ম কলা কৌশল, আমি আর কোথাও দেখি নাই। তাই, আমাদের কবিগুরুকে—বাংলাছন্দের সেই যাদুকরকে—স্তুতি-নিবেদন করিবার জন্য, আমি এই ইংরেজী পদবন্ধের সাহায্য লইয়াছিলাম, আত্মকৃতিত্বের মোহবশে ইহাও মনে করি যে, আমার এই রচনাটিও বাংলা পদবন্ধের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। আমি ইংরাজী Spenserian Stanza-র ও যে ছন্দানুবাদ করিয়াছি, এখানে তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না—'স্মরগরলে'র 'নারী-স্তোত্র' কবিতাটি ঐ ছন্দে রচিত। সর্ব্বশেষে, গীতিচ্ছন্দে রচিত আমার আর একটি পদবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া এই উদ্ধৃতি-পর্ব্ব শেষ করিব, বাংলা গীতিচ্ছন্দেও, মাত্র কয়েকটি ছোট-বড় পংক্তির সাহায্যে, আমি পরিপূর্ণ ছন্দমণ্ডল-সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছি, ইহাও তাহারি দৃষ্টান্ত।—

আমার নয়ন-পুতলিতে হের তোমার রূপের ছায়া—
দর্পণ ফেলে দাও!
থির-কটাক্ষে আঁখি মেলি' সখি চাও।

সোনার মুকুরে কিবা কাজ তব ?—এ মনোমুকুর তলে
যে দীপ-দহনে হৃদয়-গহনে মমতার মোম গলে—
তাহারি আলোকে নেহারি ও মুখ-ছায়া
ভুলে যাবে—তুমি নারী নশ্বর-কায়া,
দর্পণ ফেলে দাও !
কেতকী-পরাগে পাণ্ডুর করি ললাটের হেমভাতি—
অঙ্কিত-কুঙ্কুম,
অধরে ভরেছ মদিরা সুরভি চুম্।
হেথা হের, তব সীমন্ত-তলে উষার-ধূসর নিশা—
একটি সে তারা, বুকে জ্বলে তার উদয়-আলোর তৃষা !
মোর স্বপনের পোহাইছে শেষ-রাতি,—
তা' লাগি তোমার অধরে হাস্য-ভাতি !
দর্পণ ফেলে দাও !

('রূপ-দর্পণ'—হেমন্ত-গোধূলি)

শেষের এই দুইটি পদবন্ধে, ছন্দমণ্ডল, বা "harmonious rhythmic whole" সহজেই কানে ধরা দিবে। এই পদবন্ধের আর একটি লক্ষণ—ইহার ছন্দ-প্রবাহের উঠা-নামা,—ইংরেজীতে যাহাকে crescendo effect বলে তাহার স্পষ্ট আভাস ইহাতে আছে। দীর্ঘ ও হ্রস্ব পংক্তিসজ্জা; প্রথম পংক্তির সহিত পরের দুই পংক্তির যতি ও মিলগত সৌষম্য; মাঝের দুই দীর্ঘ পংক্তি এবং শেষে আকার ক্ষুদ্রতর পংক্তিযোগে ছন্দের বেগ ক্রমে মন্থর হইয়া শেষে একেবারে থামিয়া যাওয়া—ইহাই এই পদবন্ধের অন্তশ্চারী সঙ্গীতধারার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ। গীতিচ্ছন্দে রচিত হইলেও ইহার সুর তরল নয়, ইহাও লক্ষণীয়। আমার বিশ্বাস, এই কারণে পদবন্ধে এই ছাঁচটি একশ্রেণীর কাব্যবস্তুর উপযুক্ত বাহন হইতে পারে; ইহার আয়তনও যেমন নাতিক্ষুদ্র, তেমনই ইহার গঠনে ও ভঙ্গিতে গীতিসুরের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দুই-ই আছে।

পদবন্ধ-কবিতার এই যে সবিস্তার আলোচনা করিলাম, ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ, এই জাতীয় ছন্দোবন্ধ কাব্যসৃষ্টির একটি বড় সহায়, এবং কবিতার বিশিষ্ট সম্পদ; অথচ বাঙালী কবি বা কাব্যরসিক এখনও ইহার মর্য্যাদা ও রূপ গুণ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হন নাই। কেবল ভাষা ও ছন্দ নয়—কাব্য-শরীরের গঠন-পারিপাট্যের উপরেও কাব্যের সৌন্দর্য্য কতখানি নির্ভর করে; ছন্দকে উপাদান করিয়া যে বিবিধ ছাঁচ নির্ম্মাণ করা সম্ভব—ভাবকে

রূপ দিবার পক্ষে তাহারও সামর্থ্য কিরূপ; এবং ছন্দ যে শুধু কবিতার অলঙ্কার মাত্র নয়—ইহাই বুঝাইবার জন্য, আমি অক্লান্তভাবে এই দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের পরেও, বাংলা ছন্দে পদবন্ধ-রচনার যে পরীক্ষামূলক প্রয়াস আমি নিজে করিয়াছি, তাহাতে সাফল্যলাভ যেমনই হোক—কর্ত্তব্যবোধে তাহারও একটি বিবৃতি দিলাম, নহিলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

সর্ব্বশেষে, পদবন্ধ-রচনা-সম্বন্ধে এই কয়টি কথার পুনরুল্লেখ করিয়া আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করিলাম—(১) পদবন্ধ, কবিতার প্যারাগ্রাফ মাত্র নয়—কবিরা একটানা ছন্দে দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়া তাহার যে পংক্তি-ভাগ করেন, তাহা খাঁটি পদবন্ধ নয়। (২) তিন বা চার পংক্তির পদবন্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর পংক্তি-পর্ব্বেই উৎকৃষ্ট ছন্দমণ্ডল রচনার অবকাশ আছে। (৩) এই 'ছন্দমণ্ডল' বা আদ্যন্তসঞ্চারী এক অখণ্ড সঙ্গীত-সৌষম্যই (অমিত্রাক্ষরের Verse-pargraph এর মত) সকল সার্থক পদবন্ধের প্রধান লক্ষণ। ইহা সৃষ্টি করিবার উপায় দুইটি,—মিল-বিন্যাসের কারিগরি, এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ পংক্তির সজ্জা-কৌশল। (৪) বাংলা পর্ব্বভূমক ছন্দে বা ছড়ার ছন্দে, অথবা পুরাণো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে, অতিশয় উচ্ছল গীতিসুরের পদবন্ধ রচনাই সম্ভব, কিন্তু গভীর ভাব ও উদাত্ত-গম্ভীর সুরের জন্য পদভূমকের দীর্ঘচ্ছন্দই উপযোগী। (৫) মিল একটু দূরান্তরিত হইলে, তাহা কতকটা অপ্রকট থাকিয়া ছন্দসঙ্গীতকে গূঢ় ও গাঢ়তর করে। (৬) আমি যাহাকে আদর্শ বা উচ্চাঙ্গের পদবন্ধ বলিয়াছি, বর্ত্তমানে তাহার প্রসার অতি অল্প হইবারই কথা, কারণ, এক্ষণে গীতিসুরের প্রাধান্য ঘটিয়াছে—এই জাতীয় পদবন্ধ গীতি-কথা, কথা-কাব্য ও ভাবনামূলক (reflective) কবিতারই উপযুক্ত বাহন। উপরের ওই কথাগুলির মধ্যে একটি কথাই প্রধান—সে ওই মিল-বিন্যাসের কথা; তাই, এই দীর্ঘ আলোচনার পরেও, একজন ইংরাজ সমালোচকের একটি উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না, তাঁহার কথাগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই মূল্যবান—

It is this very jingling sound of like endings which has enabled the immense majority of modern poets to achieve some firm structure of verse larger than the particular pattern their verses repeat.' For the rhyming of lines binds them into groups, whereby the formation of a major rhythm is obviously strengthened."

(*The Theory or Poetry:* Lascelles Abercrombie)

—আমিও সবিস্তারে এই কথাই বলিয়াছি।

বাংলা সনেট

'সনেট' নামটি বাংলায় চলিয়া গিয়াছে, তার কারণ, জিনিষটিও সম্পূর্ণ বিলাতী—এ ধরণের ছন্দ-গঠন দেশীয় কাব্যকলার চিরদিন অগোচর ছিল; তাই বাংলা সনেটের আদি রচয়িতা মধুসূদন ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন—"চতুর্দ্দশপদী কবিতা"। কিন্তু এই নামের দ্বারা ঐ জাতীয় কাব্যরচনার কোন পরিচয়ই হয় না, তাই অবশেষে বিলাতী নামটিকে বাংলা করিয়া লওয়া হইয়াছে, যেমন—টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি।

সনেট কি বস্তু, তাহার একটা স্থূল ধারণা বাঙালী কবিতা-পাঠকের আছে বলিয়াই মনে হয়, কারণ চৌদ্দপংক্তির ছোট ছোট কবিতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাই যে 'সনেট', এটুকু অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু পংক্তির সংখ্যাই সনেটের প্রধান পরিচয় নয়—এমন কি, স্থলবিশেষে, চৌদ্দ লাইনের কবিতামাত্রেই সনেট নয়, তার কারণ, উহার ভিতরে ও বাহিরে এমন কতকগুলি লক্ষণ থাকা চাই—ভাবে ও রূপে এমন মিল থাকা চাই—যে, খাঁটি সনেট-রচনায় অনেক বড় বড় কবিও খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ কি, তাহারই সবিস্তার আলোচনা করিব।

প্রথমেই সনেটের একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা মন্দ হইবে না। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে পদবন্ধ (stanza) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি—সনেট সেইরূপ পদবন্ধই বটে—বৃহত্তম পদবন্ধ; শুধু তাহাই নয়, এক একটি এইরূপ পদবন্ধই এক একটি কবিতা; অর্থাৎ, ওই কয়টি পংক্তির মধ্যেই কবিতার ভাবও সম্পূর্ণ হইয়া থাকে; সাধারণ পদবন্ধে তাহা হয় না। অবশ্য, ফার্সী 'রুবাই'-জাতীয় পদবন্ধ এবং সংস্কৃত 'শ্লোক' এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার কাজ করিয়া থাকে—সংস্কৃত 'উদ্ভট শ্লোক' বা 'শতক' নামা কাব্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক কাব্যে পদবন্ধ সাধারণত সে কাজ করে না। অতএব সনেট বলিতে একটি সম্পূর্ণ কবিতা এবং চতুর্দ্দশ পংক্তির পদবন্ধ—দুই-ই বুঝিতে হইবে। আধুনিক কালে এমন সনেট-কাব্যও রচিত হইয়া থাকে যাহাতে সনেটগুলি যেন পদবন্ধের

মতই একই ভাব-সূত্রে গ্রথিত হয়; ইহাকে ইংরাজীতে Sonnet Sequence বা 'সনেট-পরম্পরা' বলে।' কিন্তু তথাপি সনেট বলিতে ঐরূপ একটি পদ্যবন্ধে রচিত একটি সম্পূর্ণ কবিতাই বুঝিতে হইবে। সনেটে চৌদ্দটি একছন্দের পংক্তি থাকে—ইংরাজীতে Iambic Pentameter-ছন্দই সনেটের ছন্দ; বাংলাতেও তাহার অনুরূপ চৌদ্দ-অক্ষরের পয়ারই প্রশস্ত, কখনও বা ঐ ছন্দকেই একটু দীর্ঘ করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে ছন্দের সঙ্গীত-গুণ বৃদ্ধি পায়, ভাব একটু ছাড়া পায়—কিন্তু সনেটের সংহতি-গুণ ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলায় ঐ পয়ার-পংক্তিই যে সনেটের বিশেষ উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দীর্ঘ পয়ারেও (১৮ অক্ষর) সনেটের ছন্দধ্বনি একটু গভীর ও গম্ভীর হইবার অবকাশ পায় বলিয়া, তেমন ছন্দও বাংলা সনেটে গ্রাহ্য হইয়াছে। মধুসূদন বাংলা সনেটের জন্য ১৪ অক্ষরই নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এই চৌদ্দ অক্ষরেই সনেটের কাব্যরসকে পূর্ণ রূপ দান করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাংলা সনেটের পংক্তি উহা অপেক্ষা দীর্ঘতর না হইলেও চলে।

কিন্তু ছন্দ ছাড়াও সনেটের গঠনে আরও কঠিন নিয়ম-বন্ধন আছে। প্রথম,—সনেটে, ৮ পংক্তি ও ৬ পংক্তির দুইটি স্পষ্ট ভাগ থাকা চাই, ইংরেজীতে এই দুই ভাগকে যথাক্রমে Octave ও Sestet বলে, বাংলায় 'অষ্টক' ও 'ষট্‌ক' বলিতে হইবে। দ্বিতীয়,—ঐ দুই ভাগের পংক্তিগুলিতে মিল-বিন্যাসেরও বাঁধা-বাঁধি নিয়ম আছে। অষ্টকের মিল-বিন্যাস এইরূপ—কখখক। কখখক, আট লাইনে মিল দুইটি মাত্র, এবং তাহাদের সজ্জারও কৌশল আছে। 'ষট্‌ক' বা শেষ ছয়-পংক্তির মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা আছে; সাধারণতঃ দুইটি মিলই প্রশস্ত, যথা গঘগঘগঘ, গঘঘগগঘ, গঘগগঘগ, প্রভৃতি আবার, তিনটি মিলও থাকিতে পারে, যথা—চছজচছজ, চছচজছজ, প্রভৃতি। কেবল শেষ দুই পংক্তিতে একই মিল থাকিবে না।

আরও নিয়ম আছে—(১) অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যে পংক্তিগত যোগ থাকিবে না, (২) অষ্টকের মধ্যে যে দুইটি চতুষ্ক (quatrain) থাকিবে তাহারা যুক্ত হইয়া থাকিবে না। (৩) ষট্‌কের মধ্যে দুইটি 'ত্রিপদিকা' (Tercet) ঐরূপ বিযুক্ত হইয়া থাকিবে। আদি বা ইতালীয় সনেটের গঠন এমনই দৃঢ়-সম্বদ্ধ। আধুনিক কবিগণ এই নিয়মের সবগুলি পালন করেন না। অনেকে ঐ দুই ভাগের

পংক্তিগত বিচ্ছিন্নতাও রক্ষা করেন নাই, কেবল মিল-বিন্যাসের নিয়মটি পালন করিয়াছেন; তাহাতেও রকম-ফের আছে। খাঁটি ইতালীয় বা আদি সনেটের বাংলা-রূপ দেখাইবার জন্য আমি এখানে একটি সনেট উদ্ধৃত করিতেছি—

আজ, সখি' সাঙ্গ হ'ল আমাদের মিলন-বাসর; ক
বাদলের কৃষ্ণা তিথি,—আর্দ্র বায়ু উঠিতেছে শ্বসি,' খ
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী, খ
তোমারও কাঁপিছে হিয়া, ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর! ক
—
চুরি করে' এসেছিনু, ভেটিবার নাহি অবসর— ক
জানো সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুঃখের প্রেয়সী! খ
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ-চতুর্দ্দশী, খ
বিনা-ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর! ক
—
*
*
—
যদি পুনঃ দেখা হয় চন্দ্রকান্ত চৈত্র-রজনীতে, গ
ফুলে ফুলে ভরি' দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী দুকূল; ঘ
গাব গান প্রাণ-ভরা, দুলি' দোঁহে স্বপ্ন-তরণীতে! গ
—
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল— ঘ
ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর-সঙ্গীতে, গ
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল! ঘ

('বিদায়'—স্মর-গরল)

গঠন ও মিল-বিন্যাস বুঝিবার জন্য, আমি পাশে নানা চিহ্ন দ্বারা সবগুলি নিয়মকে চিত্রবৎ চক্ষুগোচর করিয়াছি; ছোট ও বড় ভাগগুলিও দেখাইয়াছি। অষ্টকের চতুষ্ক দুইটি পরস্পর সংযুক্ত নয়; ষট্‌কের মধ্যে দুইটি স্পষ্ট tercet বা ত্রিপদিকা আছে; মিলবিন্যাসেও কোনখানে নিয়ম-লঙ্ঘন হয় নাই। অতএব এই দৃষ্টান্তটি বাঙালী পাঠকের পক্ষে খুব কাজে লাগিবে।

কিন্তু বহিরঙ্গের এই লক্ষণগুলিই নয়—সনেটের ভিতরকার ভাবমূর্ত্তিরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এ কবিতার এইরূপ একটি কাঠামো পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে বটে, কিন্তু সেই কাঠামোর উপরেই কবিতার ভাব-প্রতিমাকে ঠিকমত মাপে

মাপে বসাইতে না পারিলে সনেট-রচনা সার্থক হয় না। কবির অতিশয় ব্যক্তিগত স্বানুভূত যে ভাব—বেদনা, বাসনা, হর্ষ-শোক, ধ্যান ও কল্পনার সেই অতিগভীর অনুভূতিকে—ঐ সনেটের কাঠামোটিতে মাপিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে! এ যেন সোনার পাথরবাটি—ভিতরের ভাব যেমন অকৃত্রিম, বাহিরের ছাঁদও তেমনই কৃত্রিম! ইহার উত্তরে দুইটিমাত্র যুক্তি আছে;—প্রথম; এইরূপ ঘটনা সনেট-নামক কবিতায় সত্যই ঘটিয়াছে; দ্বিতীয়, সনেটের ঐ ছন্দোবন্ধই মুখ্য নয়, তাহা হইলে এরূপ ঘটিতে পারিত না,—ঐ ছন্দোবন্ধের মধ্য দিয়া যে একটি সঙ্গীতরূপ ফুটিয়া উঠে ('পদবন্ধ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) সেই সঙ্গীতই মুখ্য; সেই সঙ্গীতের সুরে তাহারই উপযোগী কথা গাঁথিয়া কবি যখন প্রাণের ভাবটিকে গীত-রূপে মুক্তি দেন, তখনই সনেট-কবিতার জন্ম হয়। এ যেন আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের বাঁধা রাগ-রাগিণীর মত; তাহাতে এমন একটি সাধারণ আকৃতির অবকাশ আছে যে, এক একটি মূল ভাবের বিচিত্র বাণী তাহাতেই প্রকাশ করা সম্ভব—সুরের সেই আকারের সঙ্গে একজাতীয় ভাবপ্রেরণার কোন বিরোধ নাই। সকল সনেট যে সার্থক হয় না, তাহার কারণ, সকল প্রকার ভাব-কল্পনা ঐরূপ ছন্দোবন্ধের উপযোগী নয়; যেখানে ভাববস্তুর প্রকৃতি ও ছন্দোবন্ধের আকৃতি পরস্পর সুসমঞ্জস হয়, সেইখানেই সনেট-রচনা সার্থক হয়। এইরূপ হওয়া কবির অভ্রান্ত প্রেরণার ফল—একরূপ দৈব-ঘটনার মত; তাই উৎকৃষ্ট সনেট এত দুর্লভ।

অতএব বন্ধন শুধু বাহিরের বা দেহের নয়—আত্মারও বটে; সেই আত্মার স্ফূর্ত্তিও যত অধিক, বন্ধনের এই কঠিন পীড়নে তাহার দীপ্তিও তত অধিক। এজন্য, সনেটের ভাব-বস্তু আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গভীরতায় ক্ষুদ্র হইলে চলিবে না—স্থিতিস্থাপক পদার্থের মত তাহাকে যতই চাপিয়া ছোট করা হয়, ততই তাহার বেগ যেন বৃদ্ধি পায়; সেই অতি প্রবল ও গভীর আবেগকে সংযত করিয়া, তাহাকে আরও দীপ্তিশালী করিবার জন্যই সনেটের এই নাগপাশের প্রয়োজন। অনুষ্টুপ ছন্দ যেমন অপার করুণার আবেগে জন্মলাভ করিয়াছিল, আদি-সনেটও তেমনই প্রেমের আবেগে উৎসারিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসেও প্রেমই ছিল ইহার প্রধান বিষয়বস্তু; এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রেমই ইহার একমাত্র বিষয় না হইলেও, খুব গভীর আবেগ, ভাব ও ভাবনা সনেট-কবিতার গৌরব

সৃষ্টি করিয়াছে—বৈঠকী আলাপের রসিকতা, কৃত্রিম কল্পনা-বিলাস, বা তরল ভাবোচ্ছ্বাস সনেটের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয় নাই। এ জন্য, উত্তরকালের একজন নিপুণ সনেটকার সনেট সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

A sonnet is a moment's monument,
Memorial from the soul's eternity
To one dead deathless hour. Look that it be,
Whether for lustral rite or dire portent,
Of its own arduous fulness reverent :
Carve it in ivory or ebony,
As Day or Night may rule ; and let time see
Its flowering crest impearled and orient.
A sonnet is a coin : its face reveals
The soul,—its converse, to what power 'tis due :
Whether for tribute to the august appeals
Of life, or dower in Love's high retinue
It serve : or, mid the dark wharf's cavernous breath
In Charon's palm it pay the toll to death.

উপরি-উদ্ধৃত ইংরেজী সনেটের গঠন নিখুঁত্ না হইলেও, সনেটের প্রাণবস্তুর এমন যথার্থ পরিচয় যে-কবির লেখনীমুখে বাহির হইয়াছে—সনেটের প্রতি যাঁহার এতখানি শ্রদ্ধা, তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট সনেট-রচয়িতা হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক ; ইংরাজ কবি D. G. Rossetti তাঁহার সনেট-কাব্য House of Life-এর মুখবন্ধস্বরূপ এই সনেট-কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। সনেট-কবির সম্বন্ধে একজন বিদেশী সমালোচক যথার্থ ই বলিয়াছেন—

He pipes a solitary tune of his own life, its devotion, its fervour, its prophetic exaltation, its passion, its despair, its exceeding bitterness.

যে ব্যক্তিগত, সুগভীর ও আন্তরিক অনুভূতি, ধ্যান ও গীতকল্পনার নিরন্তর আবেগে, শুক্তির মধ্যে মুক্তার মতই—প্রাণের মধ্যে, অতিশয় নিটোল, স্বচ্ছ ও উজ্জল কাব্য-বিন্দুরূপে ফুটিয়া উঠে, তাহাই সনেটের উপজীব্য। এই passion বা প্রবল-গভীর বেদনা কেবল উৎসারিত হইলেই চলিবে না,—তাহাতে উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতারও জন্ম হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে কোন বন্ধনের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু যেখানে ইহা পুটপাকের মত একটি ভাবের বন্ধনে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত

হইয়া ওঠে, সেইখানেই তাহা উৎকৃষ্ট সনেটের রূপ গ্রহণ করিতে পারে। একদিকে যেমন আবেগ, অপরদিকে তেমনই অন্তর্নিরুদ্ধ গভীরতা, এই উভয়ের প্রয়োজনে তরলোচ্ছল ভাব-বাষ্প যে নিয়মে গাঢ় হইয়া উঠে—সনেটের মিলবিন্যাস এবং অন্যান্য বন্ধন সেই নিয়মেরই ফল। কবির অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস কেমন করিয়া এই অতি কঠিন নিয়ম-বন্ধনেই সার্থক হইয়া উঠে—এই নাগপাশের কৃত্রিমতা ও সনেট-কবির অকৃত্রিম আন্তরিকতা কেমন করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করে, উৎকৃষ্ট সনেট পড়িবার সময়ে তাহাই ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এইজন্যই সনেট-রচনায় একটু বিশেষ কৃতিত্বের এবং প্রতিভার প্রয়োজন। যে-কোন ভাব বা ভাবনাকে সনেটের ছাঁচে ঢালা সম্ভব নয়—সেরূপ চেষ্টার ফলে যাহা হইয়া থাকে, আমরা তাহা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, এ বিষয়ে একজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন—

"Not only is there still a general ignorance of what a sonnet really is, and what technical qualities are essential to a fine specimen of this poetic genus, but a perfect plague of feeble productions in fourteen-lines has done its utmost to render the sonnet as effete a form of metrical expression as the irregular ballad stanza with a meaningless refrain."

এ উক্তি অতিশয় সত্য। সনেটের সম্বন্ধে—চৌদ্দ-লাইন ছাড়া কোন জ্ঞান না থাকায়, ঝুড়ি ঝুড়ি ঐ নামের কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহার ফলে, সাধারণের মনে সনেট সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধাই আর থাকে না; সে যেন একটা অতিশয় সহজ ও সস্তা কবিতা—অক্ষমতা কিম্বা আলস্যের পরিচায়ক!

এক্ষণে, ইংরেজী কাব্যে সনেটের যে আর একটি রূপ, রচনার গুণে পৃথক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। ফরাসী ভাষাতেও সনেটের রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু যেহেতু তাহার সহিত বাংলা সনেটের সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই, সেজন্য সে বিষয়ে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন; তা ছাড়া, অনেকের মতে, সে ভাষায় সনেট বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ইংরেজীতে প্রথম হইতেই সনেট-রচনায় এক প্রকার স্বাধীনতার প্রবৃত্তি দেখা দেয়, কিন্তু সেইরূপ স্বাধীনতা সত্বেও, তাহা উৎকৃষ্ট কবিত্বগুণসম্পন্ন হয় নাই; শেষে মহাকবি শেক্সপীয়ারের হাতে সেই শিথিল-বন্ধন সনেট এমন ভাব-গভীরতায় মণ্ডিত হইল যে, সনেটের

সেই রূপও অতঃপর একটি বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করিল—তাহার নাম হইল "শেক্সপীরীয় সনেট"। ইহাতে, তিনটি চারি-চরণের শ্লোকে একটি ভাব ক্রম-বিকশিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া, সর্ব্বশেষে একটি পয়ার শ্লোকে নিঃশেষ হইয়া থাকে; আদি-সনেটের সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এ চতুর্দ্দশপদীও সনেটের মান রক্ষা করিয়াছে, অতিশয় গাঢ় ও গভীর ভাবাবেগের বাহন হইয়াছে। যে ভাব একান্তই আবেগপ্রধান বা গীতি-প্রাণ—যেখানে ভাবকে একটি ভাবনায় কেন্দ্রীভূত করিয়া, সংযত সঙ্গীত-মাধুরী দ্বারা কানে ও মনে গভীরতর করিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই—সে ক্ষেত্রে সনেটের এই আকারই উপযোগী। ইহাকে আমরা Romantic বা 'মুক্তবন্ধ' সনেট বলিতে পারি। কিন্তু যেখানে ভাবনার সহিত ভাবের গভীরতা ও সংযমই বাঞ্ছনীয়, এবং উচ্ছল লিরিক-উচ্ছ্বাসকে গাঢ়তর করিতে হয়, সেখানে আদি বা Natural Sonnet-ই অধিকতর উপযোগী। শেক্সপীয়ারের পর, মিলটনই সর্ব্বপ্রথম সনেটের সেই নিয়ম-বন্ধন—সম্পূর্ণ না হইলেও—অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ পুনরায় সনেটের আদি-রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তাহারও সেই নিয়ম-বন্ধন সর্ব্বত্র নিখুঁত হয় নাই। ওইকালেই কবি কীট্স্ কয়েকটি উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও অল্পই আদি-সনেট জাতীয়। ইংরেজী কাব্যের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট সনেট মুক্তবন্ধ; অপেক্ষাকৃত বর্ত্তমান কালে রূপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke) উৎকৃষ্ট সনেট লিখিয়াছেন, তাহাদের গঠনেও কঠিন নিয়মনিষ্ঠা নাই। মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রসেটি (D. G. Rossetti) প্রভৃতির রচনায় আদি-সনেটের গৌরব কতক পরিমাণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অন্যবিধ সনেট কবিতাহিসাবে সার্থক—এমন কি, ভাব-প্রেরণার দিক দিয়া যথার্থ হইলেও, আদি-সনেটের সেই শৃঙ্খল-সুষমার অভাবে—কানে ও মনে তাহাদের রূপ একটু অসম্পূর্ণ বলিয়াই অনুভূত হয়।

সনেটের শেষে প্রায়ই একটি পয়ার-শ্লোক (rhymed couplet) যুক্ত হইয়া থাকে—শুধুই শেক্সপীরীয় সনেটে নয়, অপরবিধ সনেটেও ইহা প্রশ্রয় পায়; সে সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। শেক্সপীরীয় সনেটের এইরূপ 'rhymed couplet

ending' যথার্থই সুন্দর, কিন্তু Petrarcan বা আদি সনেটে ওইরূপ পুচ্ছ আদৌ শোভন নহে ; উভয়ের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র, কারণ—

"The Shakespearian sonnet is like a red-hot bar being moulded upon a forge, till—in the closing couplet—it receives the final clinching blow from the heavy hammer: while the Petrarcan on the other hand is like a wind gathering in volume and dying away again immediateiy on attaining a culminating force."

একটিতে যেন তপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহখণ্ডের উপরে দ্রুত হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে, এবং সর্ব্বশেষে একটি মাত্র নিপুণ আঘাতের দ্বারা তাহার গঠনটি সম্পূর্ণ হয়; অপর পক্ষে, আদি সনেটে, যেন একটা ঝড় প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া যেমনই শেষ সীমায় পৌঁছিল, অমনই তাহা প্রশমিত হইয়া ক্রমে আকাশে মিলাইয়া যায়। অতএব, আদি-সনেটের সেই যে দুই ভাগ—অষ্টক ও ষট্‌ক, তাহাও এখানে স্মরণ করিতে হইবে ; ইহাতেও ছন্দের সহিত ভাবের পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। এমন কি, ঐ ভাগটি, এবং দুই অংশে মিল-বিন্যাসের যে প্রভেদ—তাহাই ঐ জাতীয় সনেটের সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের মূল; তাই, তাহার শেষে ঐরূপ পয়ার-শ্লোক একেবারে মারাত্মক বলিলেও হয়। ইংরেজ কবি Theodore Watts-Dunton খাঁটি সনেটের ওই ছন্দ-বন্ধন সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত 'সনেট' নামক কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, এখানে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম—

A sonnet is a wave of melody:
From heaving water of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the "Octave," then returning free
Its ebbing surges in the "Sestet" roll
Back to the deeps of life's tumultuous sea.

অতএব,—ওই "ebbing surges" বা "wind dying away again" বলিতে যে গীতপ্রকৃতি বুঝায়, তাহার পক্ষে, ওই দুই ভাগও যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই, শেষে rhymed couplet বা পয়ার-শ্লোক একেবারেই অচল।

ওই দুই ভাগের সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলিতে বাকি আছে। আদি বা Petrarcan সনেটের এই ভাগ কবিতার ভাব-দেহেরই অঙ্গসন্ধির মত। এইরূপ সনেটের প্রথম অংশে (Octave) কোন একটি ভাবের উদ্বোধন হইয়া থাকে,

এবং দ্বিতীয়টিতে তাহারই নিবর্ত্তন হয়। এ যেন ভাব-স্রোতের জোয়ার ও ভাঁটা; উপরের ঐ কবিতায় তাহাই সুন্দর করিয়া বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ভাষায় এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়—

"The first quatrain makes a statement, the second proves it; the first terzetto has to confirm it, and the second draws the conclusion of the whole."

অর্থাৎ, অষ্টকের প্রথম চার-লাইনে একটা কিছু প্রস্তাবিত হইবে; দ্বিতীয় চার-লাইনে তাহা প্রমাণিত হইবে; ষট্‌কের প্রথম তিন লাইনে এই প্রমাণকেও দৃঢ়তর করা হইবে, এবং শেষের তিন-লাইনে সমগ্র ভাব-চিন্তার একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা হইবে। কিন্তু সনেটের ভাব-বস্তু সর্ব্বত্র এইরূপ বিতর্কের আকার ধারণ করে না—এমন সূক্ষ্ম স্তরভাগের প্রয়োজন হয় না। তাই, আমার মনে হয়, মোটামুটি ওই দুই ভাগে ভাবের একটি আবর্ত্তন থাকিলেই চলিবে;—প্রথমটিতে একটি প্রশ্ন, দ্বিতীয়টিতে তাহার উত্তর, প্রথমটিতে বিস্ময়, দ্বিতীয়টিতে তাহার কারণ-নির্দ্দেশ; প্রথমটিতে আক্ষেপ, দ্বিতীয়টিতে সান্ত্বনা; কিম্বা, প্রথমটিতে কোন কিছুর একটা দিক, ও দ্বিতীয়টিতে তাহার পরিপূরক হিসাবে অপরদিকের বর্ণনা;—এই রূপ হইলেই যথেষ্ট।

সনেটের গঠনে যে নিয়মগুলির কথা বলিয়াছি অক্ষরে অক্ষরে তাহার পালন খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু তথাপি, এ বিষয়ে কয়েকটি প্রধান নিয়ম না মানিলে সেরূপ রচনাকে চতুর্দ্দশপদী কবিতাই বলিব, 'সনেট' বলিব না। নিয়মগুলি এই—

(১) চৌদ্দটি পয়ার-ছন্দের পংক্তি থাকিবে—১৪ অক্ষরই যথেষ্ট; ১৮ অক্ষর হইলে, কবির দায়িত্ব অধিক হইবে, কারণ, তাহাতে গাঢ়বদ্ধতার ক্ষতি হইতে পারে।

(২) অষ্টক ও ষট্‌কের ভাগটি যতদূর সম্ভব রক্ষা করাই উচিত—মুক্তবন্ধ (Romantic বা Shakespearian) হইলে, এ বিষয়ে কোন বাধ্যতা নাই।

(৩) আদি বা Petrarcan সনেটের শেষ দুই পংক্তি একটি মিলযুক্ত যুগ্মক (rhymed couplet) হইবে না।

(৪) মিল-বিন্যাসে যতদূর সম্ভব সাবধান হওয়া চাই—মিলগুলি যেন নামমাত্র

মিল না হয়; এবং মুক্তবন্ধ সনেটেও যেন পাশাপাশি সম-স্বরান্ত মিল না থাকে; মিলগুলি যেন স্পষ্ট পৃথক মিল হয়, নতুবা মিল-হিসাবে খাঁটি হইলেও, স্থান-দোষে তাহা একঘেয়ে হইবে—সনেটের ছন্দ-সঙ্গীত ক্ষুণ্ণ হইবে। এইরূপ সম-স্বরান্ত মিল অন্যত্রও কবিতার ছন্দকে ক্ষুণ্ণ করে (১৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ ও উদাহরণ দ্রষ্টব্য)।

(৫) সনেটের ভাষায় যেন কোনরূপ শৈথিল্য বা অপরিচ্ছন্নতা না থাকে—ভাবেও, তেমনই, অস্পষ্টতা বা অর্থ-দুরূহতা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

(৬) সমগ্র কবিতাটি "one and whole"—একটি সম্পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু হওয়া চাই; গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি এক-কেন্দ্রিক ভাব-কল্পনা—যেন একটি চিন্তা, একটি ভাব বা একটি কবিত্বপূর্ণ তথ্যোপলব্ধিকে পংক্তিতে পংক্তিতে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে।

(৭) ভাবের মধ্যে 'dignity and repose' বা গাম্ভীর্য্য ও সংযম থাকিবে; (সেজন্য ইংরেজী ভাষার মত, বাংলা ভাষাতেও ডবল-মিল বা যুক্তাক্ষর-মূলক মিল ব্যবহৃত হইবে না)।

(৮) সনেটের শেষ দুই বা এক পংক্তিতে ভাবের পূর্ণতম অভিব্যক্তি হওয়া চাই।

২

এইবার আমি বাংলা সনেটের কাহিনী বর্ণনা করিব; প্রথমেই কালক্রমিক ভাবে কয়েকটি সনেট উদ্ধৃত করিয়া বাংলা সনেটের রূপ-বিবর্ত্তন দেখাইব।

মধুসূদন—

(১) বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

বারো মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি, কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা, এ মন জুড়াবে?

তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি,"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

(চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী)

(২) সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ সহচরি—
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমাসম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?

হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ-মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে?
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে।

(ঐ)

এই সনেট দুইটির গঠনে ইতালীয় বা আদি সনেটের আদল আছে। প্রথমটির অষ্টকের মিল-বিন্যাস বিধিসম্মত না হইলেও দুইটি মাত্র মিল আছে। দ্বিতীয়টিতে সে দোষও নাই। প্রথমটিতে অষ্টক ও ষট্‌কের ভাগটির কোন অর্থ হয় না, কারণ, ভাবের কোন স্পষ্ট আবর্ত্তন ঘটিতেছে না। এই সনেটের ভাব-বস্তুও অতি সাধারণ, একটু কবিত্বময় উচ্ছ্বাস মাত্র—কেবল রচনার একটি আলঙ্কারিক ভঙ্গি (শেষের চরণে) ইহাকে কবিতা-পদে উন্নীত করিয়াছে।

দ্বিতীয় সনেটটি আকারেও যেমন, ভাব-বস্তুতেও তেমনই সনেটের কুল-মর্য্যাদা কতকটা রক্ষা করিয়াছে। ইহার মিল-বিন্যাস যেমন নির্দ্দোষ, তেমনই, অষ্টক ও ষট্‌কের ভাগটিও যথার্থ হইয়াছে। প্রথম ভাগে (অষ্টকে) কবি একটি বিস্ময় ও প্রশ্নমূলক তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন; দ্বিতীয় ভাগটিতে (ষট্‌কে) তাহার একটি সন্তোষজনক সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের সনেটগুলির ভাববস্তু যেমন প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর, তেমনই ভাষা অতিশয় গদ্যগন্ধী ও নানা দোষদুষ্ট; ছন্দও নিতান্তই স্রোতোহীন—পদগুলি অতি কষ্টে পা' ফেলিয়া চলে। বাংলা ছন্দ-সঙ্গীতের এতবড় স্রষ্টা হইয়াও মধুসূদন তাঁহার সনেটগুলিকে ভাষায় ও ছন্দে যেরূপ রূপহীন করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার সেই দৈবী-প্রতিভা সত্যই একটা দৈবশক্তির লীলা—একবার মাত্র কিছুকাল ধরিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, পরে তাঁহারও সেই অবস্থা হইয়াছিল, যাহাতে অনেককে সনিঃশ্বাসে বলিতে হইয়াছে—"O for a touch of the vanished hand!" এই সনেটেই পঞ্চম ও ষষ্ঠ পংক্তির বাক্যরচনাও (sentence) সুষ্ঠু হয় নাই; "সু-কবরী", 'মণির উজ্জলে', "সুহাস অম্বরে" "চির আঁখি স্মরে" প্রভৃতি এতগুলি অক্ষমতা বা দুর্ব্বলতার চিহ্নও ইহাতে আছে। অথচ এই সনেটের ভাববস্তু যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনই সনেট-কবিতার অতিশয় উপযোগী। মধুসূদনের সনেটগুলির ভাববস্তু খুব গভীর নয়; একটি সাধারণ চিন্তা বা ভাব, কিছু বিশেষ বক্তব্য বা মন্তব্য, এবং তৎসহ একটু আলঙ্কারিক কবি-কল্পনা—ইহাই তাহাদের উপজীব্য। যে গূঢ়-সঞ্চারী ভাব ও ভাবনার দীপ্ত আবেগ, এবং সেই আবেগের অতিশয় সংহত বাণী-রূপ' সনেটের প্রধান গৌরব—মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতায় তাহার একান্ত অভাব। "A sonnet is either all air and fire or a mere wooden toy"—মধুসূদনের সনেট পড়িবার সময়ে এই উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাংলার আদি সনেট-রচয়িতা হিসাবে মধুসূদনের কীর্ত্তি স্মরণীয়; তিনিই বাংলা সনেটের ছন্দ ও আকৃতি ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন; এবং তাঁহার চতুর্দ্দশপদীর একটা লক্ষণ সনেটের লক্ষণই বটে,—কবির অতিশয় নিজস্ব ব্যক্তিগত ভাব ও চিন্তা প্রকাশের জন্য সনেট যে একটি উৎকৃষ্ট কাব্য-কৌশল, তিনি এই রচনাগুলিতে তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সনেটকে তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণ তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই,—নবীনচন্দ্র বা হেমচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থে সনেটের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। ইহার কারণ দুইটি, প্রথমত—ইহাদের কেহই কাব্য-শিল্পী ছিলেন না; বাণীর বেশ-বিন্যাস বা কবরীবন্ধনের দিকে—কোনরূপ প্রসাধনের দিকে—ইঁহাদের দৃষ্টি ছিল না; ঢালাও বর্ণনা ও বক্তৃতা, এবং ভাবোচ্ছ্বাসময়ী কল্পনার অবাধ গতি ইঁহাদের কবি-অভিমান চরিতার্থ করিয়াছিল। তা' ছাড়া, যে গূঢ়-গভীর লিরিক সুর-ঝঙ্কার সনেটের প্রেরণা-মূলে বিদ্যমান থাকে, ইঁহাদের সেই ধরণের লিরিক আবেগও ছিল না। তাই মধুসূদনের পরবর্ত্তী কবি ও অ-কবিগণ ছোট বড় অনেক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; মধুসূদনের পত্রিকা-কাব্য 'বীরাঙ্গনা'র আদর্শে বহু কাব্যরচিত হইয়াছিল, মহাকাব্যেরও ছড়াছড়ি হইয়াছিল; কিন্তু যতদিন খাঁটি গীতি-কবিতার পুনরভ্যুদয় হয় নাই ততদিন বাংলা কাব্যে সনেটের চর্চ্চাও হয় নাই। এই জন্য পরবর্ত্তী সনেটকার হিসাবে আমাদিগকে একেবারে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের পরিচয় করিতে হয়।

দেবেন্দ্রনাথ—

(১) ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতির মালা—
চম্পক-অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে ঘুরাযে
গাঁথিছ বকুল-হার বিনায়ে বিনায়ে?
শেষ না হইলে মালা ওই দেখ, বালা,
তোমার অলকগুচ্ছ হয়েছে উতলা।
মালা-গাঁথা শেষ হ'লে পাইবে সম্পদ
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম-কোকনদ'
সরসে নলিনীসম হয়েছে চঞ্চলা?

আমিও কুসুম সখি, সারাটি রজনী
সঞ্চিয়াছি তব লাগি রূপ ও সৌরভ,
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব গৌরব,—
হ্লাদে দেখ, কি উতলা হয়েছি, সজনি!
চিকণিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা—
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল, বালা!

('আমি'—অশোক-গুচ্ছ)

বসন্তের উষা আসি' রঞ্জি দিল যুগল-কপোলে,
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি আননে প্রিয়ার!
নিদাঘের রৌদ্র আসি বিলসিল ললাট-নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার!
ঘন-ঘোর বর্ষা-রাতি বিহরিল অলক-নিচোলে,
তাই গো প্রিয়ার পীঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার!
নাচিল শরৎ-শশী রূপ-হ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে,
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে-কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার!
রাহু, কেতু—দুই ঋতু, শীত ও হেমন্ত শুধু হায়,
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি' ছড়াইল কঠিন তুষার!
তাই, প্রিয়ে! তাই বুঝি সুকঠিন হৃদয় তোমার?
উপাসনা আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায়!
আমি গো বুঝিতে নারি—দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী!
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিম্বা ঘোর কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী!

('রাক্ষসী'—ঐ)

এই দুইটি কবিতার কাব্য-রস সম্বন্ধে, আশা করি, কিছুই বলিতে হইবে না; সে রস যেমন উচ্ছল, তেমনই একটি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে পূর্ণ-সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। এই উচ্ছলতা, এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পংক্তির মধ্যে সমাপ্তির জন্য—তাহার যে গাঢ়তা ঘটিয়াছে, তাহাতেই সনেটের যাহা প্রধান গৌরব তাহা এই দুইটি কবিতায় বর্ত্তিয়াছে। আর কিছু না হোক, এতদিনে বাংলা চতুর্দ্দশপদী—তাহার চৌদ্দটি পদকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। এক্ষণে এই দুইটি সনেটের গঠন পরীক্ষা করা যাক। প্রথমটিতে অষ্টক ও ষট্‌ক দুই ভাগ বিদ্যমান; কিন্তু মিল-বিন্যাসে স্বৈরাচারের অবধি নাই; অতএব ইহাকে Romantic বা মুক্তবন্ধ সনেটের শ্রেণীভুক্ত করাই সঙ্গত;—শেক্সপীরীয় সনেটও ইহা নহে। ঐরূপ আবেগময় ভাবোদ্বেল কবিতায় যে ছন্দঃস্রোত থাকা স্বাভাবিক, ইহাতে তাহাই আছে। কিন্তু এরূপ সনেটে মাঝের ওই ভাগটি না থাকিলেও চলিত—শেষের মিলযুক্ত পংক্তি দুইটিই (rhymed couplet) ইহার স্রোতকে যেমন বাঁধিয়াছে, তেমনই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে; ইহাতেই এই কবিতা উৎকৃষ্ট সনেট হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়টির ছন্দ এবং মিল—দুইয়েরই বৈশিষ্ট্য আছে; কবির ভাবাবেশ অধিকতর সংযত বলিয়া, এই সনেটের গভীর আবেগ (passion)—ভাবের সহিত,

ভাবনারও গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে। সনেটটি আকারেও ক্লাসিক্যাল ও রোমাণ্টিক—ইতালীয় ও মুক্তবন্ধ সনেটের—মধ্যস্থানীয় হইয়াছে। অষ্টকে মাত্র দুইটি মিলই আছে—বিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা আছে; ভাগ দুইটিও সুস্পষ্ট, কেবল শেষের ওই মিলযুক্ত পংক্তি দুইটিই ইহার প্রকৃতি ঠিক রাখিয়াছে, অর্থাৎ ইহাকে ইতালীয় সনেটের সগোত্র হইতে দেয় নাই। তথাপি, ইহাতেও কবিতার ভাব-গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় নাই, তার কারণ, ইহার পংক্তিগুলি ১৪ অক্ষরের নয়—১৮ অক্ষরের; এইজন্য পদান্তিক মিলের দূরত্ব ঘটিয়াছে—নূপুর একটু ধীরে বাজিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের এই সনেট একটি উৎকৃষ্ট সনেট—সনেটের কঠিন নাগপাশ একটু শিথিল হওয়া সত্ত্বেও, এই কবিতাটির চৌদ্দ পংক্তিতে একটি অতি বিশুদ্ধ লিরিক ভাববস্তু, ভাষায়, ছন্দে ও সুর-ঝঙ্কারে—একই প্রবাহের উত্থান-পতনে (অষ্টক ও ষট্‌ক) তরঙ্গিত হইয়া পূর্ণ পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। খাঁটি রোমাণ্টিক সনেটের এমন দৃষ্টান্ত আমাদের কাব্যে অতি বিরল। এই সুন্দর কবিতাটির কল্পনামূলে জার্ম্মাণ কবি হাইনের (Heinrich Heine) একাধিক কবিতার ভাব উঁকি দিতেছে—অনুকরণ নাও হইতে পারে।

ইহার পর, আমি কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের দুইটি সনেট উদ্ধৃত করিব—তাহাতে দেখা যাইবে, অক্ষয়কুমারও সনেটের মর্ম্ম বুঝিতেন; তাঁহার মত ভাবসংযমী কবির পক্ষে সনেটের কঠিন ছন্দোবন্ধ বরণীয় হইবারই কথা; তথাপি তিনিও সনেট-রচনায় সর্ব্বত্র আদি-সনেটের শাসন মানেন নাই, যথা—

মথিয়া কবিত্বসিন্ধু বঙ্গকবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা, অমরা-বিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু, দ্বিতীয় বাসব।
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ।
বিহারী—করুণা-লক্ষ্মী—করুণ-লোচন,
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ।

তুমি মন্থনের শেষে আসিলে, যোগেশ, *
উঠিল তোমার ভাগ্যে ভীষণ গরল!

কালকূট-কটু গন্ধে সৃষ্টি হয় শেষ—
সুর-নর-যক্ষ-রক্ষ আতঙ্কে বিহ্বল!
প্রজাপতি যুক্ত-কর—রক্ষ' বিশ্ব-প্রাণ,
মূর্ত্তিমান্ প্রেমমন্ত্র—সাক্ষাৎ ঈশান!

('ঈশানচন্দ্র'—শঙ্খ)

* কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ'-কাব্য।

—এই সনেটের ভাববস্তু অতিশয় লক্ষণীয়—একটি উপমা (metaphor) ইহার প্রাণ, অতিশয় সুকৌশলে, ভাব-কল্পনা নয়—বুদ্ধি-কল্পনার—সাহায্যে, কবি সেই উপমাটিকে একটি সনেটের আকারে এমন ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন যে, ঠিক সেই গঠন ও বিন্যাস-ভঙ্গির মধ্যেই তাহা যেন পূর্ণ বিকশিত হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে। এইরূপ ভাবনা-প্রধান (reflective) কাব্য-প্রেরণাও সনেটের কেমন উপযোগী হইতে পারে, এই রচনাটি তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার গঠনে ও মিল-বিন্যাসে খুব বেশি স্বাধীনতা নাই—শেষের মিলযুক্ত পংক্তি দুইটিই ইহাকে 'মুক্তবন্ধ' করিয়া তুলিয়াছে, নতুবা ইহার অষ্টক ও ষট্‌কের ভাগ অতিশয় স্পষ্ট ও ভাব-সঙ্গত হইয়াছে; অষ্টকেও কেবল দুইটি মিল আছে। আর একটি সনেট উদ্ধৃত করিতেছি, তাহার গঠন নির্দ্দোষ—খাঁটি ইতালীয় সনেটের মত; এ সনেটটিও ভাব অপেক্ষা ভাবনা-প্রধান। অক্ষয়কুমারের সনেট নাগপাশের পীড়নেও ভাবের গভীরতা বা বন্ধন-মুক্তির অধীরতা লাভ করে না; ছন্দেরও তেমন গীতি-মুখরতা নাই; এ যেন একটি সুদৃঢ় কৌটায় একটি সুস্পষ্ট ভাব বা সুন্দর চিন্তাকে সযত্নে ভরিয়া রাখা। তাঁহার সনেটগুলি ভাবে ও ভাষায় যেমন সুসমৃদ্ধ, গীতিরসে তেমন সমুজ্জ্বল নয়। তথাপি নিম্নোদ্ধৃত সনেটটিতে কবির ব্যক্তিগত ভাবাবেগ—বন্ধুবিয়োগের কাতরতা—একটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়াছে, ভিতরের ভাবে ও বাহিরের রূপে সনেট-রচনা সার্থক হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী সনেটের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই কবিতায় সনেটের মর্য্যাদা পূর্ণতর মাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে।—

নিত্যকৃষ্ণ বসু

হে নিত্য, অনিত্য সব—সকলি দু'দিন!
সেই প্রেম প্রীতি-স্নেহ-করুণ অন্তর,
দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চরিত্র সুন্দর,
স্বভাবে সরল অতি, কর্ত্তব্যে প্রবীণ।

ধীর ভাষা, স্থির আশা, জ্ঞান সর্ব্বাঙ্গীন,
সংসারের সুখে দুখে সদা অকাতর;
জীবন-পাবন-যজ্ঞে মগ্ন নিরন্তর—
হৃদয়ে অজেয় বীর, বিশ্বে উদাসীন।

হে সুহৃদ, গেলে কোন মানসের তীরে
নবীন প্রভাতে লয়ে নব জাগরণ,
সাথায়ে দু'খানি পাখা পরাগে-শিশিরে,
বাঁধিয়া নয়নে স্বপ্ন, মুখে গুঞ্জরণ।
বাণীর চরণপদ্ম ঘিরে' ঘিরে' ঘিরে'
করিতে জীবন-গীত পূর্ণ সমাপন।

(শঙ্খ)

এইবার রবীন্দ্রনাথের সনেট। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবি কেমন সনেট রচনা করিয়াছেন? উত্তরে বলিতে হয়, রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন—খাঁটি সনেট একটিও রচনা করেন নাই। তিনি সনেটের গঠন বা মিল-বিন্যাসের নিয়ম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন; 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাগুলিতে মিল-বিন্যাসের কোন রীতি না মানিলেও, বরং, সে বিষয়ে স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষণ থাকিলেও, তাহাতে সনেট-ছন্দের যেটুকু আভাসও আছে, 'নৈবেদ্য' ও 'চৈতালি'তে তাহাও নাই, পর পর সাতটি পয়ার শ্লোক মাত্র আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

'কড়ি ও কোমল'—

অধরের কোণে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে,
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিযাছে সাগর-সঙ্গমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দু'জনের দেখা।

প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দু'খানি অধর হ'তে কুসুম-চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে;
দুটি অধরের এই মধুর মিলন—
দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন।

চৈতালি—

পরম আত্মীয় ব'লে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দু'জনায়
তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায়।
দুজনের একজন একদিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখী পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে।
এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।
মুহূর্ত্ত-আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চির-পরিচিত মম।

নৈবেদ্য—

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসন-ভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য্য করি
সবিনয়ে, তব কার্য্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।
ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা

তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে, যেন রাখি তব মান,
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

এই তিনটি রচনাই উৎকৃষ্ট কবিতা। প্রথমটিতে একটি অতি পেলব রস-কল্পনা আছে; তৃতীয়টিতে একটি ধ্যানলব্ধ চিন্তা, এবং দ্বিতীয়টীতে অতি গভীর আত্মিক অনুভূতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। একমাত্র প্রথমটিতে একপ্রকার রসাবেশ বা খাঁটি কবিত্বের আবেগ আছে—সেই আবেগই কতক পরিমাণে ছন্দেও তরঙ্গিত হইতে চাহিয়াছে, তাই মিল-বিন্যাসে একটু বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। শেষের দুইটিতে তেমন আবেগ বা পিপাসার ভাব নাই; একটিতে গভীর বিচার-বোধ, অপরটিতে একটি আত্মসমাহিত চেতনার চিত্ত চমৎকাব রহিয়াছে। সেই মানসিক ভাব-সত্য বা তত্ত্বোপলব্ধিকে কবি অতিশয় সরল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায়, এবং সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করিয়াছেন—সেজন্য সাধারণ পয়ার-ছন্দ এবং চৌদ্দ পংক্তির গণ্ডি আশ্রয় করিয়াছেন। তিনি সনেট রচনা করেন নাই; অর্থাৎ, ভাবটিকে যথাযথ প্রকাশ করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট, তাহাতে কোন বিশেষ ছন্দ-সঙ্গীত যোজনা করিয়া একটি বিশেষ গঠন-ভঙ্গিমায় তাহাকে অতিরিক্ত সৌষ্ঠব দান করা—তাঁহার অভিপ্রেত নয়। আরও কারণ—সনেট-কবিতার প্রেরণামূলে যে প্রবল ভাবাবেগ (emotion, passion) থাকে, ঠিক সেইরূপ ভাবাবেগ এ সকল কবিতায় নাই, তাই তেমন নাগ-পাশের প্রয়োজনও হয় নাই। সেইরূপ ভাবাবেগ প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ অন্যবিধ আকার ও অন্যবিধ ছন্দের বহুতর কলা-কৌশল করিয়াছেন; এবং খাঁটি গীতি-কবির মত, কবিতাও নয়—'গান' রচনা করিয়াছেন—সেই 'গান'ই তাঁহার সনেট। অতএব রবীন্দ্রনাথ যে রীতিমত সনেট-রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই—আপন প্রয়োজন-মত চৌদ্দপংক্তির কবিতাই রচনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কবিধর্ম্মকে আরও নিঃসংশয় করিয়া তুলিয়াছে;—কেবলমাত্র সুর, এবং ভাবগত সৌন্দর্য্যের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তিনি কোথাও স্বীকার করেন নাই; যেখানেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন, সেখানেই অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন।

সত্য বটে, সনেট সম্বন্ধে এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এমন কোন ভাব, ভাবনা বা চিন্তা নাই যাহাকে সনেটের আকারে ধরিয়া দেওয়া যায় না; সেজন্য সনেটের রূপভেদও হইয়াছে। ইহা যদি কোন অর্থে সত্যও হয়, তথাপি এপর্য্যন্ত, মোটামুটি দুইটি ছাঁচ, এবং তাহাদের কয়েকটি মিশ্র-রূপ ছাড়া, কোন সনেটই সার্থক রচনা হইতে পারে নাই। রোমান্টিক বা শেক্সপীরীয় (আমি যাহাকে 'মুক্তবন্ধ' নাম দিয়াছি) সনেটে, একটি একমুখী ভাবধারার দ্রুত তরঙ্গ-স্রোত, এবং শেষে একটি পয়ার শ্লোকে (rhymed couplet) তাহার আকস্মিক এবং উজ্জ্বল পরিসমাপ্তি; ইতালীয় সনেটে, ভাবের প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তন (ebb and flow), সুসম্বদ্ধ মিল-বিন্যাস—তাহার সেই statuesque বা ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত সুডৌল ও সুদৃঢ় গঠন, এবং শেষে অতি ধীরে সেই গীত-ধ্বনি মিলাইয়া যাওয়া; অথবা, এই দুইএর মিশ্র বা মধ্যবর্ত্তী একটা রূপ (অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ইংরেজী সনেটে যাহা ঘটিয়াছে);—এই তিন প্রকার ব্যতিরেকে আর কোন আকারের বা ছন্দের চতুর্দ্দশপদী খাঁটি সনেটের রূপ-গুণ ধারণ করিতে পারে না, ইহা কাব্যরসিক পাঠকমাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। অন্যবিধ চতুর্দ্দশপদীকেও 'সনেট' নাম দিতে আপত্তির একমাত্র কারণ এই যে, সনেট নামক কবিতায় শুধুই রস নয়—একটা বিশেষ রূপও চাই, সেই রূপ ওই রসেরই অনুরূপ হইতে হইবে; শুধু তাহাই নয়—রূপটাই আগে, ওই রূপ ছাড়া যেন সেই রস আস্বাদন করাই যায় না; সেই রূপই এমন একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে সে-রচনার—কবিত্ব যেমনই হোক—সনেটত্ব থাকে না।

৩

এইবার আমি বাংলা ভাষায় আদি ইতালীয় সনেটের প্রসার সম্বন্ধে কিছু বলিব। এইরূপ সনেটের অভিপ্রায়—ভাবকে একটি বিশেষ গঠনে বা ছাঁচে ফেলিয়া, তাহার রূপ ও সৌষ্ঠব, দীপ্তি ও গভীরতা বৃদ্ধি করা; সেই বিশেষ গঠনটিই ইহার সর্ব্বস্ব। এই গঠন এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহার লঙ্ঘন কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর,—যেন ঠিক ওই ছাঁদে বিন্যস্ত না করিলে তাহার রস উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। অতএব, সেই নাগপাশ-বন্ধন প্রতিপদে বরণ করিয়া তাহার গঠনটিকে প্রতিমার মত সুঠাম ও সুডৌল রাখিয়া—একটি ভাবকে যেন

তাহার সম-অবয়বী করিয়া তোলাই এইরূপ সনেটের সার্থকতা। বাংলা সনেটের এইরূপ বিবর্ত্তন রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে ঘটিবার কথা নয়—পূর্ব্বে হইবারই কথা; অতিশয় উচ্ছল গীতি-কবিতার যুগে সেরূপ 'ক্ল্যাসিক্যাল' সংযম কোন কবিকেই শোভা পায় না; এজন্য একজন অর্ব্বাচীন অ-কবির হাতেই সনেটের এই কঠোর বন্ধন-দশা ঘটিয়াছে,—আমি নিজে, পদবন্ধের মতই, সনেটের এই গঠন লইয়া এককালে কিঞ্চিৎ দুঃসাহসের কাজ করিয়াছিলাম; তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব। কেবল সেই গঠনেরই দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—এ প্রসঙ্গে তাহাদের কবিত্ব-বিচারের প্রয়োজন নাই বলিয়া আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছি; পূর্ব্বে একটি উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও মন্তব্যের জন্য আরও কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম—

(১) একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর পর,
মেলেনি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে,
শাল্মলীর রক্তভূষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে,
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব-কেশর!
নরত্ব দুর্ল্লভ জানি, সুদুর্ল্লভ কবি-কলেবর—
সত্য সে কি? মনে হয়, এই মরু-সৈকত-সমীরে
পাই যদি প্রীতি-মুক্তা অবগাহি' লবণাম্বু-নীরে,
বাণীর উদাস-দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর।

চলেছিনু ক্লান্ত পদে সুন্দরের তীর্থ অভিলাষে,
সমুখে পড়িল ছায়া—বনপথে এ কোন্ পথিক
গান গেয়ে চলে আগে? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান!
জিজ্ঞাসিনু, কোথা যাও? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে
বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুরী মর্ত্ত্যের অধিক!
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান্।
(উৎসর্গ-কবিতা, 'বিস্মরণী')

এই সনেটের অষ্টকের মিলবিন্যাস ঠিক আছে—ষট্‌কের তিনটি মিল যথাক্রমে —চ ছ জ, চ ছ জ; এই দূরান্তরিত মিলের জন্য ভাবের আবর্ত্তন (অষ্টকের শেষে) অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কারণ ইহার ছন্দ-সঙ্গীত আরম্ভের সহিত আদৌ মেলে না। আরও লক্ষণীয়—অষ্টকের চতুষ্ক দুইটির মধ্যে ছেদ আছে; ষট্‌কের দুইটি ভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটি tercet বা 'বিশেষক' গড়িয়া উঠিয়াছে।

অতএব গঠন একরূপ নিখুঁত বলিতে হইবে। প্রধান ভাগদুইটিও (অষ্টক ও ষট্‌ক) অকারণ নহে—আট পংক্তির শেষে ভাবস্রোত সম্পূর্ণ মোড় ফিরিয়াছে, শেষের ছয় পংক্তিতে ভিন্নমুখে ফিরিয়া পুনরায় সেই অষ্টকের ভাবে আসিয়া মিলিয়াছে। প্রথম চতুষ্কটিতে একটা ক্ষোভ বা নৈরাশ্য, দ্বিতীয়টিতে তাহারই আরও স্পষ্ট কারণ নির্দ্দেশ; ষট্‌কের আরম্ভেই একটি বিশেষ সংবাদ বা ঘটনার উল্লেখ; এবং শেষে তাহা হইতেই এমন একটা সান্ত্বনা লাভ, যে শেষ পংক্তিটি সমগ্র কবিতাটিকে একটি অখণ্ড ভাবগ্রন্থিতে পরিণত করিয়াছে।

(২) মৃত্যুর বরণ নীল,—শুনেছিনু কবে সে কোথায়।
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন-শ্যাম ?
অথবা গরল-দ্যুতি হর-কণ্ঠে নয়নাভিরাম ?
উমার কপোল-শোভী সে কি নীল অলকের প্রায় ?
অতিদূর কূলে যথা তালীবন-রেখা দেখা যায়—
নিবিড় আযস-নীল !—তেমনি সে আঁখির আরাম ?
কিম্বা সে কি দিক্‌প্রান্তে আচম্বিত বিদ্যুতের দাম,
ভীষণ নিঃশব্দ নীল ?—পরে সে অশনি গরজায় !

উপমা মনেরি খেলা, প্রাণ বুঝে উপমা-বিহনে,
সে যে নীল—নহে রক্ত, পীত, কিম্বা ধূমল, ধূসর,
নীলাকাশতলে যথা সিন্ধুজল নীল নিরন্তর—
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগম-গহনে !
সে নহে যমুনা-জল, নব ঘন অথবা গগনে,—
মহাশূন্য !—তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর।

('উপমা'—হেমন্ত-গোধূলি)

(৩) রসাতলে ভোগবতী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা, স্বর্গে মন্দাকিনী—
এক বিষ্ণুপদী ধারা—কালস্রোত—বহে নিরন্তর;
জানিনা পাতালে তার কুলু-কুলু কিবা কলস্বর,
আকাশ-তরঙ্গে তার ভাসে কিনা সুবর্ণ-নলিনী।
জানি শুধু জাহ্নবীরে—পুণ্যতোয়া, প্রাণ-প্রবাহিনী,
ত্রিধারায় বহে সেও জীবনের কাহিনী সুন্দর;
ধরাবক্ষে ত্রিগুণিত স্ফটিকাক্ষ-মালা মনোহর,
যজুঃ-সাম-ঋক্-মন্ত্র গাহে নিত্য সে কল-নাদিনী !

অতীত-কল্পনাময়ী যমুনার নীল জলধারা—
রাখালের বাঁশী বাজে ব্রজবনে তারি তীরে তীরে;
ভবিষ্যের সরস্বতী বালুতলে হয়নিত' হারা—
আশার অমৃত-বাণী বহিতেছে হৃদয়-গভীরে;
প্রত্যক্ষ-কালের গতি ভাগীরথী উন্মাদিনীপারা
নৃত্য করে উর্ম্মিভঙ্গে চন্দ্রচূড়-মহাকাল-শিরে!
('ত্রিস্রোতা'—স্বপ্ন-গরল)

এই দুইটিতে কাব্য-নির্ম্মাণের উপাদান একই—একটা আলঙ্কারিক বা উপমা-মূলক কল্পনা। ভাবের এইরূপ একটি সুস্পষ্ট অবলম্বন থাকায়, তাহার বাণী-রূপও সরল হইবারই কথা, অর্থাৎ, ভাষায় তাহার বিকাশ-কৌশলে সূক্ষ্ম স্তর-ভাগের প্রয়োজন নাই। প্রথমটিতে, কয়েকটি উপমামূলক প্রশ্নেই অষ্টকটি পূর্ণ হইয়াছে—একটি রঙের রূপ-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই আবশ্যক হয় নাই; প্রশ্ন সেই একই, এবং তাহা জটিলতা-হীন। কিন্তু ইহার ষট্‌কের পংক্তিগুলিতে অষ্টকের সেই উপমাগুলিকে তুচ্ছ করিয়া, এমন এক অভিনব উপমার শরণ লওয়া হইয়াছে যে, তাহাতেই পূর্ব্ব প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা হইয়াছে। অষ্টকের ওই জমকালো উপমাগুলিকে সরাসরি অস্বীকার করিয়াই ষট্‌ক যেন একটি বিপরীতমুখী ভাব-স্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে—তাই, আবর্ত্তনটিও বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি ষট্‌কের শেষ পংক্তি, আর একদিক দিয়া কবিতার মূল প্রস্তাবেরই (অষ্টকের প্রথম পংক্তি) সমর্থন করিতেছে। ষট্‌কের মিলবিন্যাসও লক্ষণীয়, যথা—গ ঘ ঘ গ গ ঘ; প্রথম চারি পংক্তির মিল-বিন্যাস অষ্টকের চতুষ্ক দুইটির মত (গ ঘ ঘ গ—ক খ খ ক)। অতএব, ভাবধারার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ছন্দের স্রোত যেন একটানা চলিয়াছে; কিন্তু আসলে, একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে—পূর্ব্বের মত সে প্রখরতা আর নাই, ওই একটানা মিল-বিন্যাসের জন্যই তরঙ্গ বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং শেষের দুই পংক্তিতে তাহার শেষ উচ্ছ্বাস যেন আপনিই থামিয়া গিয়াছে—শেষের ওই 'গঘ' কানে এমনই একটি বিরতির সুর ধ্বনিয়া তোলে; ভাব-অর্থের চূড়ান্ত সমাপ্তিও ওইখানে ঘটিয়াছে। এইবার সমস্ত কবিতাটি পড়িয়া দেখিলে, উহার ভাববস্তুর বিকাশ এবং ছন্দ-দেহের গঠন-ভঙ্গি, এই দুইয়ের সঙ্গতি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে; এবং এইজাতীয় সনেটেরও একস্থানে—ষট্‌কের মিল-বিন্যাসে—কেন যে একটু স্বাধীনতা আছে, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। কারণ, সনেটের দুইটি

অংশের যে বহির্গত ভেদ ও অন্তর্গত ঐক্য—তাহার পূর্ণ উপলব্ধি হয় ওই শেষের ছয় পংক্তিতে, ওই ষট্‌কের মধ্যেই সনেটের মূল মর্ম্মটিও ধরা দেয়; তাই বিভিন্ন ভাবের বিশিষ্ট প্রয়োজনে, ষট্‌কের গঠনে একটু ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ আছে। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্যই আমি এই সনেটটির বিশ্লেষণ একটু সবিস্তারে করিলাম; বলা বাহুল্য, আমার বিবেচনায়, এই সনেটটি রূপে ও গুণে একটি সার্থক সনেট হইয়াছে।

ইহার সহিত পরবর্ত্তী সনেটটি তুলনা করিলেই দেখা যাইবে, এই তিন-নম্বরের সনেটটির ভাব-কল্পনা আরও খাঁটি আলঙ্কারিক; পূর্ব্বের কবিতায় কল্পনাই উপমা খুঁজিয়াছে—ভাব আগে, উপমা পরে; এখানে উপমাই ভাব-কল্পনার আধার—আগে উপমা, পরে ভাব। এখানে সেই ভাব যেন উপমাকেই কেন্দ্র করিয়া অতি সহজেই বিস্তৃত ও মণ্ডলায়িত হইয়াছে; এ জন্য ইহার গঠনে ভাবধারার গতি ও পরিণতি আরও সরল হইতে বাধ্য। একটি পৌরাণিক কল্পনার সুযোগে, কালের সহিত ত্রিস্রোতা-নদীর তুলনা—ইহার অধিক কিছু এই কবিতায় নাই। নদীর সহিত কালের সেই সাদৃশ্যকে সর্ব্বাঙ্গীণ করিয়া তোলা, এবং শেষে সেই ত্রিধারার একটি ধারার সহিত কালের একটি অংশকে বিশেষভাবে উপমিত করিয়া তাহাকে মহিমা দান করা, এবং তাহাতেও সেই পৌরাণিক কল্পনাকে শিরোধার্য্য করা—ইহাই এই চতুর্দ্দশপদী কবিতার বিশিষ্ট প্রেরণা; কিন্তু সেই ভাববস্তুর পক্ষে সনেটের নাগপাশ বাধা না হইয়া কিরূপ সুবিধার কারণ হইয়াছে—এই সনেট তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। এখানেও, অষ্টকের শেষে, ভাবের আবর্ত্তনটি খুব স্পষ্ট নয়, প্রায় একই ধারায় বহিয়া চলিয়াছে; কেবল অষ্টকের সেই প্রস্তাবনাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা আরও দৃঢ়তর করিয়া, সেই এক ভাবস্রোত ষট্‌কের আরম্ভ হইতেই দ্রুততর তালে ছন্দিত হইতেছে—তাহাতে যেমন একটা আবর্ত্তনের আভাস আছে, তেমনই, সমাপ্তির সূচনাও হইয়াছে। এই জন্য ষট্‌কের মিল-বিন্যাস অনুরূপ হইয়াছে, যথা—গঘ-গঘ-গঘ। ভাবধারার সহিত ছন্দধারার সঙ্গতি, তথা সনেটের ভাব-কল্পনার বহু বৈচিত্র্যের নিদর্শনস্বরূপ, আমি এই সনেট উদ্ধৃত করিয়াছি।

ইহার পর, আর একটিমাত্র সনেট উদ্ধৃত করিব—তাহাতে ভাবের উচ্ছলতা বা হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস—সনেটের ঐ কঠিন শাসন স্বীকার করার ফলে, কেমন

একটি সংযমসুলভ গভীরতা লাভ করে, তাহার প্রমাণ মিলিবে; এই কবিতার কল্পনায় যে চাতুর্য্য আছে, তাহা যে সনেটের আকারেই—ওই অতি-পিনদ্ধ নিচোলাবরণেই—একটি বিশেষ শ্রী ও সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি, ইহারও গঠন সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।—

আজ রাতে রুদ্ধ কর সব ওই দ্বার-বাতায়ন,
কাঁদিছে আঁধার ধরা বায়ুশ্বাসে মেঘ-গরজনে;
দামিনী ঝলকে মুহু, অবিশ্রান্ত ধারা-বরিষণে
ঝাপটে ভিজিয়া গেল বার বার শিথান-শয়ন!
প্রদীপের তলে বসি'—যূথী যেই করেছ চয়ন
গাঁথো তারে চিকনিয়া, আমি পড়ি পুঁথি মনে মনে—
বিরহের শ্লোক যত, আর মুখ হেরি ক্ষণে ক্ষণে—
কুসুমের পরে ন্যস্ত ওই দুটি ভ্রমর-নয়ন!

কত আঁখি অশ্রুজলে বরিয়াছে শ্রাবণ-শর্ব্বরী—
প্রিয়াহারা বিরহী সে, বারিধারে হৃদয়-বিধুর!
কত রাধা বায়ুরবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী,
নিশীথের নীলাঞ্জনে আঁকিয়াছে বদন বঁধুর!
আজি সে কাহিনী মোর নয়নের নিদ্ লবে হরি',
বিরহ-কল্পনা-সুখে হ'বে এই মিলন মধুর!

('শ্রাবণ-শর্ব্বরী'—স্মর-গরল)

সনেট সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে, আমি বাংলা সনেটের পরিচয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য একালের একজন খ্যাতিমান সনেট-কবির সনেট-রচনা-পদ্ধতির উল্লেখ করিব। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলি অনেকের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে, একটি বিশেষ ধরণের রস রচনা হিসাবে সেগুলি যে উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, একটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।—

গড়নে গহনা বটে, রঙেতে সবুজ,—
ফুলের সবর্ণ নহ, বর্ণচোরা চাঁপা।
বৃথা তব গন্ধভারে গর্ব্বভরে কাঁপা,
ফিরেও চাহেনা তোমা নয়ন অবুঝ।
নেত্রধর্ম্ম—খুঁজে ফেরা গোলাপ, অম্বুজ,
উপেক্ষিত আছ তুমি, হয়ে পাতা-চাপা।
তোমার কাঁঠালী-গন্ধ নাহি রহে ছাপা,—
ছুটে আসে ভেদ করি' পাতার গম্বুজ।

ঠিক করে' হও নাই পাতা কিম্বা ফুল,—
দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল।

পত্রের নিয়েছ বর্ণ ফল হ'তে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার,
সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়-লোভে হয়ে অন্ধ,—
স্বধর্ম্ম হারায়ে হ'লে সর্ব্ব-জাতি-বা'র।
("কাঁঠালী-চাঁপা"—সনেট পঞ্চাশৎ)

এই চতুর্দ্দশপদীর ভাষা ও ভাব দুই-ই যেমন লক্ষণীয়, তেমনই ইহার গঠনও অনন্যসদৃশ; ইটালী বা ইংলণ্ডে না গিয়া এই সনেটকার ফরাসী কবির শরণাপন্ন হইয়াছেন, এবং ঠিকই করিয়াছেন, কারণ, তাঁহার সনেটের প্রেরণামূলে কবিত্ব নাই, আছে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং চিন্তা-ঘটিত চাতুরীর চমক। ষট্‌ক-অংশটিকে দুই ভাগ করিয়া, তাহার অগ্রভাগে যে পয়ার শ্লোকটি আছে—তাহাই এই সনেটের গঠন-বৈশিষ্ট্য। ইহার ভাববস্তু যে কাব্যবস্তু নয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত বুদ্ধির যে বিজ্ঞতা, তাহাই নিখুঁত দৃষ্টান্ত-সহযোগে একটি সদুপদেশকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য ইহার ভাষাও কবি-ভাষা নয়; বাক্‌পটুতাই ইহার প্রধান গুণ। মিলগুলিও অতিশয় উপযোগী হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাতেও কোন ছন্দ-ধ্বনি নাই—শব্দধ্বনিই আছে; অম্বুজ-গম্বুজ, গন্ধ-অন্ধ প্রভৃতি যুক্তাক্ষরমূলক (feminine rhyme) মিলও আছে। শেষের ভাগটির প্রথম দুই লাইন মিলযুক্ত পয়ার (rhymed couplet), তাহাতে একটি উক্তি করিয়া পরের চার লাইনে সেই উক্তির সমর্থন করা হইয়াছে; এই সমর্থন রীতিমত বিতর্ক মূলক (discursive)। অতএব, এ কবিতার এই গঠন ভাববস্তুর অতিশয় উপযোগী বটে, এবং সেইজন্য রচনাটিও সার্থক রচনা হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে, কি ভাষায়, কি ছন্দ-সঙ্গীতে এই রচনা যে আদৌ সনেট-পদবাচ্য নয়, আশা করি, এতখানি আলোচনার পর তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তথাপি, মূল সনেটের বিকৃতি হইলেও, ইহারও একটি নিজস্ব প্রকৃতি আছে; অতএব সনেট না হইলেও, ইহা একশ্রেণীর উৎকৃষ্ট চতুর্দ্দশপদী বটে।

আমাদের ফলের বাগানে আনারস ও খরমুজা, এবং ফুলের বাগানে গোলাপ ও নানাবিধ মরসুমী ফুলের মত, আমাদের সাহিত্যের উদ্যানেও যে সকল রমণীয়

বিদেশী বস্তুর আমদানী হইয়াছে—সনেট তাহার মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট কাব্য-কুসুম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার চাষ তেমন যত্নসহকারে করা হয় নাই; অথচ আমি বাংলা সনেটের যেটুকু বিবরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে, এই ভাষায় এবং এই ছন্দে উৎকৃষ্ট সনেট-রচনা সম্ভব। কেবল মনে রাখিতে হইবে যে—

In this, more than in any other poetic form, it is well for the would-be composer to study not only every line and every word, but every vowel and every part of each word, endeavouring to obtain the most fit phrase, the most beautiful and original turn to the expression—to be, like Keats, "misers of sound and syllable."

—ইহার মত সত্য আর কিছু নাই। সর্ব্বশেষে, আমি এই ক্ষুদ্রকায় কবিতার স্বপক্ষে দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিদায় লইব—কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Scorn not the sonnet," ইত্যাদি উক্তির সেই সনেটও অনেকে স্মরণ করিবেন।—

"A poem does not require to be an epic to be great, any more than a man need be a giant to be noble."

* * *

"And it is to indulge in no metaphysical subtlety to say that life can be as ample in one divine moment as in an hour, or a day, or a year,"

এবং— "A sonnet is a moment's monument."

বাংলা ছন্দে মিল

একদিন বাংলা ছন্দের মিলই ছিল প্রধান অবলম্বন, এমন কি ছন্দ বলিতে মিলবিন্যাসই বুঝাইত; যে কবিতায় মিল নাই তাহা কবিতাই নয়, অর্থাৎ, গদ্য, —এইরূপ সংস্কার এমনই দৃঢ়মূল হইয়াছিল যে, সেকালের পণ্ডিতসমাজও নিজেদের অজ্ঞাতসারে এইরূপ সংস্কারের বশীভূত হইয়াছিলেন; তার প্রমাণ, সে যুগের সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও বাংলা অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"তবে একটা কথা প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, যদি মিতাক্ষর (অমিত্রাক্ষর?) কেবল নিগড় বন্ধন-মোচনের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে সেটা কিছু মহদুদ্দেশ্য-সাধন নহে। চুড়, বলয়, অনন্ত এগুলি ত নিগড় বটে; বাহুলতা বহিয়া রূপ খসিয়া খসিয়া পড়ে, তাই বলয়-চুড়-অনন্ত-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে শোভা বাড়ে, না কমে? তাল ও ত' সুরের নিগড। ঐ নিগড় ভাঙ্গিলেই কি ভাল? তা নয়। দশরূপ নিগড়েই মনুষ্যত্ব, দশরূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি-শশী। ছন্দ ত নিগড়। নিগড় সৌরজগতে, নিগড় কাব্যজগতে। নিগড়-ছেদনই আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

—'কবি হেমচন্দ্র', পৃঃ ৫২

এই উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করিবার আর একটি অভিপ্রায় আছে। যাঁহারা সেকালের এই সকল সাহিত্যাচার্য্যগণের সাহিত্যবিচারপদ্ধতি ও তাহার সিদ্ধান্ত লইয়া বাংলা সাহিত্যের আধুনিক অধ্যাপনাকে বিব্রত করিতে চান, এবং এইরূপ ঋষি-বাক্য সংকলন করিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকের অশেষ উপকার করিতে বদ্ধ-পরিকর, তাঁহাদের সাহিত্যজ্ঞান ও কাব্য-সংস্কার যে কিরূপ উন্নত, উপরের ওই উক্তিটি তাঁহার সাক্ষ্য দিবে। আচার্য্য মহাশয় যেন হুঁকা-হাতে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, কয়েকটি নিতান্ত শরণাপন্ন ভক্ত শিষ্যের সাহিত্য-বুদ্ধি জাগ্রত ও মার্জ্জিত করিতে রত হইয়াছেন; সে কাজ যে তাঁহার পক্ষে কত সহজ, তাহাও উপমা, যুক্তি, এবং কথন-ভঙ্গি হইতে বুঝা যায়। ঠিক ঐ একই প্রসঙ্গে, একজন প্রাচীন ইংরেজ সাহিত্যাচার্য্যের উক্তি ইহার সহিত তুলনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, অশিক্ষিত গ্রাম্য-সমাজ ও শিক্ষিত সমাজে কত প্রভেদ; সেখানকার

সাহিত্যাচার্য্যকে কত সাবধানে কথা বলিতে হয়। মিলটনের অমিত্রাক্ষর বা মিলহীন ছন্দ ডাঃ জনসনের রুচিকর হয় নাই, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এইরূপ—

Rhyme, he (Milton) says, and says truly, is no necessary adjunct of true poetry. But perhaps, of poetry as a mental operation, metre or musick is no necessary adjunct: it is however by the musick of metre that poetry has been discriminated in all languages; and in languages melodiously constructed with a due proportion of long and short syllables metre is sufficient. But one language cannot communicate its rules to another, where metre is scanty and imperfect, some help is necessary,

—*Johnson's Lives of the Poets: Milton.*

মিলটনের ছন্দ সম্বন্ধে জনসনের মত ও মনোভাব যেমনই হৌক, উপরে তাঁহার যে কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি যেমন সুচিন্তিত, তেমনই, এক অর্থে চিরদিনই সত্য। কিন্তু আমাদের আচার্য্যমহাশয় এ ধরণের কথা ভাবিতেও পারেন না। তিনি মিল ও ছন্দ, দুই-কেই কবিতার একই-রূপ নিগড় বলিয়া ধারণা করিয়াছেন; কবিতার পক্ষে ছন্দ যেমন অপরিহার্য্য, মিলও তেমনই—দুই-ই তাহার অলঙ্কার! এবং অলঙ্কারের দ্বারা কবিতার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়, এই বলিয়া মিলের মান রক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ এত বড় সাহিত্যাচার্য্যও ছন্দ ও মিলের পার্থক্য বুঝিতেন না—দুইকেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন! কবিতার মিল সম্বন্ধে বাঙালীর এই সংস্কার এমনই মজ্জাগত।

শুধুই কানের অভ্যাস বা কোন অকারণ সংস্কার নয়—বাংলা ছন্দে মিলের স্থান কিরূপ, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব—সৌভাগ্যক্রমে এমন একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে যাহার ছন্দও কম লক্ষণীয় নয়। প্রথমে এই পংক্তিগুলির ছন্দ নির্ণয় করিতে বলি—

লজ্জা বলিল "হবে কিলো তবে! কত দিন
পরাণ র'বে অমন করি'। হইয়ে জল-হীন
যথা মীন থাকিবে ওলো কতদিন মরমে মরি'।

—হঠাৎ গদ্য বলিয়াই মনে হইবে, কারণ ইহার পদ্যের পদ-ভাগ কানে অনিয়মিত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু যদি মিল অনুসারে পংক্তিগুলিকে এইরূপ সাজাইয়া লই—

লজ্জা বলিল "হ'বে
কি লো তবে !
কত দিন পরাণ র'বে,
অমন করি'।
হইয়ে জল-হীন
যথা মীন
থাকিবে গুলো কত দিন
মরমে মরি'।

(স্বপ্ন-প্রয়াণ)

—তাহা হইলে, ছন্দ যাহাই হউক, এই মিলের ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া ইহার পদ্যত্ব সহজেই প্রমাণ করা যায়; পূর্ব্বের পদ-শব্দগুলিকে কোনরূপে পার হইয়া ঐ মিলগুলিতে থামিয়া থামিয়া জোর দিলেই, রচনাটি যে কবিতা তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তার পর, ছন্দের হিসাব লইতে গেলে দেখা যাইবে যে, এ ছন্দ খাঁটি বর্ণবৃত্ত বটে; দুইটি চরণে ২৫টি করিয়া অক্ষর আছে, তাহাতেও পূর্ব্বাপর ১১ ও ১৪ অক্ষরের দুইটী ভাগ আছে; এবং পংক্তি দুইটি ঠিক এক ছাঁদের। ঐ ১১, আবার, = ৭ + ৪, এবং ১৪ = ৯ + ৫; এবং ঠিক এই ছাঁদ (pattern) প্রতি পংক্তিতে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দিতেছে। অতএব ইহা যে একটি ছন্দ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ওই ছন্দ এখানে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে? ওই ছোট ছোট ভাগগুলিরও (৭, ৪, ৯, ৫) পদচ্ছেদ-রীতি অতিশয় অসম,—বাংলা পয়ারের চাল এরূপ নয়; বরং ইহাদের মধ্যে দ্বৈমাত্রিক ও ত্রৈমাত্রিক পর্ব্বের আভাস রহিয়াছে, অথচ, সেই পর্ব্ব-সন্নিবেশও ছন্দ-সঙ্গত নয়। অতএব, ইহাকে একরূপ মিশ্র-ছন্দ বলিতে হয়, অর্থাৎ ইহা সাধারণ ছন্দরীতির বহির্ভূত। তথাপি, ইহার রচয়িতা একটি নিয়ম পালন করিয়াছেন—প্রাচীন বাংলা ছন্দের সেই অক্ষরগণনায় ভুল নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ছন্দ শাস্ত্রসম্মত হইলেও, কান তাহা মানিত না; তাই তিনি শাস্ত্রবিধি মান্য করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু আসলে নির্ভর করিয়াছেন—ওই মিলযুক্ত পদগুলির উপরেই। এজন্য, এই কবিকে খাঁটি বাঙালী কবি বলিতে হইবে—ইহার কান বাংলা ছন্দে মিলের আধিপত্য স্বীকার করে; ছন্দের হিসাব

কোন প্রকারে ঢুকাইয়া দিলেই হইল—তাহার সকল অসমতা বা অসম্পূর্ণতা মিলের দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—ছন্দ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এই রচনাতে বজায় আছে; ওই দুইটি চরণের ভাগগুলির পরস্পর সমতা, এবং অসম-পদের এই সম-সন্নিবেশই ছন্দ—মোট অক্ষর সংখ্যাও ঠিক আছে। কেবল এই একটি গুণেই বাক্যরাশি যে ছন্দোবদ্ধ হইতে পারে—এই রচনা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু বাঙালীর কানে কবিতার ছন্দ ও কবিতার মিল যে কেন সমকক্ষ বলিয়া মনে হয়—এই রচনাটি তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

কবিতার পক্ষে ছন্দের যে প্রয়োজন, মিলের প্রয়োজন সেরূপ নয়, ইহার প্রমাণ সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার কবিতা। যাহাকে কবিতার বাণী-রূপ বলা যায় তাহার মূলে আছে ভাষায়-নির্ম্মিত নানা ছাঁদের rhythmic pattern —এক একটি নির্দ্দিষ্ট মাপের স্পন্দিত বা তরঙ্গিত বাক্যধ্বনি; সেই মাপযুক্ত বাক্যধ্বনি নিয়মিতভাবে পুনাবর্ত্তিত হইতে থাকিলে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের সৃষ্টি হয়। পদ ও পর্ব্বের ভাগ, যতি বা ছন্দভাগ—এই সকলের দ্বারাই সেই rhythmic pattern রচিত হইয়া থাকে, এবং তাহাতেই কানে কবিতার সেই বিশেষ রূপটি ধরা দেয়। এজন্য ইহার অধিক যাহা কিছু—তাহা ছন্দের অলঙ্কার মাত্র, অত্যাবশ্যক নয়। মিল যে কবিতার প্রাথমিক প্রয়োজন নয়, এবং ছন্দই যে কাব্যের ধ্বনি-দেহের প্রাণ, ইহা আমরা সাধারণভাবে জানি ও মানি; কিন্তু বাংলা কবিতায় মিলের প্রয়োজন আছে কিনা—মিল একেবারে ত্যাগ করিয়াও সর্ব্ববিধ কবিতা রচনা করা যায় কিনা, এবং তাহা সম্ভব হইলেও, সেরূপ কবিতা সর্ব্বাংশে, মিলযুক্ত কবিতার সমকক্ষ হইবে কিনা—আমি প্রথমে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অতি প্রাচীন বাংলা কবিতাও মিলহীন ছিল না; আদি বাংলা ছন্দে দীর্ঘ ও হ্রস্ব মাত্রাভেদ এবং তজ্জনিত ছন্দস্পন্দের অবকাশ থাকা সত্বেও, মিল বর্জ্জিত হয় নাই। ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতিই যে তাহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মিলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না—শেষ অক্ষরে মিল থাকিলেই কান সন্তুষ্ট হইত। পরে, দুই অক্ষরে, অথবা শেষ-

অক্ষর এবং তাহার পূর্ব্ব-অক্ষরের স্বরবর্ণে যে মিল, তাহাও বিশিষ্ট মিল বলিয়া গণ্য হইল—এবং আরও পরে, চরণের অন্তে দুইটি সম-ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দ আরও একটু অধিক গৌরব লাভ করিল; ইহারই নাম হইল 'অন্ত্য-যমক'। বলা বাহুল্য, 'যমক' সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি অলঙ্কারের নাম, এবং সংস্কৃত কবিতার পক্ষে এরূপ অন্ত্য-যমক ছন্দের অত্যাবশ্যক অঙ্গ নয়—অলঙ্কার মাত্র। আমার মনে হয়, বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির জন্য একরূপ মিল যেমন প্রথম হইতেই ছন্দে অপরিহার্য্য হইয়াছিল, তেমনই, সেই মিল যে কখনও বিশেষ চর্চ্চা বা মনোযোগের বস্তু হয় নাই, তার কারণ, ওই' সংস্কৃত কবিতার দৃষ্টান্ত,—যেটুকু কানের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন তাহার বেশি কেহ চেষ্টা করে নাই। তথাপি, ওইটুকু মিল—অন্ততঃ শেষ-অক্ষরের ধ্বনিসাদৃশ্য—বাংলা কবিতার ছন্দে অলঙ্ঘনীয় হইয়াছিল। অতঃপর বাংলা ছন্দে মিলের ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায়, এ বিষয়ে যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে, এবং ঘনরাম ও শেষে ভারতচন্দ্রের কবিতায় মিলের সৌষ্ঠব পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। যে সকল কবিতা প্রায় মুখে মুখে রচিত হইত—যাহাকে ঠিক সাহিত্যিক রচনা বলা যায় না—সেইসকল রচনায় মিলের পারিপাট্য আশা করাই অন্যায়। কিন্তু এককালে, কবিওয়ালা প্রভৃতির গীতি-রচনায়, প্রায় ব্যাধির মতই যে একটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—সেই অতিরিক্ত যমক-অনুপ্রাসের মুদ্রাদোষই শেষে আর একদিকে একটা উপকার করিয়াছিল—যমক রচনার অভ্যাস হইতেই ভালো মিল-রচনাও সহজসাধ্য হইল, এমন কি, মিলের বিশুদ্ধি-রক্ষার প্রতি একটু আসক্তিও জন্মিল। এইজন্যই, ভারতচন্দ্রের পরে, কবিওয়ালাদের যুগে যখন রীতিমত কাব্যরচনা লোপ পাইয়াছিল—তখনকার দিনে, যিনি পুরাতন যুগের শেষ ও একমাত্র কবি, সেই ঈশ্বরগুপ্ত বাংলা কবিতায় যেমন যমকের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই তিনিই বিশুদ্ধ মিলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তারপর, রঙ্গলাল ও বিহারীলাল উভয়েই বিশুদ্ধ মিল সম্বন্ধে সমান সজাগ ছিলেন—বিহারীলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তিনি নিজেও বাল্যগুরুর সেই দৃষ্টান্ত হইতে এ বিষয়ে প্রথম হইতে অবহিত হইয়াছিলেন, এবং শেষে বাংলা কাব্যকলার চরমোৎকর্ষ-সাধনে এই মিলকেও উপযুক্ত গৌরবদান করিয়াছেন। মধ্যে, বাংলা

কবিতায় মিলের বড় দুর্গতি ঘটিয়াছিল—মহাকবি হেমচন্দ্রের ছন্দোবদ্ধ বাক্য-বন্যার তটবিপ্লাবিনী ধারায় মিল আবার আদিম দশায় ফিরিয়া আসিতেছিল, এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই দুঃসাহসে সাহসী হইয়া ঐ যুগের অনেক কবি মিল সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই,—দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত কবিও এ বিষয়ে হেমচন্দ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

বাংলা কবিতায় মিলের ইতিহাস এই পর্য্যন্ত। খাঁটি বাংলা ছন্দে সর্ব্বপ্রথম মিলহীন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—কবি শ্রীমধুসূদন; পরে মহাকাব্য ও নাটক-জাতীয় কাব্যের জন্য এই ছন্দের বহুল ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এ পর্য্যন্ত এ ছন্দের বিশিষ্ট সঙ্গীত-গৌরব আর কেহই রক্ষা করিতে পারেন নাই। কাব্যপাঠ ও নাটক-অভিনয় একবস্তু নয়; অভিনয়-কলার সাহায্যে এইরূপ মিলহীন কবিতা (খাঁটি অমিত্রাক্ষর বা ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর) যতই সুশ্রাব্য হৌক, কাব্যচ্ছন্দ হিসাবে, বাংলা ভাষায় ইহার সঙ্গীত-শ্রী বজায় রাখা যে কত দুরূহ, তাহার প্রচুর প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; যেখানে ছন্দ-শ্রী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সেখানে অন্য উপায়ে—যথা, শব্দের ঝঙ্কারে (phrasal music) সে ত্রুটি ঢাকা পড়িয়াছে। অতএব মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর বাংলা কবিতার একটি অমূল্য সম্পদ হইলেও—তৎপরবর্ত্তী কালের বাংলা কাব্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে-কারণেই হৌক, বাংলা কবিতায় মিলের সাহায্য লওয়াই শ্রেয়স্কর; অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলই মিলযুক্ত ছন্দে। এ বিষয়ে অতি-আধুনিক রসিক সমাজে মতভেদ থাকা অসম্ভব নয়; কারণ, শ্রেষ্ঠ কবিতা বা বিশুদ্ধ কাব্যরস যে কি, সেই বিষয়েই বিতর্কের শেষ নাই; তা'ছাড়া, অধুনা বাংলা দেশে শ্রেষ্ঠ কবি ছাড়া অন্যপ্রকার কবির আবির্ভাবই হয় না।

মিলের প্রসঙ্গে প্রাচীন বাংলা কবিতার ছন্দ সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। আধুনিক যুগের পূর্ব্বে, অর্থাৎ মধুসূদন-পূর্ব্ব যুগে, বাংলা কবিতার ছন্দ যে কিরূপ দুর্ব্বল ছিল তাহা আমরা জানি; তখন সুর-সংযোগে কবিতা পাঠ করিতে হইত, তার কারণ, তখন বাংলা ছন্দের একমাত্র আশ্রয় ছিল—অক্ষর-পরিমিতি পদভাগ ও মিল; শব্দের আর কোন ধ্বনি-গুণ ছন্দের সহায়তা করিত না। এজন্য পয়ার ও ত্রিপদীর রকম-ফের ছাড়া, সেকালে বাংলা ছন্দের আর কোন রূপ-বৈচিত্র্য

প্রকাশ পায় নাই। কবিতাকে সুখশ্রাব্য করিবার—অর্থাৎ ছন্দকে সমৃদ্ধ করিবার—শেষ উপায় দাঁড়াইয়াছিল ঐ সুরযুক্ত যমক-অনুপ্রাস ও মিলের একটা মিলিত কলধ্বনি। এই অবস্থায় মধুসূদন একটা অসমসাহসের কাজ করিয়া বাংলায় খাঁটি ছন্দ-সঙ্গীত আমদানি করিলেন; কিন্তু তাহাতেও বাংলা কবিতার সেই পুরাতন ছন্দ-স্বভাব ঘুচিল না,—সুর বর্জ্জন করিয়া, সেই পুরাতন পয়ার ও ত্রিপদীকে একটু যতি-স্বাচ্ছন্দ্য দান করা গেল বটে, বাক্যচ্ছন্দ ও অর্থচ্ছন্দের সঙ্গে কাব্যচ্ছন্দের কিছু মিলন-সাধন হইল বটে, কিন্তু বাংলা ছন্দ মিলকে বর্জ্জন করিতে পারিল না। ইহারও পরে, রবীন্দ্রনাথ যে উপায়ে বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতকে শতরূপা ছন্দ-সরস্বতীর মূর্ত্তিতে মুক্তি দিলেন, তাহার মত ঘটনা পূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার পদ্যচ্ছন্দকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া, শেষে নিছক শিল্পীসুলভ মনোভাবের বশে, বাংলা গদ্যকেও পদ্য-পদবীতে আরোহণ করাইবার যে প্রয়াস করিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতিকে সর্ব্বতোভাবে কর্ষণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে একটা ভ্রান্ত সংস্কার প্রশ্রয় পাওয়ায়, খাঁটি কাব্য-চ্ছন্দের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ বয়সে, অর্থাৎ কবি-প্রতিভার নিবর্ত্তন বা বিশ্রামকালে, খেয়ালের বশে যাহাই করিয়া থাকুন, তিনি যে তাঁহার প্রতিভার যৌবনকালে—সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ বিকাশকালেই, বাংলা কবিতার ছন্দকে দ্বিজত্ব দান করিয়াছিলেন, বাঙালীর অনভ্যস্ত কানে তাহার ভাষার ছন্দ-সঙ্গীতকে নবনব ভঙ্গীতে বাজাইয়া তুলিয়াছিলেন—তাহা অস্বীকার করিবে কে? রবীন্দ্রনাথই বাঙালীর ছন্দ-চৈতন্য জাগ্রত করিয়াছেন, তাহাও সহজে নয়! 'নৈবেদ্যে'র যুগেও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কান ভাল করিয়া পাকড়াইতে পারেন নাই, তখনও "আবার গগনে কেন" এবং "বাজ্‌রে শিঙ্গা" বাঙালীর কান যে ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল, মধুসূদনের ছন্দও তেমন করে নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথও তাঁহার সেই শতরূপ ছন্দসৃষ্টিতে মিলের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন—এমন কি, মিলই তাঁহার সেই ছন্দগুলির অপরিহার্য্য অবলম্বন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা কাব্যসরস্বতীর প্রাণের সঙ্গীতটিকে আবিষ্কার করিয়া থাকেন, এবং বাংলা ছন্দের অদ্বিতীয় উৎকর্ষ-বিধাতা হন, তবে ইহাও

স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার খাঁটি কবি-সংস্কার ও কবি-প্রাণ বাংলা কবিতায় মিলের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবেই অনুভব করিয়াছিল। তাহা হইলে, ইহাই প্রমাণ হয় যে, আদি হইতে একাল পর্য্যন্ত, বাংলা ভাষায় কাব্যরসের অস্ফুটতম অভিব্যক্তি হইতে পূর্ণতম প্রকাশ পর্য্যন্ত, বাঙালীর কবিতা কখনও মিল ত্যাগ করে নাই; তাহার পক্ষে মিলত্যাগিনী হওয়া কুলত্যাগিনী হওয়ার মতই একটা বিসদৃশ ব্যাপার।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাংলা কবিতায় মিলের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অন্তবিধ প্রমাণও অতিশয় বলবৎ—পূর্ব্বে ইহার আভাস দিয়াছি। মিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা স্বৈরাচারের যুক্তি অবশ্য আছে—যুক্তি কিসের নাই? আমি এখানে বাংলা কবিতার ছন্দে মিলের স্বাভাবিক প্রভাব ও তাহার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি,—স্বাভাবিকতাকে হনন করিয়া, ছন্দকে জোর করিয়া নূতন ছাঁচে ঢালাই করা যে যায় না, তাহা বলিতেছি না। বাংলা কবিতার বা পদ্য-বাংলার মিলের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিবার হেতু আছে কিনা, এবং বাংলা ছন্দ মিল ত্যাগ করিয়াও উৎকৃষ্ট কাব্যরচনার সহায় হইতে পারে কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা বর্ত্তমানে বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমি নিজে মিলবর্জ্জিত উৎকৃষ্ট ছন্দ-সঙ্গীতেরই পক্ষপাতী, এবং মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দেই বাংলা ছন্দ-সঙ্গীতের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে বলিয়া মনে করি; কিন্তু যখন দেখি যে, বাঙালীর কলমে বা কানে মিলহীন কবিতা কিছুতেই স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না, তখন এ বিষয়ে আমার নিজের সেই পছন্দকে সংযত করিতে হয়। অধুনা যে অজস্র মিলহীন কবিতা রচিত হইতেছে তাহাতেও আশ্বস্ত হইবার কারণ নাই; যদিও তাহাতে, গদ্যকে ব্যঙ্গ-করা হইতে পদ্যকে অনুকরণ করা পর্য্যন্ত, সর্ব্বপ্রকার ভঙ্গি আছে; অর্থাৎ, কুষ্মাণ্ডলতা হইতে পদ্মের ডাঁটা পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে, এমন কি, কোথাও একটু কুঁড়ির আদলও যেন উঁকি দিয়াছে—তথাপি, এ পর্য্যন্ত তাহাতে একটিও কাব্য-শতদল ফুটিয়া উঠে নাই। মিল ত্যাগ করাটাই বড় কথা নয়, ছন্দের সঙ্গীত-গুণ বৃদ্ধি পাওয়া চাই; আবার শুধুই ছন্দ, বা কবিতার পংক্তিগুলিতে মাত্রা-পরিমিত পদক্ষেপ থাকিলেই কোন রচনা কবিতা হইয়া উঠে না; ছন্দস্পন্দের সঙ্গে ভাবের দীপ্তি ও ভাষার যাদুমন্ত্র যুক্ত হওয়া চাই, তবেই কবিতা মিলের শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া কেবল ছন্দের বলে স্ফূর্ত্তিভরে বিচরণ

করিতে পারে। বাংলা ভাষায় তাহা যে অসম্ভব নয়, মধুসূদন তাহা প্রমাণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা যে সর্ব্ববিধ বাংলা কবিতার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক, এ পর্য্যন্ত আর কোন বড় কবি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই—রবীন্দ্রনাথও নয়; কারণ তাঁহার বহু মিলহীন কবিতায় কাব্য-শ্রী বজায় থাকিলেও, মিলযুক্ত কবিতাই তাঁহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইয়া আছে। তা ছাড়া, মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা যদিও অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাঁহাদের সেই ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উপরে কোন সাধারণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

ছন্দোহীন কবিতার সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য কিছু না থাকিলেও, অধুনা যে এক ধরণের মিলহীন ছন্দোবদ্ধ কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। এইরূপ ছন্দোবদ্ধ মিলহীন কবিতার প্রসার ইদানীং যেন কিছু বাড়িয়াছে; সেইরূপ কবিতার দ্বারা বহু পাঠকের কাব্যরসপিপাসা চরিতার্থ হওয়াও সম্ভব; কারণ, কাব্যরসে সকলের অধিকার না থাকিলেও, গল্প-উপাখ্যান ও গল্পের প্রসাদে বহু অরসিক এক্ষণে সাহিত্য-রসিক হইয়া উঠিয়াছে; এবং রসিকতারও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তাই কাব্যরস-বিষয়েও এই সকল রসিকের অভিমান-তৃপ্তির পক্ষে ঐরূপ কবিতাই যথেষ্ট। এইরূপ মিলহীন কবিতার পক্ষেও যুক্তি আছে; একটা যুক্তি খুবই সঙ্গত, যথা—উহাদের ভাববস্তুর সঙ্গে ঐরূপ মিলহীনতার একটা গূঢ়তর সঙ্গতি আছে। কথাটা খুবই সত্য, কারণ যেখানে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাই অন্যরূপ—খাঁটি রস-প্রেরণা নয়, সেখানে কবিতার বহিরবয়বও তদ্রূপ হওয়াই স্বাভাবিক। এ সকল কবিতায় প্রায়ই কতকগুলি কাঁচা ভাবের আবেগ মাত্র থাকে, তাহাও কোন না কোন সুস্পষ্ট চিন্তা বা মতবাদের আবেগ; এজন্য সুরের পরিবর্ত্তে চীৎকার থাকিলেই যথেষ্ট, তাই তাহাকে সহজেই মিলহীন কবিতায় ছন্দিত করা যায়। দ্বিতীয় একটি যুক্তিও কেহ কেহ উত্থাপন করিতে পারেন, তাহা এই যে, যাঁহারা এইরূপ মিলহীন কবিতা রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মিল-রচনাতেও সিদ্ধহস্ত, অতএব অক্ষমতাই ইহার কারণ নয়; নিশ্চয় বিশিষ্ট কাব্যপ্রেরণার ফলেই এরূপ কবিতা জন্মলাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, অনেক হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসক আছেন যাঁহারা পূর্ব্বে এলোপ্যাথী-চিকিৎসাতেও প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অতএব হোমিওপ্যাথীও একটা

খুব বড় চিকিৎসা—যুক্তি অনেকটা এইরূপ। কিন্তু এমন দৃষ্টান্তঘটিত যুক্তিও একেত্রে অচল; কারণ, মিল-রচনা একরূপ রচনা-শক্তি মাত্র—নিছক গদ্যবস্তুকেও অনর্গল মিলের মালায় গাঁথিয়া যাওয়া যায়; আবার, হাস্যরস-রচনা বা ব্যঙ্গ-রচনা-শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারাও আশ্চর্য্য মিল-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। অতএব, মিল-রচনার শক্তিই খাঁটি কবিত্বের লক্ষণ না হইতে পারে। ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, বাংলা ছন্দে মিলের প্রয়োজন যেমনই হৌক—মিল কাব্যচ্ছন্দের একটা সহকারী কৌশল মাত্র, তাই অন্যান্য অলঙ্কারের মত মিলের কৌশলও, কোন কোন বাক্যশিল্পীর আয়ত্ত হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মিলহীন কবিতার পক্ষে তৃতীয় একটি যুক্তিও আছে—তাহা ঐ প্রথম যুক্তিরই অপর দিক, তাহা এই যে, আধুনিক মানব-মন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে নূতনতর সত্যের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে কাব্যেও এখন নিছক কল্পনা বা রসাবেশের বিলাস চলিবে না—তেমন কবিতাই অতিশয় কৃত্রিম ও অনুভূতি-বর্জ্জিত। এতদিন জীবনের অতিগভীর বিরাট বাস্তবমূর্ত্তি অপ্রকট ছিল বলিয়াই, কবিতায় বালসুলভ কল্পনা আধিপত্য করিয়াছে—সেরূপ কল্পনার পক্ষে বিধিবদ্ধ কৃত্রিম ভাষা এবং ছন্দ ও অলঙ্কারের উপযোগিতা হয়ত ছিল, কারণ, তখন ভাব ও অর্থকে আচ্ছন্ন করিয়া রসাবেশ-সৃষ্টি করাই ছিল কবিতার একমাত্র লক্ষ্য। জীবনের বাস্তব-অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দিতে হইলে, সকল কারুকার্য্য—ছন্দ-মিলের গণ্ডিও—ত্যাগ করিতে হইবে, সুন্দর-কুৎসিতের ছুৎমার্গও আর চলিবে না; এখন, রসবিলাসী মন নয়—বস্তুনিষ্ঠ, এবং চিন্তা ও তর্কপ্রবণ মনের জন্য, বলকারক পথ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার উত্তরেও কেবল একটিমাত্র কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তাহা এই। আধুনিক জীবন-চেতনা, এবং তজ্জনিত সর্ব্ববিধ ভাব ও ভাবনাকে ভাষায় রূপ দিবার জন্য আধুনিক গদ্যই ত' একটি উৎকৃষ্ট বাহন হইয়া উঠিয়াছে—পদ্য যে তাহার মত শক্তি ধারণ করে না, ইহা ত' বহুপূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। সেই গদ্যের প্রকাশ-ক্ষমতা এবং ভঙ্গিবৈচিত্র্যের অন্ত নাই। তবে কেন এই মিলহীন, ছন্দহীন কবিতার উপাসনা? বিশুদ্ধ কাব্যরস যদি মদ্যের মতই অদেয় অপেয় অগ্রাহ্য হয়, তবে তাহারই গেলাস-ধোয়া জলে এত আসক্তি কেন? তার চেয়ে শাদা জলই ত' ভাল! কিন্তু কবিতা হওয়াও যে চাই, নহিলে যে 'কবি' হওয়া যায় না! আজকাল

আরও যে সব 'কবিতা' নানা 'ইজ্‌মের' দোহাই দিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে, তাহাদের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু, আমি আমার বক্তব্যের কিছু বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি—আমি বাংলা-ছন্দে মিলের অপরিহার্য্যতার কথাই বলিতেছিলাম। সে প্রসঙ্গে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট কবিতায় মিলের সার্থক প্রয়োগ আমরা দেখিয়াছি, ইহাও দেখিয়াছি যে, বিশেষ করিয়া বাংলা গীতিকাব্যে মিলের সাহায্যেই চরম রসসৃষ্টি হইয়াছে। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক, যে—বাঙালী কবি যদি সত্যকার রসপ্রেরণাবশে কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে মিল তাঁহার ছন্দে আপনিই আসিবে,—সে মিল ভাষা ও ছন্দের মতই কবিতার অঙ্গে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

মকর চূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতন সাজ করিল ঝলমল।
মধুর হ'ল বিধুর হ'ল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ চাঁদ হাসে আকাশ কোলে,
আলোক-ছায়া শিব শিবানী সাগর-জলে দোলে।

* * *

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এস প্রদীপখানি ধরি'।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে,
এবার আমি আনিনি ডালি দখিণ সমীরণে
সাগর-কূলে তোমার ফুল-বনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা।

("সাগরিকা"—মহুয়া)

অথবা—

এলোচুলে ব'হে এনেছ কি মোহে
সেদিনের পরিমল।
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল।
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
চারু-চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে,
সে-দিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল!
অঞ্চল হ'তে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল॥
("লীলা-সঙ্গিনী"—পূরবী)

উপরের পংক্তিগুলি পাঠ করিবার পর আমি মাত্র এই কয়টি প্রশ্ন করিব—(১) এই দুইটি কবিতা কি মিলহীন ছন্দেও রচিত হইতে পারিত? (২) উহাদের রস যদি খাঁটি কাব্যরস হয়, এবং তাহার প্রেরণা যদি কবির অন্তরে সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া থাকে, তবে বাংলা কবিতায় মিলের প্রয়োজন আছে কি না? (কারণ, উৎকৃষ্ট কাব্যরস সকল কবিতার পক্ষেই এক), (৩) মিলহীন কোন কবিতার ভাব-গম্ভীরতা যেমনই হোক—তাহার অঞ্চল হইতে বায়ুস্রোতে এমন পরিমল ঝরে কি?

বাংলায় রীতিমত গীতিচ্ছন্দে মিলহীন কবিতা কেমন হয় তাহাই পরীক্ষা করিবার ছলে একবার ঐরূপ একটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ করিয়াছিলাম—কবিতাটি ইংরেজী কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী টেনিসনের রচনা। টেনিসনের সেই ধরণের কবিতাগুলিতে একটি অপূর্ব্ব সুর আছে, সে সুর মুখ্যতঃ ভাব ও ভাষার সুর, তাই ছন্দের ধ্বনি সৌষ্ঠব ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি, পংক্তিগুলির অক্ষরবিন্যাসে যথেষ্ট কানের সূক্ষ্মতা আছে—ছন্দপ্রবাহে স্বরধ্বনিগুলির এমন একটি আমন্থর ঊর্ম্মি-লীলা আছে, যাহা ঠিক ওই ভাবের কবিতার বড়ই উপযোগী। আমি এখানে সেই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—;

"Now sleeps the crimson petal, now the white;
Nor waves the cypress in the palace walk,
Nor winks the gold-fin in the porphyry font,
The fire-fly wakens; waken thou with me.

"Now droops the milkwhite peacock like a ghost,
And like a ghost she glimmers on to me.

"Now lies the Earth all Danae to the stars,
And all thy heart lies open unto me."

(*The Princess*)

অতি ধীরে ধীরে নিম্নকণ্ঠে এই কবিতাটি পাঠ করিতে হয়;—যেন, অলিন্দতলে নীরব নির্জ্জন জ্যোৎস্না-রাত্রি যাপন করিবার জন্য প্রেয়সীকে এই যে আবাহন, ইহাও নিদ্রা-স্বপ্নের পরিবর্ত্তে জাগর-স্বপ্নে মগ্ন হইবার জন্য; তাই, শুধুই চিত্র-রচনায় নয়—ভাষায় ও ছন্দে, কবি একটি ঘুমের ঘোর সৃষ্টি করিয়াছেন, ছন্দকে বেশি বাজাইয়া তোলেন নাই। মোটের উপর, ভাব-বিশেষের পক্ষে, এ ছন্দের এই মিলহীনতা—শৈথিল্য নয়, রীতিমত শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচায়ক। ভাবের অনুরূপ দেহ-নির্ম্মাণ করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, শিল্পী তাহাই করিতে বাধ্য। তথাপি ভাষা যেমন তাহার সহায়, তেমনই বাধাও বটে, সেই বাধা জয় করিতে হইলে কবি-শিল্পীর দুঃসাহস বা স্বৈরাচারই যথেষ্ট নয়,—প্রেয়সীর মতই তাহার সপ্রেম আরাধনা করিতে হইবে, এবং তাহাব শক্তিব অধিক দাবী করিলে চলিবে না। ইংরেজীতে যাহা এত সুন্দর, তাহাও সে ভাষায় সর্ব্বত্র সম্ভব নয়। এখানে ছন্দ অপেক্ষা সুরের প্রাধান্য অধিক হওয়ায় ক্ষতি নাই, কিন্তু সুরমাত্রই কবিতার নিত্যকার বাহন নয়—নিতান্তই নৈমিত্তিক। তা'ছাড়া, এ সুর অতিশয় ক্ষীণ-প্রাণ—দীর্ঘ কবিতার পক্ষে ইহা অচল। তথাপি বাণীর অঙ্গপ্রসাধনে এইরূপ কারুকার্য্যের মূল্য আছে; বঙ্গবাণীর অঞ্চল-প্রান্তে এইরূপ দুই একটি নক্সা আঁকিতে পারিলে মন্দ কি? তাই আমি ওই কবিতাটির অনুকরণে এইরূপ পংক্তি রচনা করিয়াছিলাম—ইংরেজীর সহিত মিলাইয়া দেখিতে বলি,—

ফুলেরা ঘুমায়, শাদা আর লাল পাপড়িতে ঘুম ঢালা,
প্রাসাদ-কাননে তরুবীথি 'পরে দুলিছে না ঝাউগুলি,
নীলকাচে-ঘেরা সোনার শফরী জলতলে গতিহারা;
জোনাকীরা জাগে; মোর সাথে আজ তুমি জাগো, সহচরি!

বাংলায়, অন্ততঃ ঐ চারি পংক্তিতে, মিলের একটু আভাস আছে—প্রথম ও

তৃতীয়, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির শেষ শব্দগুলি সম-স্বরান্ত (vocal assonance) হইয়াছে। ইহার পরের পংক্তিগুলিতে তাহাও নাই—

দুধের বরণ ময়ূর হোথায় ঝিমায় ঝরোকাতলে,
ঝিকিমিকি করে—দেখে মনে হয়, এ কোন উপচ্ছায়া!
ধরা খুলে দেছে সারা বুক তার তারাদের উদ্দেশে—
সজনি, তোমারো বুকখানি খোলা আমার নয়নতলে।

('নিশীথ-রাতে'—হেমন্ত-গোধূলি)

—এগুলিতে আর কানের সে মান-রক্ষাও নাই, তাই পংক্তিগুলি বড়ই ছাড়া ছাড়া মনে হয়—ছন্দ আছে, কিন্তু ছন্দ-মণ্ডল নাই, পংক্তিগুলির মধ্যে একটি কেন্দ্রগত সঙ্গীত-সুষমা নাই; মিল না থাকায় জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে। প্রণয়ীর অর্দ্ধস্ফুট গদগদ-ভাবের মত এইরূপ শিথিল-বন্ধ পংক্তিরাজি ভাবের উপযুক্ত শব্দ-শরীর হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ ছন্দোবন্ধ আমাদের ভাষায় কেমন একটু দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ মনে হয়—ইংরেজীর যে সুবিধা আছে বাংলার তাহা নাই, ইংরেজী অক্ষরগুলি (syllable) সহজেই স্পন্দিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ যখন বয়সেও কবি ছিলেন, তখন একটিমাত্র মিলহীন গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ('মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা'); তারপর যৌবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি আর সে চেষ্টা করেন নাই; বোধ হয় প্রাণ ও কান এই দুয়েরই সমর্থন পান নাই। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তাহা এই যে, শব্দের নানাবিধ ধ্বনিসন্নিবেশে যে সকল বস্তুর সৃষ্টি হয়, তাহা নিছক কারুকর্ম্ম মাত্র—কবিতার রূপ-কর্ম্ম নয়; সেইরূপ পরীক্ষামূলক প্রয়াস যতই সফল হউক, তাহাতে খাঁটি কাব্যের সম্পদবৃদ্ধি হয় না।

কিন্তু বাংলা কবিতায় ছন্দ ও মিলের এই যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, ইহার কারণ কি? কারণ—পূর্ব্বে বলিয়াছি—ভাষার প্রকৃতি। যে ভাষায় accent বা স্বরবৃদ্ধির তেমন সুযোগ নাই, সংস্কৃতের মত হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের স্থানও নাই, সে ভাষায় ছন্দ একাই কাব্যসঙ্গীতের পূরা প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না। তা ছাড়া, জাতির চরিত্র-বশে তাহার ভাষাতেও একটা উচ্ছ্বাস-প্রবণতা থাকে,—বাক্য ক্রমাগত কাব্যচ্ছন্দকে লঙ্ঘন করিতে চায়; এরূপ ক্ষেত্রে রসাত্মক বাক্যের যে অন্তর্গূঢ় সংযম তাহা রক্ষা করিবার জন্য রসাবিষ্ট কবিশিল্পীকে সতর্ক হইতে হয়—ছন্দ যতই

উন্মার্গগামী হয় ততই মিলের দ্বারা তাহাকে সংযত ও শোভনতর করিয়া তুলিতে হয়; ইহা বোধ হয় বাঙালী কবিমাত্রেই অনুভব করিয়াছেন। যাঁহারা সত্যকার কাব্যরসপিপাসু, তেমন বাঙালী পাঠক বা শ্রোতা নিশ্চয় অনুভব করিয়া থাকেন যে, মিলহীন কবিতা যতই স্বচ্ছন্দ হৌক, কানে তাহার স্বাদ লবণহীন বলিয়া মনে হয়; সে কবিতায় বক্তৃতা থাকিতে পারে, ভাব বা চিন্তার চমকও থাকিতে পারে, কিন্তু সে যেন অন্যবস্তু—কবিতা নয়। অতএব, আর কোন প্রমাণে না হৌক—রসিকের রসানুভূতির প্রমাণে, স্বীকার করিতেই হয় যে, বাংলা ভাষায়, তথা বাঙালীর শব্দরস-চেতনায়, এমন একটা কিছু আছে, যাহার জন্য, সে আদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, তাহাব পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বাহিনী রসপ্রেরণাকে কবিতার বৈখরী-বেশে প্রকাশ করিতে গেলেই, ঐ মিল অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। আমি এমন কথা বলি নাই যে, বাংলায় মিলহীন কবিতা-রচনা অসম্ভব,—আমি কেবল ইহাই বলিতে চাহিয়াছি যে, বাংলা কবিতায় মিলের যে প্রয়োজন নাই, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; ববং উৎকৃষ্ট কাব্যরসসৃষ্টির পক্ষে মিলই সহজ ও স্বাভাবিক। এই আলোচনাব আরম্ভে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সবকাব মহাশয়েব যে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার যুক্তি অতিশয় দুর্ব্বল হইলেও, তাহাতে কবিতা সম্বন্ধে খাঁটি বাঙালী-সংস্কারের পরিচয় আছে। ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে ডাঃ জনসনেব উক্তিটিও অতিশয় মূল্যবান, বিশেষতঃ এই কথাটি—"One language cannot communicate its rules to another"। আজিকার এই উন্মাদ অনুকরণের দিনে, শুধু ছন্দ কেন, ভাষার উপবে যে যথেচ্ছাচাব চলিতেছে, তাহাতে ওই উক্তি সর্ব্বদা স্মবণীয়। আর একটি যে কথা তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন তাহা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই অর্থপূর্ণ—

But perhaps of poetry as a mental operation, metre or musick is no necessary adjunct.

—অর্থাৎ কবিতা যদি শুধুই একটা চিন্তাপদ্ধতিগত বা মানসিক ক্রিয়ামাত্র হয়, ছন্দ বা সুর কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই। এ সত্য আমরা এক্ষণে হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি।

ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও, এখানে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিলে ভাল হয়। এই প্রবন্ধে আমি বাংলা কবিতায়, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনায়, মিলের

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এবং তাহাতে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, বাংলা কবিতায় শুধু ছন্দ নয়, মিলের সাহায্যও আবশ্যক,—ছন্দোবদ্ধ মিলহীন রচনায় রসসৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকে। কোন ভাব রস-পরিণতি লাভ করিলে কবির মনে যে সুর-সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী—বাংলা পদ্যছন্দ একাই তাহা ধারণ করিতে অক্ষম,—বাংলা ভাষার প্রকৃতিই তাহার কারণ। কিন্তু অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আর এক ধরণের রচনাও কাব্য-পদবী দাবী করিতেছে—ইহাতে ছন্দ নাই, কেবল বাক্যঘটিত একপ্রকার ধ্বনি-সৌন্দর্য্য আছে ; ইংরেজীতে ইহাকে "free rhythm" বলে, বাংলায় ইহাকে পদ্যচ্ছন্দ না বলিয়া 'বাক্যচ্ছন্দ' বলা যাইতে পারে। আমি এইরূপ বাক্যচ্ছন্দের কবিতায় সত্যকার কাব্যরসের সাক্ষাৎ কচিৎ-কখনো পাইয়াছি ; অধিকাংশই ভাব-কল্পনাহীন নীরস রচনা—আবেগ বা চীৎকার-যুক্ত চিন্তা ও তর্ক, নিরতিশয় গদ্য-বস্তু ; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এইরূপ রচনায় কেবল ওইরূপ চিন্তার আবেগ ছাড়া কাব্যরস সঞ্চার করিতে পারেন নাই। তথাপি যে দুই একটিতে কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, বাংলা বাক্-প্রকৃতি এইরূপ কাব্যসৃষ্টির অনুপযোগী নয়। আমি রবীন্দ্র-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে (আশ্বিন, ১৩৪৮) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা, '২২-এ শ্রাবণ, ১৩৪৮' পড়িয়া দেখিতে বলি, আমার বিশ্বাস ওই বাক্যচ্ছন্দের কবিতাটিতে সত্যকার রসসৃষ্টি হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—এই উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় ;—

"But where everything else required by poetry is present, the use of free rhythm cannot be considered as implying lack of something which poetry must possess, but rather as the use of one means of expression for another"

—*Lascelles Abercrombie*

এই যে 'free rhythm' বা স্বৈর-চারী বাক্যচ্ছন্দ,—ইহাতেও যে আবেগের সুর আছে, তাহা অতিশয় সত্য বা আন্তরিক হওয়া চাই ; আবেগের সেই আন্তরিকতাই ছন্দ-বন্ধন অগ্রাহ্য করিতে পারে। এই বাক্যচ্ছন্দ বাহিরে অনিয়মিত হইলেও, ভিতরে একটা গভীরতর নিয়ম তাহার ওই গতিকে শাসন করে বলিয়া, তাহারও একটা সুর-সঙ্গতি আছে। কবিতামাত্রেরই এইরূপ একটা

ছন্দ-সুর থাকিবেই—"poetry as a mental operation-"এর কথা স্বতন্ত্র। আমি ইহাকে 'বাক্যচ্ছন্দ'ও বলিব না—'ভাবচ্ছন্দ' বলিব। এক হিসাবে এইরূপ কাব্যরচনা আরও দুরূহ—কারণ, এখানে বাক্য কেবলমাত্র ভাবের উদ্দীপনা-বশে আপন ছন্দ আপনি রক্ষা করে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-সঙ্গীত ইহারই এক ধাপ মাত্র উপরে; তাহারও সেই স্বচ্ছন্দ যতিবিন্যাসের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; পদ্যচ্ছন্দের (metre) বশ্যতা স্বীকার করিয়াই সেই যে বাক্যচ্ছন্দের (free rhythm) অবারিত প্রবাহ—বাংলা কবিতায় সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত—আর কেহ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে ইহার অধিক আলোচনা এখানে অবান্তর; তথাপি আমি ইহার উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, সাধারণ ছন্দোবদ্ধ মিলহীন কবিতা আর এই ধরণের কবিতার মধ্যে দূরতম সম্বন্ধও নাই; তাই পদ্যচ্ছন্দে মিলের যে প্রয়োজন আছে বাক্যচ্ছন্দে তাহা নাই, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

২

কবিতার মিল বলিতে আমরা সাধারণত দুই চরণের শেষ দুই শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্য বুঝিয়া থাকি। এইরূপ মিল যেমন একরকমের হয় না, তেমনই, মিলেরও ভাল-মন্দ আছে। রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালী কবিরা মিল সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইয়াছেন, তাই যতদূর সম্ভব ভাল মিলের দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। পূর্ব্বে ওইরূপ দুইটি শব্দের শেষ অক্ষরটি এক হইলেই তাহা মিল বলিয়া গণ্য হইত, যেমন—**গানে = বরণে; হেথা – প্রথা; হ্রদ – ছাদ; শ্মশানে – স্বপনে; দেহী = নাহি,** প্রভৃতি; ইহা অতি নিকৃষ্ট মিল; অন্তত শেষের অক্ষর এবং পূর্ব্ব বর্ণের স্বরধ্বনির মিল না হইলে তাহাকে সহজ মিল বলা যাইবে না, যথা—**গানে = প্রাণে; যথা – প্রথা; হ্রদ – নদ; শ্মশানে – বিমানে; চাহি = নাহি।** শেষ অক্ষর যদি হসন্ত হয় তবে সেই হসন্ত-বর্ণ সহ পূর্ব্বের স্বরবর্ণের মিল হইলেই হইল, যথা—**চল্ = ছল্; উদাস – বাতাস,** ইত্যাদি। ইহাই মিলের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন; পরে মিলের বৈচিত্র্য ও নানা কৌশলের কথা বলিব।

সকল ভাষায় স-মিল শব্দ (rhyming word) সমান সুলভ নয়, বাংলাতেও এইরূপ শব্দের পর্য্যায় খুব প্রশস্ত নয়, প্রয়োজন-মত দুই তিনটির অধিক সমিল শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্ঘট। সাধুভাষা অপেক্ষা কথ্যভাষায় মিল-রচনার

সুবিধা আছে, পরে তাহা দেখাইব। কবিগণ মিলের খাতিরে অতিশয় সাধু এবং অতিশয় কথ্য ভাষার শব্দে মিল-বন্ধন করিয়া থাকেন, তাহাতে কার্ণের তৃপ্তি হইলেও ভাষার উপরে একটু অত্যাচার হয়—সেরূপ মিল লঘু ছন্দ ও লঘু ভাবের কবিতায় বাধেনা, বরং ভালই হয়, যথা—

ছুটি বোন তারা হেসে যায় কেন, যায় যবে জল **আন্‌তে ?**
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায় দাঁড়িয়ে পথের **প্রান্তে ?**

("ছুই বোন"—ক্ষণিকা)

তথাপি, ছুই বা তিন সমিল শব্দের অভাব বাংলায় প্রায় হয় না, এজন্য পয়ার বা ত্রিপদী ছন্দে কবিতা-রচনায় কবিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না, বরং অনেক সময়ে তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়—"প্রবল মিলের ঝোঁকে, ভেসে যাই একরোখে"। আবার, আধুনিক গীতিচ্ছন্দে যেরূপ মিলের প্রয়োজন হয় (একটু জমকালো মিল) তাহা নানা কৌশলে গড়িয়া লইতে হয়, যেমন—**কোন্ দুরে —বন্ধুরে ;** দেখা গিয়াছে, এরূপ মিলের পক্ষে আমাদের ভাষা বেশ সচ্ছল বা সচ্ছন্দগামিনী।

এইবার ভাল মিলের একটা মোটামুটি শ্রেণীভাগ করিয়া দৃষ্টান্ত দিব।—

(১) ভিন্নার্থবোধক একই শব্দের মিল, ইহাকে **যমক-মিল** বলা যাইতে পারে, ইংরেজীতে ইহাকে 'rich rhyme' বলে, যথা—

বাজারেতে গিয়ে বলি কই-মাছ **কই**।
সকলি ত কাঁটা এতে মাছ এতে **কই** ॥

(ঈশ্বর গুপ্ত)

আট পণে আধসের আনিয়াছি **চিনি**।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি **চিনি** ॥

(ভারতচন্দ্র)

কুলে—কূলে, দেশ—দ্বেষ, প্রভৃতিও এই শ্রেণীর মিল।

(২) যুক্তাক্ষর-ঘটিত মিল, যথা—**বন্ধ—গন্ধ—ছন্দ ; নন্দন—চন্দন—ক্রন্দন ; বন্যায়—কন্যায় ;** ইংরেজীতে এইরূপ মিলকে feminine rhyme বলে, বাংলায় 'ললিত মিল' বলা যাইতে পারে ; শেষের শব্দগুলিতে স্পষ্ট ডবল-মিলের আদল রহিয়াছে। পয়ারপংক্তির শেষে এইরূপ মিল খুব ভাল হয় না—ছন্দের সুর ক্ষুণ্ন হয়।

(৩) ডবল, এবং দুইএর অধিক অক্ষর-(syllable)-ঘটিত মিল, যথা—
নয়ন—শয়ন ; দরশন—পরশন ; কামিনী—দামিনী ; ইত্যাদি।

(৪) খণ্ডিত মিল ; এরূপ মিলের উদাহরণ বাংলায় বেশি নাই, একটি উদ্ধৃত করিতেছি—

শ্রাবণে ডেপুটিপনা,—এত কভু নহে সনা—তন প্রথা এযে অনা—সৃষ্টি অনাচার !
(রবীন্দ্রনাথ)

(৫) মধ্য-মিল (sectional rhyme) ; আমাদের পণ্ডিতী ভাষায় সাধারণ মিলকে যেমন অন্ত্য-অনুপ্রাস বলে, তেমনই এরূপ মিলকে মধ্য-অনুপ্রাস বলা যাইতে পারে; এখানে মিলের শব্দগুলি একই পংক্তির অন্তর্গত ; যথা—

পঞ্চনদীর ঘেরি দশ তীর এসেছে সে একদিন (রবীন্দ্রনাথ)
* * *
বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ ঐ
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন (দ্বিজেন্দ্রলাল)
* * *
কোথা হা হন্ত—চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি (রবীন্দ্রনাথ)

অনুপ্রাসের গুণে, চরণমধ্যে এমন মিলের ভিন্নরূপও দেখা যায়, যথা—

মুছিয়া নয়ন-জল বসন-আঁচলে (মধুসূদন)
* * *
পাইনু সরমা সই পরমা পীরিতি (ঐ)
* * *
খুল্লতাত বিভীষণ, বিভীষণ রণে (যমক) (ঐ)
* * *
সেই মুকুল-আকুল-বকুল-কুঞ্জ ভবনে (রবীন্দ্রনাথ)

ইহা কিন্তু বাংলা ত্রিপদীর মিল নহে, কারণ ছন্দ ত্রিপদী না হইতেও পারে।

(৬) ইংরাজীতে যাহাকে Inverse Rhyme বলে, বাংলায় আমি তাহাকে 'জোড়মিল' বলিব, কারণ সে মিল এই রকমের—

একদা, তুমি প্রিয়ে, আমারি এ নদীকূলে (রবীন্দ্রনাথ)
* * *
ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী (ঐ)
যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে হাসি চেপে রাখতে পারে কোন—
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

এইবার দোষযুক্ত বা অস্পষ্ট মিলেরও একটা তালিকা দিব।—

(১) বাংলায় একাক্ষর শব্দের মিলও দেখা যায়, তেমন মিলে ব্যঞ্জন-ধ্বনির সাদৃশ্য থাকে না, কেবল স্বর-ধ্বনিতেই মিলের কাজ হয়, যথা—**যে—রে, কে—সে, মা—না।** এইরূপ মিলে যদি ব্যঞ্জন-বর্ণের কিঞ্চিৎ ধ্বনি-সাদৃশ্য থাকে—অর্থাৎ একই বর্গের হয়, এবং যদি মিলের উপরে কণ্ঠস্বরের জোর (ঝোঁক) পড়ে তবে তেমন মিল অপাংক্তেয় নয়, যথা—

কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ
কহিল, ওস্তাদ জি,
গানের মত গান শুনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি!

(রবীন্দ্রনাথ)

(২) ব্যঞ্জন-ধ্বনির ঈষৎ সাদৃশ্যযুক্ত অসম্পূর্ণ মিল, যথা—
ভিত্তি—কীর্ত্তি; সত্য—ভক্ত; রন্ধ্র—বন্ধ; পত্রিকা—বর্ত্তিকা। অনেক সময়ে **ম্—ন্—ঙ** এই বর্ণতিনটিকেও সম-মিল ধরা হয়। **সেবন—এবং**—স্থানবিশেষ চমক লাগায়, এবং **আংটিতে—গানটিতে** (আং—গান্) কানে ভালই লাগে।

(৩) ব্যঞ্জনের ন্যায় স্বরধ্বনিরও ঈষৎ সাদৃশ্য একরূপ মিলের কাজ করিয়া থাকে—কিন্তু সে মিল খুব ভাল নয়; যথা—**অঞ্জলি—অঙ্গুলি, তরুণী—তরণী, কাকলি—আকুলি।**

(৪) কানের পরিবর্ত্তে একরূপ চোখের মিল (eye rhyme), যথা—**দেখা—লেখা; তব—সব; সহিত—নিহিত; প্রগাঢ়—আষাঢ়;** ইত্যাদি।

(৫) পংক্তির মধ্যে যেমন হোক, অন্তে -তে, -তা প্রভৃতি প্রত্যয়-মূলক মিল ছন্দকে দুর্ব্বল করে, যেমন—**যেতে যেতে—নয়নেতে; কাঁচা ধানের ক্ষেতে—নদীর তরঙ্গেতে;** অথবা, **ব্যাকুলতা—কাতরতা,** প্রভৃতি।—তে প্রত্যয়ের মিল স্থানবিশেষে নিন্দনীয় নয়, যেমন—**পরশিতে—সরসীতে;** এখানে মিল কেবল শেষ-অক্ষরেই নয়; তা'ছাড়া, প্রত্যয়টিও অতিরিক্ত নয়।

(৬) 'হ'য়ের সঙ্গে 'য়'য়ের মিল, অথবা 'ই'এর মিল, যথা—**ভরিয়ে—হরি হে; অয়ি—হই; হারাই—বৃথায়,** প্রভৃতি।

(৭) বাংলায় আর এক প্রকার মিল হয়, তাহা পুরা-মিল না হইলেও দূষণীয় নয়—একই বর্গের এক-এক যুগ্ম-ব্যঞ্জনবর্ণের মিল, যেমন—কাজে-মাঝে; মাঘ-ভাগ; যবে-লভে; কিন্তু—কাছে-কাজে, মেখে-মেঘে প্রভৃতি ভাল মিল নয়।

(৮) উচ্চারণের ঠিক না থাকিলেও মিলের দোষ হয়। যেমন—তৃণ-লীন; এখানে দুইটিই স্বরান্ত বা দুইটিই হসন্ত উচ্চারণ করিতে হইবে, নহিলে মিলের দোষ হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এরূপ স্থলে হসন্তের পক্ষপাতী, যথা—

—লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
(গান্ধারীর আবেদন'—কথা)

তিনি 'ম্লান' শব্দটির স্বরান্ত উচ্চারণ করিয়াছেন; এরূপ স্থলে পাঠককে একটু সাবধান হইতে হয়।

(৯) কবিরা অনেক সময়ে মিলের খাতিরে শব্দের বানান ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রয়োজন মত লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। কবি হেমচন্দ্র—'বিস্ময়ী' 'কাকলে' (কাকলিতে) প্রভৃতির মত—জবরদস্তি কিছু বেশি করিয়াছেন; আমাদের রবীন্দ্রনাথও 'উষসী' লিখিয়াছেন, আরও একস্থানে তিনি একটু বেশি স্বাধীনতা দাবী করিয়াছেন, যথা—

যা' হবার হবে, সে কথা ভাবি না,
মাগো, একবার ঝঙ্কারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্ব-প্লাবিনা
অমৃত উৎসধারা। ('পুরস্কার'-সোনার তরী)

'প্লাবিনী' না হইয়া 'প্লাবিনা' হইয়াছে। বড় কবিদের কবিতায় ইহারই নাম 'আর্ষ প্রয়োগ', কিন্তু ছোট কবিদের এত স্বাধীনতা দাবী না করাই ভাল, কারণ তাঁহাদের রচনায়, 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে' এমন অদৃশ্য হইয়া থাকিবে না।

অতঃপর বাংলাতেও মিলের নানা কৌশল ও পারিপাট্য কেমন বাড়িয়াছে তাহাই দেখাইব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধুভাষা অপেক্ষা কথ্যভাষায় অনেক কৌশল সহজে করা যায়, যেমন—

(১) এক রকম খাঁটি ধ্বনি-সাদৃশ্যের মিল—শব্দগুলিকে যেন কাটিয়া ভাঙিয়া, আবার জোড়া দিয়া; যথা—

বেদব্যাস—বদ্ অভ্যাস; আনন্দে—প্রাণধন দে; যেতো রে—কে তোরে; আসিবে না—শেষ চেনা; খেয়াপার—কে আবার; কত না—বেদনা; বাঁধিও—না দিও। লঘুভাব বা হাস্যরসের কবিতার পক্ষে এইরূপ মিল বড়ই উপযোগী; এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, ও বিশেষ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল, কৌশলের চূড়ান্ত করিয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রলালের এইরূপ পংক্তি মিলের জন্য স্মরণীয় হইয়া আছে, যথা—

> পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল—বলেন সর্ব্বশাস্ত্রী।
> কুমীর ধর্ল্লে ছাড়ে তবু, ধর্ল্লে ছাড়ে না স্ত্রী।
>
> (হাসির গান)

(২) আমি পূর্ব্বে শব্দের একাধিক অক্ষরে মিলের কথা বলিয়াছি, সাধু বাংলায় ইহারও যথেষ্ট অবকাশ আছে, যথা—**বরষায়—ভরসায়; বৈরীকে—গৈরিকে; অপহরণ—অবতরণ;** প্রভৃতি। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মিলের অধিকতর পারিপাট্য বাংলায় সম্ভব, সেখানে ডবল বা ততোধিক অক্ষরই শুধু নয়, একাধিক শব্দের সহযোগে মিলকে বিসর্পিত করা হয়, যথা—**গোপন ঘরে—যতন ভরে; বৈয়াকরণ—লইয়া চরণ; শেফালিকাতলে—কে বালিকা চলে;** এমন অনেক আছে। এই রকম মিলকে ইংরেজীতে tumbling rhyme বলে, বাংলায় 'টানা-মিল' বলিতে পারি। কিন্তু এ ধরণের মিলে একটু অতিরিক্ত কারিগরি বা বাহাদুরির ভাব থাকে। প্রায় এই ধরণের হইলেও, কতকগুলিকে আরও সুন্দর ও সচ্ছন্দ বলিয়া মনে হয়, যথা—**শেষবার—কেশভার; চারিধার—বারিধার; পরিণাম—হরিনাম; ধেনুগণ—বেণুবন;** ইহাকে 'যৌগিক মিল' ও বলা যাইতে পারে।

(৩) মিলের যে আরেকটি কৌশল বা পদ্ধতি আছে তাহাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে; এইরূপ মিলে দুইটি করিয়া শব্দ থাকে, মিল রক্ষা হয় প্রথম দুইটির দ্বারা;

শেষের দুইটি শব্দ একই শব্দ; যথা,—ঘুমিয়ে দাও—ভুলিয়ে দাও; তুল্য নাই—মূল্য নাই;

অলকের মণি ঝলকিয়া উঠে।
বুকের কলস ছলকিয়া উঠে।

*　　*　　*

…ছিল সেথা লেখা কি ?
…পাব তার দেখা কি ?

(৪) আর এক রকমের মিল আছে, তাহাও চমক লাগায় বটে, কিন্তু একটা কারণে আমি সেগুলিকে পৃথক চিহ্নিত করিতেছি—যদিও মিলহিসাবে তাহারা নূতন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না; **ধমনী—রমণী** যেমন, এ মিলও তেমনই। কিন্তু ইহাতে ভাষার রীতি-বৈষম্য ঘটে, এ জন্য সাধুভাষার পয়ার-ছন্দে এ মিল তেমন প্রশস্ত নয়—গীতিচ্ছন্দেরই উপযোগী; যথা—**পুলিনে—ভুলি নে; চলিলে—সলিলে; নিখিলে—শিখিলে,** প্রভৃতি। খুব সুন্দর মিল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র চলে না।

অতঃপর, গীতিচ্ছন্দের মিল আরও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছু বলিব। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় যে মাত্রাগন্ধী গীতিচ্ছন্দের (পর্ব্বভূমক) উদ্ভাবন ও প্রচলন করিয়াছেন, তাহার গঠন-বিশেষে, চরণের বা পদবন্ধের শেষ শব্দটিতে এমন একটি দোলা লাগে যে, তাহার মিল পূর্ণাঙ্গ না হইলে ছন্দই যেন ক্ষুণ্ণ হয়—একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।—

মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি
　　মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মত বেজেছি চরণে—
　　　　চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা,
　　রাঙিয়াছি তাহা হৃদয় শোণিত-
　　　　বরণে।

('উদাসীন'—ক্ষণিকা)

এখানে 'স্মরণে'র সঙ্গে ঐ দুইটি পূর্ণাঙ্গ-মিল ('চরণে', 'বরণে') না থাকিলে ছন্দটিই নষ্ট হইত না কি? 'ভবনে', 'গমনে' 'স্বপনে' প্রভৃতির মত মিল, অন্যত্র ভাল হইলেও, এখানে অচল; কারণ, এখানে ঐ মিলগুলির উপরেই ছন্দের পূর্ণ-ঝঙ্কার নির্ভর করিতেছে। অতএব সাধারণ পয়ার-ছন্দে মিল যত সহজ, এইরূপ গীতিচ্ছন্দে তেমন নয়—এখানে মিলের অধিকতর পারিপাট্যের প্রয়োজন আছে। আর একটি দৃষ্টান্ত—

বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হ'তে দূরে গ্রামে নির্জ্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে
স্নানে চলেছেন শত সখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা॥

('সামান্য ক্ষতি'—কথা)

এখানে প্রথম ও শেষ পংক্তির মিল ঠিক এমনই পূর্ণাঙ্গ হওয়ার প্রয়োজন যে ছিল, তাহা পাঠকমাত্রেই অনুভব করিবেন।

আধুনিক বাংলা কবিতায় মিলের এই সৌষ্ঠববৃদ্ধির প্রধান কারণ—ছন্দের বৈচিত্র্যও যেমন, তেমনই ছন্দেরই আর একটি উপকরণ-বৃদ্ধি। আধুনিক ছন্দে সুর অপেক্ষা স্বরবৃদ্ধির বা ঝোঁকের আধিপত্য বাড়িয়াছে, এজন্য শুধুই অক্ষরের মিল নয়, অনেক সময়ে ঝোঁকগুলিরও মান রাখিতে হয়; অর্থাৎ, কেবল—**তরণী = ধরণী** নয়—**সঞ্চিত = বঞ্চিত, বন্ধুরে = কোন্ দূরে**—প্রভৃতির মত যুক্তাক্ষরের হিসাব রাখিতে হয়; শব্দের কেবল মাত্রা-পূরণ হইলেই হইবে না, ওই ঝোঁকের ব্যবস্থাও করিতে হইবে, কারণ,—**বন্ধুরে = কোন্ দূরে** শুনিতে যেমন হয়, বন্ধুরে = কতদূরে—তেমন হয় না। ছড়ার ছন্দে ত' কথাই নাই, যথা,—

ফিরছে বিবশ স্বপ্নাবেশে সুর খুঁজে কার যুলবনে,
বেল-চামেলির ক্ষেতগুলিতে কক্কা কেটে আনমনে!
নিখিল কবির রাজধানী এ, এই নগরী সুন্দরী,
কাজ্‌রী সুরে গুজ্‌রী বাজে এর দুটী পা'য় গুঞ্জরি'!
হাজার গুণীর চুনীর নূপুর টুক্‌টুকে পা'য় রয় মিশে,
জৌনপুরী তোড়ির তোড়া বাজায় হাজার মজ্‌লিশে!

('সিরাজ-ই-হিন্দ্'—সত্যেন্দ্রনাথ)

এই কবিতার ছন্দের যাহা কিছু বাহার, তাহা ঐ শেষের ঝোঁকওয়ালা মিলের শব্দগুলির জন্যই ঘটিয়াছে। এ ছন্দে, এই ঝোঁকগুলিই মিলের দোষও সংশোধন করিয়া দেয়, যথা—লাঞ্ছনা—মানছে না; আশ্চর্য্যি—ভশ্চার্য্যি; শাহান শা—আসফ জা। অতএব বাংলা কবিতার ছন্দেও যেমন, মিলেও তেমনই—একটি নূতন শ্রী ও শক্তির সমাবেশ হইয়াছে।

মিল সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই বলা হইয়াছে; কেবল, মিলের সাহায্যে কবিতার পংক্তিবিন্যাসের কারিগরি—বিশেষ করিয়া, পদবন্ধ-কবিতায় ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। পদবন্ধ-রচনা কালে এইরূপ মিল-বিন্যাস বেশ একটু কারুকলা ও কৌশল-সাপেক্ষ, এবং অনেক সময়ে তিন চারিটিরও অধিক স-মিল শব্দের প্রয়োজন হয় বলিয়া—একটু দুরূহও বটে। আমি 'পদবন্ধ' প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে, কেবল মিলের সাহায্যে পংক্তিসজ্জার দুই চারিটি উদাহরণ দিব;—বাংলা কবিতার পদবন্ধ-রচনায় বিশেষ কারুকলা এখনও দেখা দেয় নাই বলিয়া, সেরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নয়।

মিল-রচনার কৌশল যেমন ফার্সী কবিতার একটি বিশেষত্ব, তেমনই এইরূপ মিল-বিন্যাস-কৌশল, ইংরেজী অপেক্ষা ফরাসী ও ইতালীয় কবিতায় অধিকতর লক্ষিত হয়। তিন-পংক্তির পদবন্ধে ইতালীয় Terza Rima-র কলাকৌশল পূর্ব্বে ('পদবন্ধ' প্রবন্ধে) দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করিয়াছি, এখানে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে পুনরায় সেই দৃষ্টান্ত দিব। ইংরেজীতে যাহাকে Interlaced Rhyme বলে, ইহাতেও তাহা রহিয়াছে, যথা—

সকলি হয়েছে বৃথা! দিই নাই, তবু বহুগুণ
না চাহিতে পেয়েছিনু, কতজন চাহি' মুখপানে
আছিল আশায় বসি'—পাণ্ডু ওষ্ঠে মিনতি করুণ।

অপাঙ্গে চাহিনি কভু সেই মূক আকুল আহ্বানে,
পলাতক হিয়া মোর খুঁজিয়াছে একান্ত নির্জ্জন
আপন কল্পনা-কুঞ্জ, বুনিয়াছে বসি সেইখানে

বাণীর বসনখানি—বিলাসের মায়া-আস্তরণ।
হেসেছি কেঁদেছি শুধু স্বপনের সখা-সখী সাথে,
সত্য যাহা—প্রাণের দুয়ারে তার প্রবেশ বারণ!

('শেষশিক্ষা,'—স্মরগরল)

এই তিন চরণের পদবন্ধগুলি মিল-বিন্যাসের কৌশলে পরস্পর একটা বন্ধন রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—সে যেন 'বিউনি-বাঁধা'র (বেণীবন্ধন) মত! ইহাদের মিল-বিন্যাস এইরূপ—ক খ ক | খ গ খ | গ ঘ গ ; প্রত্যেক পদবন্ধের মাঝের পংক্তির সহিত পরবর্ত্তী পদবন্ধের প্রথম ও শেষ পংক্তির মিল। এ যেন পংক্তিগুলিকে লইয়া রীতিমত চাটাই-বোনা বা বিউনি-বাঁধা হইতেছে; এজন্য বাংলায় ইহাকে 'বিউনি-মিল' বলিব। চার-পংক্তির পদবন্ধেও, শুধু মিলের এইরূপ পুনরাবর্ত্তন নয়—**মিল-সহ গোটা পংক্তির পুনরাবর্ত্তন** কিরূপ কাব্যরস সৃষ্টি করিতে পারে, সৌভাগ্যক্রমে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারিব ; যথা—

এখন সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দ বায়,
ফুলের সবাই গন্ধ বিলায়—যেন সে ধূপের ধূম !
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে; গীতের মূর্চ্ছনায়—
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ—চরণে জড়ায় ঘুম।

ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়—যেন যে ধূপের ধূম!
বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্ত্তনাদ!
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম,
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ!

বেহালার সুরে শুনিতেছি কোন্ প্রেতের আর্ত্তনাদ—
মৃত্যুর সেই বিশাল পুরীর আঁধারে সে ভয় পায়!
অস্ত-গগন মৃত্যুসদনে পেতেছে রূপের ফাঁদ,
রক্তসাগরে ডুবিয়া মরিল সূর্য্য এখনি হায়!

('সন্ধ্যার সুর'—হেমন্ত-গোধূলি)

—কবিতাটি ফরাসী কবি শার্ল্ বোদ্‌লেয়ারের (Charles Baudelaire) একটি কবিতার অনুসরণে ও অনুকরণে রচিত—ইহাও, Interlaced Rhyme বা 'বিউনি-মিলে'র সাহায্যে, এবং ক্রমাগত জোড়া-জোড়া পংক্তির পুনরাবর্ত্তনে, এমন অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে।

চারি-পংক্তির চতুষ্ক (Quatrain)-গঠনে মিলের যে অতি-সাধারণ বিন্যাস আমাদের কবিতাতেও সহজ হইয়া উঠিয়াছে তাহার উল্লেখও এখানে করিব, এরূপ মিল-বিন্যাস দুই প্রকার হইয়া থাকে—

(১) ইংরাজীতে যাহাকে cross rhyme বা 'ঢ্যারা (×)-মিল' বলে—alternate rhyme বা 'একান্তর' মিলও বলে, যথা—

ধ্বনিতেছে গগনে গগনে
দণ্ডধারী দানবের জয়,
ম্লানচ্ছায়া ধরণীর বনে
বনস্পতি নির্ব্বাক নির্ভয়। (হেমন্ত-গোধূলি)

(২) ইংরাজীতে যাহাকে enclosing rhyme বলে; বাংলায় ইহার প্রচলন কিছু কম হইয়াছে, যথা—

প্রভাত হইলে নিশি, হাতে লয়ে থালা
পূরিত উদ্যান-সার সুরসাল ফলে,
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে
ধনশালী কোন এক বণিকের বালা।
(পদ্যপাঠ—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

সনেটের চতুষ্কগুলিতেও এইরূপ মিল-বিন্যাস সর্ব্বদাই চোখে পড়ে, যথা—

যৌবন যমুনা তীরে বাজিযাছে মোহন মুরলী
কবিতা-কদম্বমূলে, তাই শুনি' আহিরিণী বালা—
জানে না সে কার লাগি'।—গাঁথিয়াছে মালতীর মালা
আয ঢের দিন-শেষে, হেরি' নভে নব ঘনাবলী।
(হেমন্ত গোধূলি)

প্রথম চতুষ্কটিতে মিলবিন্যাস যেমন ক খ ক খ, এ দুইটিতে তেমনই—ক খ খ ক, এখানে একটি মিল আরেকটি মিলকে যেন বেষ্টন করিয়া আছে, তাই ইহার নাম enclosing rhyme, বাংলায় ইহাকে 'বেড়া-মিল' বলা যাইতে পারে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় মিলের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিলাম, তথাপি বাংলায় মিলের দৈন্যও আছে—অতি অল্পসংখ্যক সমিল শব্দের সাহায্যে কবিতায় কোনরূপ কারিগরি করা সহজ নয়। ইহারই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমি এই অধ্যায় শেষ করিব। একদা একটি বিশেষ গঠনের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করিতে গিয়া বেশ একটু বিপদে পড়িয়াছিলাম—এখানে সেই কবিতাটিই সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই কবিতাটি মূলে ইংরাজী হইলেও, ইহা ফরাসী "Ballade a Double Refrain" নামক ছন্দ-রীতিতে রচিত, বাংলাতেও সেই রীতি রক্ষা

করিতে গিয়া এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—ইহার আগাগোড়া মিলবিন্যাসের কৌশলই লক্ষণীয়; কবিতাটির নাম "গদ্য ও পদ্য",—

গাড়ীর চাকার কাদায় যখন যায় না পথে হাঁটা,
কিম্বা যখন আগুন ছোটে উড়িয়ে ধুলো-বালি,
শীতের ঠেলায় ঘরে যখন শার্সি-কপাট আঁটা,
তখন ঘেমে হাঁপিয়ে কেসে গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন চামেলি দেয় হাওয়ায় আতর ঢালি',
ঝুম্‌কো-লতা দুলছে দেখি, বারান্দাটির পাশে,
চিকের ফাঁকে একখানি মুখ, ফুল্ল যুঁলের ডালি—
তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

মগজ যখন বেজায় ভারি, যেন লোহার ভাঁটা!
বুদ্ধি ত' নয়—যেন সমান চার-কোণা এক টালি,
মনটা যখন দাড়ির মতন ছুঁচ্‌লো করে' ছাঁটা,—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন রক্তে জাগে ফাগুন-চতুরালি,
বর্ষ যখন হর্ষে সারা নতুন মধুমাসে,
কানে যখন গোলাপ গোঁজে হাবুল, বনমালী—
তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

চাই যেখানে ভাবিকে চাল—বিদ্যে বহুৎ ঘাঁটা,
'হ তেই হবে', 'কথ্‌খনো নয়'—তর্ক এবং গালি,
ছড়ানো চাই হেথায় হোথায় 'কিন্তু' 'যদি'র কাঁটা,—
তখন বসে' বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি।
কিন্তু যখন মেদুর হবে আঁখির কাজল-কালি,
মিলন-লগন ঘনিয়ে আসে কনক-চাঁপার বাসে,
যে কথা কেউ জান্‌বে নাকো, সেই কথা কয় আলি,—
তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য কলোচ্ছ্বাসে।

শেষ

সংসারে যে অনেক অভাব, অনেক জোড়া-তালি—
তার তরে, ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি,
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে,
তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।
(হেমন্ত-গোধূলি)

—এই কবিতাটিতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৮ পংক্তি আছে, কিন্তু মিল আছে মাত্র তিনটি।

তাহার মধ্যে একই মিলের এগারোটি শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে! এইরূপ কলা-কৌশল যতই কৃত্রিম হোক, সুকবির হাতে এইরূপ ছাঁদও রসসৃষ্টির সহায় হইয়া থাকে। কিন্তু ভাষাও এমন মিলবিন্যাসের অনুকূল হওয়া চাই; বাংলা কথ্য-ভাষায় যেটুকু সুবিধা আছে, সাধুভাষায় তাহা নাই, উপরের কবিতা হইতে তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে।

সর্ব্বশেষে একটি কথা আবার স্মরণ করাইতে চাই। কবিতায় মিলের প্রয়োজন যেমনই থাকুক, মিল—ছন্দের মতন—কবিতার বাহন মাত্র, কবিতা মিলের বাহন নয়। এজন্য, কবিতা উৎকৃষ্ট হইলে, তাহার সর্ব্বাঙ্গের মত মিলও সুন্দর হইবে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া মিলের কৌশল ও কারিগরি থাকিলেই কবিতা উৎকৃষ্ট হয় না; এমন কি তাহা কবিতা না হইতেও পারে।

নির্দ্দেশিকা

নির্দ্দেশিকা

উদ্ধৃত কবিতা—কবি ও কাব্য